নতুন তথ্যের আলোকে
কলকাতা

হরিপদ ভৌমিক



পারুল প্রকাশনী

১৬ আখাউড়া রোড, আগরতলা ৭৯৯০০১

ফোন (০৩৮১) ২৩৮৬৯৪৭

৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ফোন ২২৪১-৬৪৭৪

প্রকাশিকা

শ্রীমতী রত্না সাহা
১৬ আখাউড়া রোড, আগরতলা

প্রচ্ছদ ঃ

রাজু সবকার

প্রথম প্রকাশ

৫ জুন, ২০০০

লেজার কম্পোজ

জ্যোতি লেজার পয়েন্ট
৬৩/২ডি সূর্যসেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রণ

আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স
২৪৩/২সি এ পি সি রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

বেহালার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদ কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থের মামলা দায়ের করে জানায়, জোব চার্নক আসার আগেই কলকাতার অস্তিত্ব ছিল এবং কলকাতার কোনো জন্মদিন নেই। কলকাতা হাইকোর্ট পাঁচজন ইতিহাসবিদকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে তাঁদেব এই বিষয়ে রিপোর্ট জমা দিতে বলে। বিভিন্ন সূত্র অনুসন্ধান করে এই কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করে তাতে বলা হয়, জোব চার্নককে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় না। এই শহরেব কোনো নির্দিষ্ট জন্মদিন নেই। জোব চার্নক আসার আগেও কলকাতার কথা বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। কলকাতা একদিনে গড়ে ওঠেনি। ২০০৩ সালের ১৬ মে শুক্রবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অশোক কুমার মাথুর ও বিচারপতি জয়ন্ত বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চ বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট মেনে নিয়ে বলেন, "ইতিহাস বই এবং অন্যান্য নথি থেকে চার্নকের নাম মুছে দিতে হবে।" পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভোকেট জেনারেল্ বলাই রায় ১৬ মে হাইকোর্টকে জানান, "বিশেষজ্ঞ কমিটির সঙ্গে রাজ্য সরকার একমত।" এই কথাও বলা হয়, অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য নথি থেকে কলকাতার জন্মদিন ও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে চার্নকেব নাম মুছে দেবে।" এভাবে হাইকোর্টের রায়ে কলকাতার ইতিহাস সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কোনও প্রাচীন শহর হঠাৎ কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে গড়ে ওঠে না। কলকাতা শহরও একদিনে গড়ে ওঠেনি। এই শহরের ইতিহাস আলোচনায় দুটো পর্ব উল্লেখ করা যায় ঃ প্রাক্-ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক। প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলের কলকাতা সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে তথ্য পাওয়া যায়। ১৪৯৫ সালের বিপ্রদাস পিপলাই রচিত 'মনসা মঙ্গল' কাব্য গ্রন্থে এবং ১৫৯৬ সালের আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে কলকাতার উল্লেখ রয়েছে। মুঘল শাসনকালে কলকাতা থেকে রাজস্ব সংগ্রহের তথ্য 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থ থেকেই পাওয়া যায়। ১৬৮০ সালের আগেই মধ্যযুগের এক বাঙালি কবি সনাতন ঘোষাল বলেন, তিনি কলকাতাতে জন্মগ্রহণ করেন।

বেহালার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী কলকাতার জমিদারি পান। গোবিন্দপুর ও সুতানুটি গ্রাম দুটোও তাঁর জমিদারির অন্তর্গত ছিল। যে ফরমানের সাহায্যে মুঘল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার এই তিনটি গ্রামের জমিদারি লাভ করেন, ফারসি ভাষায় রচিত সেই দলিলটি এই পরিবারে এখনও সংরক্ষিত আছে কি না তা জানা যায়নি। ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের ইজারা নেয়। কোম্পানির পক্ষ থেকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন জোব চার্নকের আত্মীয় চার্লস আয়ার। সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিষদ এই চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে সংগ্রহ করে হাইকোর্টে জমা দেয়। এই চুক্তিপত্রটি ফারসি ভাষায় লেখা। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি তা তর্জমা করে দেয়।

মুঘলদের সঙ্গে সংঘর্ষের পরে জোব চার্নক কোম্পানির জন্য বাণিজ্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি উপযোগী ও নিরাপদ স্থানের অনুসন্ধান করেন। উলুবেড়িয়াতে তিনি গিয়েছিলেন। কিন্তু জায়গাটা তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি ১৬৮৬ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রথমে সুতানুটিতে আসেন। পরে ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট এখানে আসেন। হাইকোর্ট কর্তৃক মনোনীত ইতিহাসবিদ্‌রা তাঁদের রিপোর্টে বলেন, বিদেশভূমিতে একটি শহর স্থাপনের ভাবনা অথবা উদ্দেশ্য জোব চার্নকের ছিল না। এমনকি তিনি সুতানুটি নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামকে পরিবর্তিত করে এমন কিছু করেননি যাকে একটি শহরের মূল অংশ বলা যায়। সুতরাং জোব চার্নক কলকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা নন।

এই তিনটি গ্রামে জনপদ জোব চার্নকের আগে থাকলেও তিনি নিরাপত্তার কথা ভেবে ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে কুঠি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকার ফলে এই গ্রাম্য জনপদ হতে ক্রমশ কলকাতা নগরীর উদ্ভব ঘটে। জোব চার্নকের কুঠি স্থাপনের মাধ্যমেই এই রূপান্তরের সূচনা হয়। তাঁর এই ভূমিকাকে তো অস্বীকার করা যায় না। কলকাতা নগরী বলতে যাকে আমরা মনে করি তার সূচনা ঔপনিবেশিক আমলেই হয়। এই কারণেই জোব চার্নককে জড়িয়ে উৎসব পালিত হয়।

সম্প্রতি আর একটি বিষয় নিয়েও বির্তকের সূত্রপাত হয়েছে। জোব চার্নকের যে ছবির সঙ্গে আমরা পরিচিত তা তাঁর নয় এমন কথাও উঠেছে। আগামী দিনে হয়তো বিভিন্ন সূত্র থেকে কলকাতা সম্বন্ধে আরও খবর পাওয়া যাবে। ১৬৯৮ সালে ফারসি ভাষায় রচিত চুক্তিপত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করেছে। এমনি হয়তো কিছু তথ্য এখনও আমাদের অজ্ঞাত। 'কলকাতা' শহরের নামকরণ নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। পঞ্জিকা অবলম্বন করে কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত কেউ রচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই।

বহু বছর ধরেই যে কলকাতা-চর্চা চলছে তা অব্যাহত থাকবে। শ্রীহরিপদ ভৌমিক লিখিত 'নতুন তথ্যের আলোকে কলকাতা' গ্রন্থটি পড়ে আমার এই ধারণা আর বদ্ধমূল হয়েছে। প্রাক্-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক আমলের কলকাতার ওপরে আরও আলোকপাত করার অবকাশ যথেষ্ট রয়েছে, তা এই গ্রন্থ পাঠ করে আমার মনে হয়েছে। এই গ্রন্থটিকে কলকাতা চর্চায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলেই আমি মনে করি। এর আগেও শ্রীভৌমিক দুটো গ্রন্থ কলকাতা সম্বন্ধে রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ হল তাঁর রচিত তৃতীয় গ্রন্থ। ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকলেও নিজের অধ্যবসায়ের মাধমে শ্রীভৌমিক কলকাতার ইতিহাস চর্চায় একজন অনলস গবেষক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

সূচিপত্র

সেদিনের দেখা ✍ আজকের ইতিহাস



পনের বছর আগে
২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ তারিখে যুগান্তর পত্রিকার
কার্টুনিস্ট দেখেছিলেন আজকের ইতিহাসে দেখা জোব চার্নককে।
লেখা হয়েছে 'কলকাতার নতুন ইতিহাস' - পালিয়ে যাচ্ছেন জোব চার্নক।

কলকাতার জন্মদিনের হুজুগ

"সাধারণে কথায় বলেন 'হুনরেচীন' ও হুজ্জুতে বাঙ্গাল কিন্তু হুতোম বলেন 'হুজুকে কল্‌কেতা'। হেতা নিত্য নতুন নতুন হুজুক"—কথাগুলি বলেছেন শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে যে কথাটি তিনি বলেছিলেন, প্রায় দেড়শ বছর পরেও সেই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কলকাতা তিনশ একটা বড় হুজুগ ছিল। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠা সন দুটোই ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক, প্রতিষ্ঠার তারিখ ২৪ আগস্ট, প্রতিষ্ঠা সন ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দ। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম কলকাতার ইতিহাস ছাপা হয় 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ১০ আগস্ট তারিখে।

কলিকাতার বৃত্তান্ত

.....পূর্বে ইহার নাম আলিনগর ছিল যখন আওরংজেব বাদশাহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি অর্থাৎ সলা হইল তখন মেং চারনক সাহেব ইংরাজ কোম্পানির তরফে অধ্যক্ষ হইয়া হুগলি হইতে কুঠী উঠাইয়া শেষে ১৬৮৯/৯০ সালে কলিকাতায় বসতি করিলেন এবং শত বৎসর গত না হইতে এই স্থান এক প্রধান নগর এবং রাজধানী হইল। প্রথমতঃএই দেশে মেং চারনক সাহেব আসিয়াছিলেন ইঁহার বড় সাহস ছিল কিন্তু যুদ্ধে বড় নৈপুণ্য ছিল না।....

মেং চারনক সাহেব ১৬৯২ সালে ১০ জানুয়ারিতে পরলোকগত হন কিন্তু যদ্যপি পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তিরদিগের জীবিতেরদের ন্যায় দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা দিতেন তবে এই মেং চারনক সাহেব আপন স্থাপিত ঐ দেশ এতাদৃশ সুশোভিত দেখিয়া কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন তাহা বক্তব্য নহে"....।

জোব চার্নক কলকাতার ইতিহাসে স্বপ্নের রাজপুত্রের সম্মান পাওয়ার সূচনা ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে। ১৮১ বছর ধরে চার্নক নায়ক। ইংরেজ ভাবধারায় বাঙ্গালীরাও নাম লেখান। সাহেবরা বুদ্ধিমান, সাহেবদের অসাধারণ ক্ষমতা, এমন ভাবটি আস্তে আস্তে দেশীয় মানুষদের মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। ইংরেজগণ সব সময়ই দেখাতে চেয়েছেন কলকাতার প্রতিষ্ঠা, উন্নতি সবকিছুই তাদের হাত ধরেই হয়েছে। ইংরেজ আগমনের আগে যেন কলকাতা নামের কোন চিহ্নই ছিল না। আসলে সাহেবরা দেশীয় মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন, ইংরেজরা বুদ্ধিমান, তাদের বুদ্ধির জোরেই সব হয়েছে, হচ্ছে সুতরাং নেটিভ মানুষ যেন তা ভুলে না যান এবং বিরুদ্ধাচরণ না করেন। সে কারণেই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে জব চার্ণককে তারা তুলে ধরেছেন।

ইংরেজরা কলকাতার ইতিহাস লিখেছেন, 'আপনার ঢাক আপুনি বাজাও'—এর নীতিতে কলকাতার ইতিহাস সাহেব পাড়ার ইতিহাস হলো। মারাঠা ডিচের ঠিক বাইরের কলকাতা দেশীয় মানুষ-জনের কথা, তাদের জীবনযাত্রার কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা কোন কথাই সাহেবরা লিখলেন না। নেটিভ কলকাতার ইতিহাস সমৃদ্ধির ইতিহাস, সেই ইতিহাস না লেখার কারণে হারিয়ে গেল। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে কিছু প্রশ্ন রেখে উত্তর খোঁজা শুরু

হলে 'ব্ল্যাক টাউন' বা দেশীয় পাড়ার ইতিহাস লেখা সম্ভব হবে।

কলকাতার চারদিকটা দেখা যাক, উত্তরে বাগাবাজারের খাল, দক্ষিণে কালীঘাটের গোবিন্দপুরের খাল ও আদিগঙ্গা, পশ্চিমে গঙ্গা, পূর্বে লবণ হ্রদ। বাগবাজারে যেখানে গঙ্গা বাঁক নিয়েছে সেখানে নাকি পেরিন সাহেবের বাগান ছিল, এই বাগানের কাছেই ছিল একটা বাজার, বাগ + বাজার বাগবাজার হয়েছে। সাহেবের বাগ সুতরাং সেটাই ঠিক, অথচ অন্যটাও তো হতে পারে! যেখানে গঙ্গা বাঁক নিয়েছে—নদী পাড়ে সেখানেই বসেছিল বাজার তা থেকেই তো 'বাঁক বাজার' হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ এই গঙ্গা কত যুগ আগে বাঁক নিয়ে লবণ হ্রদের দিকে চলে গিয়েছিল তা কেউ জানে না। দেশীয় মানুষ এখানেই তো নদী পাড়ে হাট বসিয়েছিল—সুতোর হাট, সেই সূত্রেই সুতানুটি। পেরিন সাহেবের অনেক আগে এই অঞ্চলটি ছিল যশোরের জমিদারীর মধ্যে, মহারাজা প্রতাপাদিত্য গঙ্গাবাসের জন্য একটি বাগান ঘেরা দুর্গ তৈরি করেছিলেন বাঁকবাজারে। প্রতাপাদিত্যের বাগ থেকে বাগবাজার হবে না কেন?

পূর্বদিকে লবণ হ্রদ, বাংলার একমাত্র হ্রদ। এই হ্রদেই মিলিত হয়েছে বিদ্যাধরী নদী, বাগবাজারের দিক থেকে এসেছে গঙ্গার প্রধান স্রোত, লবণ হ্রদ থেকে একটি ধারা শিয়ালদা, ক্রিক রো হয়ে গঙ্গায় পড়েছিল। হ্রদ থেকে আর একটি ধারা ধাপ্পার পাশ দিয়ে গিয়ে 'ধাপ্পাধারা' নাম নিয়ে কালীঘাটে আদি গঙ্গায় মিশেছে। জলপথের দিক থেকে পূর্ব দিকটার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। উল্টোডাঙ্গার পাশে যশোর সহ দক্ষিণ বাংলায় যাবার প্রধান দ্বার ছিল বলেই নাম হয় 'দক্ষিণদ্বারী'। আজও এই নামেই স্থানটি পরিচিত। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণদ্বারী, কাঁকুড়গাছি, শুঁড়া, বেলেঘাটা, শিয়ালদার যে রাজস্ব ছিল তা গোবিন্দপুর/সুতানুটির থেকে অনেক বেশি। মারাঠা ডিচের বাইরের বাণিজ্যকেন্দ্রকে জব চার্নকেরা লিখিত গুরুত্ব দেয়নি বটে, তবে জব চার্নক সুতানুটির ব্যবসায়ী হয়েও শিয়ালদার বটবৃক্ষের নীচে দেশীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করতেন কেন? আর কিসেরই বা বৈঠক? মনে হয়, সুতানুটিতে শুধুমাত্র সুতো এবং কাপড়ের ব্যবসা হতো, কিন্তু অন্য পাইকারী ব্যবসা হতো বেলেঘাটাতে। উল্টোডাঙ্গা থেকে বেলেঘাটা বিরাট এলাকা জুড়ে লবণ হ্রদের তীরে গড়ে উঠেছিল বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্র। কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে এই বাণিজ্যকেন্দ্রের উল্লেখ রয়েছে, এই অঞ্চলের বাণিজ্যকেন্দ্রটির নাম ছিল 'কুচিনান'। কুচিনান-বেলেঘাটা বাণিজ্যকেন্দ্রে ব্যবসা হতো বহুরকম পণ্যের, এই বহুরকম পণ্যের পাইকারী বাজারটির নাম ছিল 'বহুবাজার'। কুচিনান থেকে বেলেঘাটা হয়ে বহুবাজারে পণ্য যাওয়ার রাস্তায় সওদা হতো ব্যবসায়ীদের বৈঠকখানায়, তাই দেশীয় বণিকদের সঙ্গে কথা বলতে জব চার্নককে আসতে হতো বৈঠকখানার বৃক্ষতলে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের এই বৃক্ষতলের বৈঠকখানায় দেশীয় মানুষদের সঙ্গে হুঁকো খেতে খেতে ব্যবসায়ী কথাবার্তা চালাতেন জব চার্নক। এই বৈঠকখানার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জব চার্নকের নাম করা হয়, কিন্তু কথাটি উল্টো। দেশীয় বণিকদের বৈঠকখানায় জব চার্নক আসতেন নিজেদের ব্যবসার প্রয়োজনে।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর বড়িষার সাবর্ণ পরিবার পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদের

ঐতিহ্যমণ্ডিত আটচালার নাটমন্দিরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে সাবর্ণ পরিবার থেকে দাবী করা হয়, কলকাতার জন্মদিন যদি ধরতেই হয় তা হলে ১০ই নভেম্বর দিনকে ধরা উচিত, কারণ এইদিন ইংরেজদের হাতে কলকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের মালিকানার দলিল তুলে দেওয়া হয়। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জমির মালিক ছিলেন সাবর্ণ জমিদাররা, আর প্রতিষ্ঠাতা হয়ে গেলেন জব চার্নক! জমির মালিকানা নেই অন্যের জমিতে নেমে বললেন, এখানে বসে ব্যবসা করবো, আর মুখে মুখে মালিক হয়ে গেলেন? যদি ১৬৯৮ সনকে কলকাতার প্রতিষ্ঠার সন ধরা হয় তাহলে জব চার্নক প্রতিষ্ঠাতা হন কী করে? সুতরাং আমরা এ বিষয় নিয়ে 'মামলা' করার কথা ভাবছি।

এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ও ইতিহাসের অধ্যাপকগণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম, বক্তব্যের সময় উপস্থিত সকলের কাছে একটি প্রস্তাব রেখেছিলাম, আমি বলেছিলাম—১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দকে যদি প্রতিষ্ঠা-সন এবং ১০ নভেম্বরকে যদি প্রতিষ্ঠার তারিখ ধরা হয়, তাহলে এই দিনটিকে কলকাতার নয় শহর-কলকাতার সূচনার দিন ধরা হোক। অর্থাৎ ১৬৯৮ খ্রি. ১০ নভেম্বর কলকাতার নয়, শহর-কলকাতার জন্মদিন ধরা হবে। সকলে একমত হয়েছিলেন। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর যদি শহর কলকাতার জন্মদিন হয়, তাহলে জোব চার্নক প্রতিষ্ঠাতা হতে পারেন না, কেউ একজন কলকাতাকে তৈরি করেননি, সুতরাং কেউ কলকাতার জনক নন।

পূর্ব দিকে লবণ হ্রদ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজরা কেন আবার মারাঠা ডিচ কাটালেন? এটা একটা বড় প্রশ্ন? আসলে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ও সাবর্ণ জমিদারদের মধ্যে যাঁর অংশে এই পূর্ব কলকাতা ছিল তিনি ইংরেজদের কাছে মাথা নোয়াননি, তাই নকল দলিল করেও ইংরেজরা পূর্ব কলকাতাকে নিজেদের হাতে নিতে পারেনি। বর্গীর সঙ্গে যদি দেশীয় মানুষ যোগ দেয় তাহলে ইংরেজদের অসুবিধা হতে পারে ভেবে নিজেদের সুরক্ষিত করতে দেশীয় মানুষদের দিয়ে কাটিয়ে নেওয়া হয়েছিল মারাঠা ডিচ। সিমলার একটা অংশের দখল পায়নি ইংরেজরা, সেই অংশটি মারাঠাডিচের বাইরে রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ ইংরেজদের অধিকৃত অংশ মারাঠা হুজুগকে কাজে লাগিয়ে সাহেবরা খাল কেটে নিজেদের সীমানা নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। এই কারণেই পূর্বদিকে লবণ হ্রদ থাকা সত্ত্বেও আর একটি খাল কাটতে হলো। 'সিমলা' দুভাগ হয়ে মারাঠা ডিচের ভেতরের অংশ 'সিমলা' এবং মারাঠা ডিচের বাইরের অংশ 'বাহির সিমলা' নামে পরিচিত হল।

সাহেবরা নিজেদের সীমানার মধ্যে 'সাহেব টোলা' এবং 'বাঙ্গালী টোলা' আলাদা করে নিয়েছিলেন। বাঙ্গালী টোলা আগে বর্ণ অনুসারে ভাগ ছিল, পরে কর্মানুসারে পাড়াকে ভাগ করা হয়-কুমোরদের পাড়া কুমারটুলি, শাঁখারীদের পাড়া শাঁখারীটোলা ইত্যাদি।

সাহেবদের লেখা ইতিহাস থেকে তথ্য নিয়ে বাঙ্গালীরা কলকাতার ইতিহাস লিখেছেন; ইংরেজস্তুতিই প্রধান বিষয় হলো। সাহেবদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঙ্গালী ঐতিহাসিক গণও জোব চার্নককেই কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলে মন্তব্য করেন। আস্তে আস্তে কলকাতার জন্মদিন

পালন শুরু হলো। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে জন্মদিন পালনের হুজুগ শুরু হলো। একটু ফিরে দেখা যাক কলকাতার জন্মদিন পালনের হুজুগটা স্মৃতি সততই সুখের বলে, কলকাতার জন্মদিনের হুজুগের কথা সংবাদ মাধ্যমের পাতা থেকেই দেখতে চাইছি। জন্মদিন পালনের আগের সংবাদ —

২৪ আগস্ট কলকাতা দিবস

স্টাফ রিপোর্টার[১] ঃ এই শহরের ২৯৬-তম বার্ষিকী উপলক্ষে আগামী রবিবার ২৪ আগস্ট 'কলকাতা দিবস'রূপে পালন করা হবে। এর উদ্যোক্তা ভারতীয় যাদুঘর। এছাড়া যাদুঘর কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রেক্ষাকক্ষে এক অনুষ্ঠান করছেন ২৩ আগস্ট। সেখানে 'ভারতীয় কবিতায় কলকাতা' বিষয়ে বলবেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার যিনি কিছুকাল আগে কলকাতা পুরসভার প্রশাসকরূপে কাজ করেছিলেন। এছাড়া 'এমাসের বিশেষ দ্রষ্টব্য' হিসাবে ২৩ তারিখ থেকে যাদুঘরে প্রদর্শিত হবে একটি প্রস্তর-লেখ যেটির বিষয় সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক 'কলকাতা লুঠ'। অভিনব এই প্রস্তর লেখটি আবিষ্কৃত হয়েছে উত্তর ২৪ পরগণার গ্রামাঞ্চল থেকে।

কলকাতার জন্মদিন পালনের সংবাদ—

কলকাতার জন্মদিন

স্টাফ রিপোর্টার[২] ঃ আজ রবিবার কলকাতার জন্মদিন। ২৯৬ বছর আগে এই দিনটিতে ভাগীরথীর পুব তীরে, সুতানুটি গাঁয়ে জন কোম্পানির জাহাজ নোঙর ফেলে। জাহাজ থেকে নামলেন জোব চার্নক—কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যাঁকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। হুগলি থেকে মোগলদের তাড়া খাওয়া জন কোম্পানির কাছে সুতানুটি ছিল দ্বিতীয় আশ্রয়। ধীরে ধীরে স্বপ্নের খোলস ভাঙার মত সুতানুটি থেকে বেরিয়ে এসেছে আজকের কলকাতা। শনিবার এই উপলক্ষে ভারতীয় যাদুঘরে কলকাতা সম্পর্কিত চারটি রঙিন ও সাদা কালো তথ্যচিত্র দেখানো হয়। শিবপ্রসাদ সমাদ্দার যাদুঘরের প্রেক্ষাকক্ষে তাঁর বক্তৃতায় ভারতের বিভিন্ন ভাষার কবিদের চোখে কলকাতার চালচিত্রের পরিচয় তুলে ধরেন শ্রোতৃমণ্ডলের কাছে। সংবিধানের স্বীকৃত ভাষাগুলিই শুধু নয়, বিভিন্ন উপভাষায় লেখা কবিতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এই দিন যাদুঘরে 'এ মাসের বিশেষ দ্রষ্টব্য' হিসাবে 'কলকাতা লুঠ' নামে একটি প্রস্তর লেখ দেখানো শুরু হয়।

অভিনব এই প্রস্তর লেখটি আবিষ্কৃত হয়েছে উত্তর ২৪ পরগণার গ্রামাঞ্চল থেকে। রবিবার ১০২ বছরের পুরনো কুমারটুলি ইন্সটিটিউট 'কলকাতা সেদিন এবং আজ'—শীর্ষক একটি আলোচনাসভার আয়োজন করেছে।

জন্মদিন পালনের পরের দিন যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—

কলকাতার জন্মদিন

স্টাফ রিপোর্টার[৩] ঃ শহর কলকাতার ২৯৬তম জন্মদিন পালন করা হল রবিবার নানা

১. আনন্দবাজার পত্রিকা ২১ আগস্ট ১৯৮৬।
২. তদেব ২৪ আগস্ট ১৯৮৬
৩. তদেব ২৫ আগস্ট ১৯৮৬

অনুষ্ঠানে। জোব চার্নকের কলকাতার গঙ্গার ঘাটে প্রথম পদার্পণের দিনটিকে অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্যই এই জন্মদিন। 'দ্য কালকাটান্স আয়োজিত ঠনঠনিয়ায় লাহাবাড়িতে এদিনের এক অনুষ্ঠানে শহরবাসী গান ও কবিতা দিয়ে তাঁদের ভালবাসা প্রকাশ করলেন। জোব চার্নকই প্রথম কলকাতা আবিষ্কার করেছিলেন কিনা কিংবা কলকাতা গ্রামের নাম কবে প্রথম শোনা গিয়েছিল। তাতে আগ্রহ ছিল না শ্রোতাদের, এরমধ্যেই কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিশ আর ত্রিশের দশকের কলকাতা নিয়ে তুলে ধরেন কিছু পুরানো কথা। এছাড়া, যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন গোপাল চট্টোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলাদ্রিশেখর বসু, ধীরেন বসু ও আরও অনেকে।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার জন্মদিন পালিত হলো, অনেক সভা হলো, সেই সব কথা ছোট্ট একটি সংবাদে প্রকাশিতও হলো—

পালিত হল কলকাতার ২৯৮তম জন্মদিন

আজকালের প্রতিবেদন[১] ঃ 'কলকাতা আমার হৃদয়ে।' এই স্লোগানকে ঘিরেই সোমবার কলকাতার ২৯৮তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল। 'সিটি অফ জয়' কলকাতার জন্মদিনটি বিভিন্ন সংস্থা এদিন পালন করে সেমিনার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ইয়ং মেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এদিন ভাষা পরিষদ হলে একটি সেমিনারের আয়োজন করেন। মৈত্রেয়ী দেবী সেমিনারে বলেন, কলকাতা থেকে বাংলাভাষা চর্চা উঠে যাচ্ছে। এখনকার মানুষরা ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাষা। রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদের মধ্যে পড়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তাহলে কলকাতার প্রতি কীসের প্রেম? মৈত্রেয়ী দেবী বলেন, কলকাতা ক্রমশ বিত্তশালীদের নগরী হয়ে যাচ্ছে। দরিদ্র বা নিম্নবিত্তের মানুষদের হাত থেকে কলকাতা চলে যাচ্ছে বিত্তশালীদের হাতে। এই সমস্যার দিকে কেউই লক্ষ্য করছে না। আর যাদের করার কথা তারাও হাত গুটিয়ে বসে আছে। কলকাতার জন্মদিনে কলকাতার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ প্রেম, আকর্ষণের কথা উল্লেখ করেও মৈত্রেয়ী দেবী বলেন, কলকাতা জননীর মত সব মানুষকে আশ্রয় দেয়। এতে কলকাতা ক্রমশ উত্তাল নগরী হচ্ছে। সেমিনারে অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি, ক্রিকেটার বাজু মুখার্জি, সাংবাদিক বাচ্চি কাকারিয়া বক্তব্য রাখেন। 'কলকাতা কী ক্রমশ বসে যাচ্ছে' এই শিরোনামায় আরেকটি সেমিনার ছিল ভারতীয় যাদুঘরে। এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন কয়েকজন ভূতত্ত্ববিদ।

ঐ বছরে দৈনিক বসুমতী পত্রিকায়[২] *বড় করে প্রবন্ধ লিখে এই জন্মদিন পালনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হলো—*

জন্মদিন ২৪ আগস্ট-কোন যুক্তিতে—

দেবাশিস ভট্টাচার্য

বেশ ক'বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে ২৪ আগস্ট তারিখটি কলকাতা মহানগরীর জন্মদিন

১ আজকাল পত্রিকা ২৫ আগস্ট ১৯৮৭।
২. দৈনিক বসুমতি ৩০.৮ ১৯৮৭

হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু ২৪ আগস্ট কেন? কোন্ যুক্তিতে? জানা যায়, হুগলীতে ইংরেজ বাণিজ্য কুঠির প্রধান জোব চার্নক বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁর তাড়া খেয়ে সদলে জাহাজে এসে সুতানুটি ঘাটে নামেন। সেদিনটি ছিল ২৪ আগস্ট ১৬৯০[১] তবে কলকাতায় সেটা তাঁর প্রথম পদার্পণ নয়। এর আগেও আরও দু'বার কলকাতায় তিনি এসেছিলেন। ১৬৮৬ ও ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে। নানা অসুবিধায় ফিরে গিয়েছিলেন।

এক ইংরেজ কর্মচারীর আগমনের দিনটি কলকাতার জন্মদিন হয় কী করে? তাঁর আবার আগেও যে কলকাতা ছিল সে প্রমাণ পাওয়া যায় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে (ষোড়শ শতকে রচিত) বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গলে (১৪৯৫) এবং ১৫৯০-তে রচিত ঐতিহাসিক আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে।

প্রশ্ন থেকে যায় এক ইংরেজ কর্মচারীর আগমনের দিনটি কলকাতার জন্ম দিন হয় কী করে? তাঁর আসার আগেও যে কলকাতা ছিল সে প্রমাণ পাওয়া যায় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে (ষোড়শ শতকে রচিত), বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গলে (১৪৯৫ এবং ১৫৯০-তে রচিত ঐতিহাসিক আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে। তাতে জানা যায় সুতানুটি কলকাতার কথা। এছাড়া ইংরেজরা কলকাতায় কুঠি তৈরির অনেক আগেই এখানে এসেছেন পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, আর্মেনিয়াম ও ফরাসীরা। তাই জোব চার্নক যেদিন কলকাতার মাটিতে পা রেখেছিলেন সেদিনটিকে কলকাতার জন্মদিন না বলে বরং বলা যায় ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার বীজ বপণ হয়েছিল সেই দিনটিতে।

.....এই বিশ্ববিশ্রুত মহানগরীর কপালে সুখের সঙ্গে দুঃখও কম জোটেনি। তবু তাঁর জীবনছন্দের বৈচিত্র্য স্তব্ধ হয়ে যায়নি। আপন ঐশ্বর্য নিয়ে বর্তমানের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে কলকাতা। তার জন্মদিনটি সঠিক জানা না থাকলেও, তাকে উপহার দেওয়ার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ৩রা জানুয়ারি তারিখে 'আজকাল' পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় পূর্ণেন্দু পত্রী লিখলেন—

চার্নক কী সত্যিই কলকাতার জনক?

পূর্ণেন্দু পত্রী

....১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজগণ কালীক্ষেত্র ভূমিতে বিনা অধিকারে এবং সাবর্ণ জায়গীরদারদিগের অনুগৃহীত বসবাসকারী মাত্র। দেশীয় শেঠ বসাক প্রভৃতির অথবা অন্যান্য ইউরোপীয় বসবাসকারী, যেমন ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, আর্মেনীয় প্রভৃতির সম মর্যাদা তাহাদের ছিল না। আর্মেনীয়গণ ভূস্বামীকে জানাইয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া এবং খাজনা দিয়া বসবাস করিতেন। বাঙ্গলার সুবেদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ইংরাজগণ, যতদূর জানা যায় কাহারও অনুমতি

১. দৈনিক বসুমতী ৩০ আগস্ট ১৯৮৭

না লইয়া, কাহাকেও কোনরূপ খাজনা না দিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়বার সুতানুটি দখল করিয়া বসবাস করিতেন। ঐ একই অধিকারে ১৬৯০-এ তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া তাহাদের কুঠি স্থাপন করিলেন।"

চার্নকের নিজের পক্ষেই ইচ্ছেমত বাড়িঘর বানানো যে অসম্ভব, তার পিছনেই তো তখন রয়েছে শাহীহুকুম। নবাবের অনুমতি ছাড়া বাড়ি কেন, একটা পাঁচিল তোলাও তখন নিষেধ। ইংরেজরা অবশ্য নিষেধ ভাঙায় অদক্ষ নয় কোনদিন। তবুও চার্নক যে এখন সে দক্ষতাও দেখাতে পারলেন না, তার কারণ তিনি নেতৃত্বের পক্ষে অক্ষম, এবং তাঁর নেতৃত্বে বাকি ইংরেজদের অনাস্থা। চার্নকের মৃত্যুর ৬ বছর পরে শোভা সিংয়ের বিদ্রোহের দাপটে আতঙ্কে-উদ্বেগে চতুর্দিক যখন কম্পমান, চার্লস আয়ার নিজেদের ধন-প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিলেন বাদশাহী সাহায্য। তখনও তার উত্তর আসেনি এই বলে যে, হ্যাঁ সাহায্য পাঠাচ্ছি। উত্তর এসেছিল, নিজের কুঠি নিজে রক্ষা কর। চতুর ইংরেজ তার মানে করে নিয়েছিল, নবাব মঞ্জুর করেছেন দুর্গ গড়ার অধিকার। ১৬৯০-এ চার্নক সর্বতোভাবে একজন অক্ষম নায়ক। জবরদখলের ভঙ্গিতে সুতানুটিতে বসে সেই চার্নক কি করে উচ্চারণ করতে পারেন কোম্পানির অধিকার শব্দ দুটি? পারেন। যে রহস্যে তিনি হয়ে ওঠেন কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা, সেই রহস্যেই পারেন।

একখানা আস্ত বই না লিখেও কেউ কী স্বপ্নেও প্রত্যাশা করতে পারেন যে পেয়ে যাবেন জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের সম্মান? কিন্তু সে অসম্ভবকেও সম্ভব করেছেন ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা। অপরূপ কৌশলে তাঁরা চার্নককে বানিয়ে দিয়েছেন কলকাতার জনক। আর ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকরাও যুক্তি-তর্কের বিচার ছাড়াই গলাধঃকরণ করেছেন সে সিদ্ধান্ত। যেহেতু ইংরেজ উবাচ। ফলে একদম পাকাপাকিভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে যে ১৬৯০-এর ২৪ আগস্ট তারিখটাই কলকাতার জন্মদিন। এই কলকাতায় সেইভাবেই তার তিনশ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হবে আর ক বছর পরে। আমার পড়াশোনার জগৎ সীমিত। এই সীমিত পড়াশোনায় আমি মাত্র একজন ভারতীয় ঐতিহাসিকের রচনাতেই এ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছি এই প্রসঙ্গে গভীর জিজ্ঞাসাচিহ্ন। তিনি নিশীথরঞ্জন রায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা জাগিয়েই থেমে গেছেন তিনি। অথচ তাঁর পক্ষেই তো সম্ভব ছিল এ নিয়ে বিস্তৃত সেমিনার গড়ে তুলে মত বিনিময়ের। এর ফলে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে নাও পৌঁছতে পারা যেত যদি, চার্ণক-পূর্ব ও চার্নক-সমসাময়িক কলকাতা-সংক্রান্ত তথ্য অন্বেষণে সাড়া পড়ত কিছুটা। আমাদের কলকাতা-চর্চা এখন যে আটকে রয়েছে প্রধানত উনিশ শতকেই, এটাও কলকাতাকে আদ্যন্ত জেনে-ওঠার পথে এক অন্তরায়। আবার চার্নকে ফিরে আসি।..... দেখা যাক, এই চার্নককে অনুসরণ করেই তাঁর সমসাময়িক সুতানুটি এই তিনখানা বই থেকেই আমরা পেয়ে যেসব তথ্য, সেগুলোকে সাজিয়ে চার্নক-পূর্ব কলকাতার জনসংখ্যা নির্ণয়ের একটা চেষ্টা করেছিলাম আমার 'জোব চার্নক যে কলকাতায় এসেছিলেন' নামের বইয়ে। সেখানে পরিবার বা জনসংখ্যার যে চেহারা, তার সঙ্গে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের wild and uncultivated-এর মিল নেই কোনখানে।

১৫৩৭ থেকে ১৬৯০-এর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উঠে এসে যে সব পরিবার কলকাতায় বসবাস করতেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা এইরকম—

কালীক্ষেত্রে বাস করতেন কালীঘাটের পুরোহিত ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী, তাঁর আত্মীয় রামগোবিন্দ, রামশরণ, যাদবেন্দ্র প্রমুখেরা। আর ভুবনেশ্বরের জামাই ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্তী। বাস করতেন রাজা নবকৃষ্ণের প্রপিতামহ রুক্মিণীকান্ত দে, সাবর্ণ চৌধুরীদের ছোট অংশীদার কেশব রায়ের অধীনে যাঁর চাকরি। চিৎপুরে বাস করতেন শ্রীহরি ঘোষের পূর্বপুরুষ মনোহর ঘোষ। কলকাতার প্রথম কালা জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের পূর্বপুরুষ, আর ঠাকুর বংশের পূর্বপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর। বাস করতেন চৌরঙ্গী গিরি, জঙ্গল গিরি। আন্দুল থেকে উঠে এসেছিলেন হাটখোলার দত্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দশরণ দত্ত। তাঁর পৌত্র রামচন্দ্র দত্ত-ও আলাদা করে বাড়ি বানিয়েছিলেন হাটখোলায়। গোবিন্দপুরে বাস করতেন সুরসুনার আইচ বংশের একজন। মহেন্দ্রলাল সরকারের মাতামহের পূর্বপুরুষেরা জমি কিনে বাড়ি বানিয়েছিলেন শাঁখারি পাড়ার খালের ধারে। সেজন্যে তাদের বলা হত খালধারের ঘোষ। ভদ্রকালী থেকে উঠে এসেছিলেন কৃষ্ণরাম বসু, যিনি ছিলেন শেঠ-বসাকদের সুতানুটির ইজারাদার। বাগবাজারে ছিল দে-সরকার পরিবার, গঙ্গার ধারে যাদের বহুকালের পুরনো গুড়ের ব্যবসা। মাইনগর থেকে উঠে এসেছিলেন নিধুরাম বসু। অনেক জ্ঞাতিকেও টেনে এনেছিলেন পরে। এই নিধুবাবুর প্রপৌত্র মোহনচাঁদ বসুই হাফ-আখড়াই গানের প্রবর্তক। শেঠ-বসাকদের সঙ্গে সপ্তগ্রাম থেকে উঠে এসেছিল শীল-মল্লিক বংশের জয়রাম মল্লিক। মুড়োগাছা থেকে উঠে এসেছিলেন রামচরণ দেব। কোন্নগর থেকে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্বপুরুষ। এও সম্পূর্ণ তালিকা নয় নিশ্চয়ই।

এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে এইসব পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী। ফলে ব্যবসার প্রয়োজনে প্রত্যেকেই নানা জায়গা থেকে নিয়ে এসেছেন আরও লোকজন। যেমন শেঠ বংশের মুকুন্দরাম ১৬৩২-এ বাংলার নানা জায়গা থেকে আনিয়েছেন তাঁতিদের। কাপড় বোনা আর সুতো তৈরির যে কারখানা বানিয়েছিলেন তিনি গোবিন্দপুরে, সেখানে নাকি তাঁতির সংখ্যা ছিল আড়াই হাজার। এমন হতে পারে যে এই সংখ্যার মধ্যেও রয়ে গেছে অত্যুক্তির ভেজাল। কিন্তু পরিবার সংখ্যার যে হিসেব পাওয়া গেল, তা থেকে এটুকু অনুমান করে নেওয়া এমন কিছু শক্ত নয় যে, সেটা শ্রীমতী ব্রেকোনডেন কথিত শুধুমাত্র 'a thriving village'-এর চেয়ে আরও বহুগুণ বড়। কিন্তু সে-বড়কেও ইংরেজ ঐতিহাসিকরা যে স্বীকার করতে চাননি, তার কারণটাও না বোঝার মত নয়। ঐ সময়ের কলকাতা যত ছোট হবে, ততই তো বড় করে তোলা যাবে সেই শূন্য স্থানে জোব চার্নকের সুবৃহৎ ইংরেজ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার কৃতিত্ব।

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের উপর একান্তভাবে নির্ভর করতে গিয়ে হয়ত আমরা কলকাতার অনেকখানি ভুল ইতিহাসই রচনা করে চলছি এখনও।

ইতিহাস অনেকটা ওপেন এয়ার ভাস্কর্যের মত। বৃহৎ স্পেসের মাঝখানে তার অবস্থান।

সে ভাস্কর্যে মূর্তিটাই বড় নয়। সমান গুরুত্ব যথাযোগ্য পেডাস্টেলেরও। ইতিহাসেও আগে তথ্যের বেদি। পরে তত্ত্বের মূর্তি। কিন্তু তথ্য সন্ধ্যানের চেয়ে দ্রুত তত্ত্বেও পৌঁছনোর তাগিদে আমাদের ইতিহাসচর্চা ইদানীং ব্যাহত এবং খণ্ডিত।

চার্নক জনক কি না?—প্রশ্ন তোলা হলেও হুজুগের ভাবাবেগকে একটু নড়াতে পারেনি। ১৯৮৯ সনে কলকাতার তিনশ বছরের উৎসব শুরু হয়ে গেল। চারদিকে সাজ-সাজ রব, ২৪ আগস্ট জন্মদিন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটু এগিয়ে নির্দিষ্ট তারিখের আগেই করে ফেলল কলকাতার তিনশর অনুষ্ঠান। বর্তমান[1] পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ঐ অনুষ্ঠানের কথা—

তিন'শ বছর : পাল্কিতে চাপা উচিত ছিল

গত ১৬ আগস্ট কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কলকাতার রাস্তায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালানো হল, যার প্রধান সওয়ার হয়েছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সংবাদে প্রকাশ এই দৃশ্য উপভোগ করতে রাস্তার দুধারে লক্ষ জনের সমাবেশ ঘটেছিল। এই সমাবেশ অবলোকন করে আমাদের পরিবহন মন্ত্রী যথেষ্ট উত্তেজনা অনুভব করেছেন। তবে আমজনতার অনেকেই কলকাতার তিনশ বছর পূর্তির সঙ্গে ঘোড়ায় টানা ট্রামের সম্পর্ক কী তা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ তিনশ বছর পূর্বে কলকাতাবাসী কি ঘোড়ায় টানা ট্রাম ব্যবহার করতেন? খুব জোর পাল্কি, ডুলি বা দোলার প্রচলন ছিল। সুতরাং সেই সময়কে স্মরণ করতে মন্ত্রীমশাইরা পাল্কি, ডুলি বা দোলা চেপে কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে এক নতুন মজা দেখাতে পারতেন এবং এতে নতুন জিনিস দেখার আশায় জনসমাবেশের ঘটা আরও বৃদ্ধি পেত।

পালন করতে হবে কলকাতার তিনশ বছরের জন্মদিন, এই হুজুগ শুরু হয়েছিল পাঁচ বছর আগে থেকে। পাঁচ বছর আগেই শ্রীসুমন চট্টোপাধ্যায়[2] প্রশ্ন রেখেছিলেন এই বলে—

তিনশ বছরে কলকাতার কল্যাণে সত্যি সচেষ্ট কজন?

জব চার্নক থেকে জ্যোতি বসু—প্রায় এই তিনশ বছরের ইতিহাসে কলকাতার উন্নয়নের জন্য সত্যিই সচেষ্ট হয়েছেন কজন?

এ প্রশ্নের উত্তর আছে জিওফ্রে মুরহাউসের 'কলকাতা' বইটির উৎসর্গপত্রে। কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের প্রথম চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার ই পি রিচার্ডস এবং কলকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনের কর্মীবৃন্দকে বইটি উৎসর্গ করেছেন তিনি। কারণ ইতিহাস ঘেঁটে মুরহাউস দেখেছেন নানা কারণে নানা সময়ে কলকাতার প্রশংসা বা নিন্দা করেছেন অনেকেই। কিন্তু কলকাতাকে বাঁচানোর কথা ভেবেছেন শুধু এঁরাই।

কলকাতা আজ যদি সত্যিই 'মুমূর্ষু নগরী' হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা রাতারাতি হয়নি। কোনও শহরই হঠাৎ ভেঙে পড়ে না। কলকাতাও পড়েনি। বস্তুত কলকাতার আজকের এই বিপর্যয়ের পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের অবহেলা আর রাজনীতির ইতিহাস। ইংরেজ শহরটাকে করেছে অবহেলা। আর আমাদের পুর-পিতারা শহরকে নিয়ে করেছেন রাজনীতি। চিত্তরঞ্জন

১। বর্তমান ৩০ আগস্ট ১৯৮৯
২। আনন্দবাজার পত্রিকা ১০ জুন ১৯৮৫

দাশ থেকে প্রশান্ত শূর—কলকাতা পুরসভা নামক প্রতিষ্ঠানটি বরাবর ব্যবহৃত হয়েছে রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে। ফলে প্রধানত পুরসভার উদ্যোগে বোম্বাইতে যেখানে গড়ে উঠেছে একটা উন্নত ও সুসংহত পুর ব্যবস্থা, কলকাতা সেখানে মাত্র তিনশ বছরেই পড়েছে মুখ থুবড়ে।

দুশ সাতান্ন বছর কলকাতায় বাস করেছে ইংরেজ। ১৯১১ সাল পর্যন্ত এই শহরই ছিল তাঁদের রাজধানী। কিন্তু কলকাতাকে তাঁরা ভালোবাসেননি। একে সাজাননি কোনও পুর অলঙ্কারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লটারি করে তৈরি হয়েছে কয়েকটি রাস্তা। কিন্তু সার্বিকভাবে কলকাতার সুপরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্যয় করা দূরে থাকুক, মাথাব্যথাও করেনি ইংরেজরা। যেদিন থেকে এর পত্তন, সেদিন থেকেই কলকাতা দুই অসমভাগে বিভাজিত। একটি ভাগে থেকেছেন শ্বেতাঙ্গরা। তার নাম দিয়েছিল হোয়াইট টাউন। অপরভাগে থেকেছেন লাখ লাখ কালা আদমি। তার নাম হয়েছে ব্ল্যাক টাউন। সাদা শহরে তৈরি হয়েছে চওড়া চওড়া রাস্তা। কালা শহরে থেকেছে শুধু গলি। সাদা শহরে তৈরি হয়েছে সুরম্য প্রাসাদ, জ্বলেছে গ্যাসের আলো। অবাধে খেলেছে হাওয়া। আর কালা শহরে অন্ধকার দমবন্ধকরা পরিবেশে নয় লক্ষ মানুষ বাস করেছেন মাত্র পঁয়তাল্লিশ হাজার বাড়িতে। হোয়াইট টাউনের জেল্লা দেখিয়ে কলকাতাকে যখন বলা হয়েছে প্রাসাদ নগরী, তখনও এই শহরের তিন চতুর্থাংশে গিঁটে গিঁটে আটকে থেকেছে যানবাহন। রবীন্দ্রনাথের শৈশবেও এক পশলা বৃষ্টিতে ডুবে গেছে চিৎপুর। ইংরেজের কাছে কলকাতা 'সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী' ছিল কেবল তার মুনাফা উৎপাদনের ক্ষমতায়।

স্বজাতির এই নিলর্জ্জ অবহেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন একমাত্র ই পি রিচার্ডস। লন্ডনের টাউন প্ল্যানিং ইনস্টিটিউটের সদস্য রিচার্ডস কলকাতায় এসেছিলেন সি আই টি'র প্রথম চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। রাজধানী স্থানান্তরিত করার ঘুষ হিসেবে ইংরেজ কলকাতাকে দিয়েছিল সি আই টি। চুয়াত্তর বছরে কতগুলো বড় বড় রাস্তা সি আই টি করেছে বটে। তবে তাঁদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল বাঙালিকে বাস্তুচ্যুত করে কলকাতাকে মাড়োয়াড়ির হাতে তুলে দেওয়া। অবশ্য সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

১৯১৪ সালে কলকাতার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে ২৫০ পাতার এক বিস্তারিত রিপোর্ট লিখেছিলেন রিচার্ডস। সেই রিপোর্টে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে যাঁরা প্রাচ্যের সুন্দরতম শহর হিসেবে কলকাতার মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তাঁদের কেউ কখনও গোলদীঘি থেকে পার্ক স্ট্রিট, এই বৃত্তের বাইরে যাননি। গেলে দেখতেন শহরের পরিস্থিতি কতখানি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। দশ লক্ষ লোকের শহরে একটা বড় রাস্তা নেই। আড়াই হাজার একর জমি জুড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে শুধু অলিগলি। নেই বাসস্থান। আড়াই লাখ মানুষ যেখানে বাস করেন তা বসবাসের যোগ্য নয়। শহরের এই অবস্থা বর্ণনা করে রিচার্ডস আরও বলেছিলেন, সংস্কারের কথা উঠলেই মাথাচাড়া দিয়েছে শুধু বিরোধিতা আর সন্দেহ। কর্তৃপক্ষের প্রতি তাঁর সতর্কবাণী ছিল এখনই যদি ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তাহলে কলকাতা একদিন পর্যবসতি হবে পৃথিবীর বৃহত্তম বস্তিতে।

রিচার্ডসের ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি সঠিক, পরবর্তী ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে। গোড়া

১। গণশক্তি ২৫ আগস্ট ১৯৯০

থেকেই কলকাতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল স্থানাভাব। হুগলির পূর্ব পারে নৌকো ভিড়িয়ে এই শহরের প্রসারের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন জব চার্নক। এই ছোট শহরে তবু অনবরত লোক এসেছে। ইংরেজ আমলে জীবিকার সন্ধানে ভিনরাজ্য থেকে যে অসংখ্য মানুষ এসেছেন তাঁদের বসবাসের জন্য কেউ কোনও পরিকল্পনা করেননি। কলকাতার জমিদারদের জমিতে তাঁরা যে যেমন খুশি বসে গেছেন। দেশভাগের পরে তারপর যখন লাখ লাখ মানুষ ওপার থেকে এপারে এসেছেন, কলকাতা জায়গা দিতে পারেনি। এত লোক এক সঙ্গে এলে পৃথিবীর কোনও শহরই জায়গা দিতে পারবে না। লাপিয়ের বলেছেন এই ধরনের জনবিস্ফোরণ ঘটলে পশ্চিমের যে-কোনও শহরও ভেঙে পড়ত। কোনও সন্দেহ নেই কলকাতার আজকের এই বিপর্যয় সেই জনবিস্ফোরণের অনিবার্য পরিণতি।

ঔপনিবেশিক শক্তি ইংরেজ নিজেদের স্বার্থেই সামগ্রিকভাবে কলকাতার উন্নয়নের কথা ভাবার প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু আমাদের পুরপিতারা বা রাজনীতিবিদরা ভেবেছেন কি?

একদিকে কলকাতার ৩০০ তম জন্মদিন পালন করার বিরুদ্ধে উঠেছে গুঞ্জন, অন্য দিকে নেমে পড়ে পিছিয়ে আসার রাস্তা নেই দেখে উৎসবে মেতে উঠেছে কেউ কেউ। সরকারী বেসরকারী বহু প্রতিষ্ঠান ৩০০ বছর উৎসবে যোগদান করে। ২৪ আগস্ট অনুষ্ঠানের সংবাদ দিয়ে 'গণশক্তি' এক পত্রিকায় মন্তব্য করা হলো—

কলকাতার ৩০০ বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কলকাতা, ২৪শে আগস্ট—শুক্রবার, নানাভাবে কলকাতা শহরের ৩০০ বছর পূর্তি দিবস পালিত হয়। কলকাতার জন্ম আদৌ ৩০০ বছর কি না, জোব চার্নক এ শহরের প্রতিষ্ঠাতা কি না, কোন এক নির্দিষ্ট দিনকে একটি শহরের জন্মতারিখ হিসাবে বিবেচনা করা যায় কি না এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও কমবেশি সকলেই গত একবছরে কলকাতার দিকে নতুন করে ফিরে তাকিয়েছেন। কলকাতার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবকিছুই আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে। গত বছর ধরে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে একটানা কর্মসূচীর মাধ্যমে কলকাতার ৩০০ বছর উদ্‌যাপিত হয়েছে। সরকারের থেকে কলকাতার উন্নয়নে গৃহীত বেশ কিছু পদক্ষেপ চলছে। কর্মসূচী রূপায়ণ করেছে কলকাতা কর্পোরেশনও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই রাজ্য সরকার কলকাতার ৩০০ বছর উদ্‌যাপনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল। সে হিসাবে এই কর্মসূচী প্রাথমিকভাবে সফল হয়েছে। তবে কর্মসূচি রূপায়ণ চলতে থাকবে।

শুক্রবার সকালে জোব চার্নকের সমাধিস্থলে মাল্যদান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। পাড়ায় প্রভাতফেরী, বনসৃজনের কর্মসূচী পালিত হয়। বিড়লা ইনডাসট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের উদ্যোগে "কলকাতার ৩০০ বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি" শীর্ষক এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

১। দৈনিক বসুমতী ২৪ আগস্ট ১৯৯০

উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা. ভাস্কর রায়চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।

জোব চার্নক যে তিনশ বছর আগে গঙ্গা থেকে ঠিক যেমন ভাবে নেমেছিলেন, তেমনিটি অভিনয় হলো নৌকোয় সেই অভিনয়ের সংবাদে[১] জানানো হলো—

আজ কলকাতার জন্মদিন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ কলকাতার আজ ৩০০ বছর বয়স পূর্ণ হচ্ছে। মহানগরীর এই ত্রিশতবার্ষিকী দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখতে আজ শহরে বহুবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ৩০০ বছর আগে জোব চার্নক যেভাবে গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতায় পা রেখে-ছিলেন হুবহু সেই চিত্রকে তুলে ধরার একটা প্রয়াস ত্রিশতবার্ষিকী উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে থাকছে। আজ দুপুরে চার্নককে নিয়ে বাগবাজার ঘাটে একটি পালতোলা বজরা হাজিরও হবে। চার্নক কলকাতার মাটিতে পা দিয়ে যাবেন গিরিশ মঞ্চে। সেখানে মঞ্চস্থ হবে 'কলকাতায় ৩০০ নাটক', বজবজ থেকে দাঁড় টেনে চার্নক আসবেন।

কলকাতা প্রেস ক্লাব ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের যৌথ উদ্যোগে এদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত হচ্ছে আর একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। রাজ্যপাল নুরুল হাসান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দরবার হলে। সাংবাদিকদের এই অনুষ্ঠানে 'আমার কলকাতা' নামে একটি স্মারক প্রকাশ করা হবে। ৫০ জন বিদগ্ধ লোকের লেখায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করবেন রাজ্যপাল। এরপর আছে বাংলা গানের বিভিন্ন ধারা নিয়ে অনুষ্ঠান। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, সলিল চৌধুরি ও সম্প্রদায় যেমন এই আসরে থাকছেন তেমনি নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করছেন আনন্দশঙ্কর ও তনুশ্রী শঙ্করের গ্রুপ।

কলকাতা ৩০০ বছর পূর্তিকে স্মরণীয় করতে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে আয়োজিত হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কলকাতা শীর্ষক এক প্রদর্শনী। এছাড়া বেহালার পর্ণশ্রী পল্লীতে আজ কলকাতার জন্মদিনে নিশিথরঞ্জন রায়, ভুবন মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারিরও উদ্বোধন করবেন।

কলকাতার তিনশ বছর জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে, তবে আমোদ ফুরোয়নি। হুতোম ঠিকই বলছেন—'কলকাতা শহরের আমোদ শিগ্‌গির ফুরায় না।' এই হুজুগে আমোদ নিয়ে লেখা হয়েছিল সম্পাদকীয়—

জন্মোৎসবের পরে

উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে, জাঁকজমক ফুরাইয়াছে, তিনশত বর্ষ পূর্তির পরে কলিকাতা আবার কলিকাতাতেই ফিরিয়া আসিয়াছে। এক বছরব্যাপী জন্মোৎসবের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পর অতিক্রান্ত হইয়াছে আরও প্রায় এক বছর, কলিকাতার জন্মদিন আবার আসন্ন। এই

১। আনন্দবাজার পত্রিকা ২১ জুলাই ১৯৯১

কালের ব্যবধানে দাঁড়াইয়া কেহ যদি ফিরিয়া দেখেন দেখিবেন, বিস্তর আড়ম্বর হইলেও অন্যভাবে কলিকাতার প্রাপ্তিযোগ অতি সামান্যই। তাহার জন্য গবেষণার প্রয়োজন নেই, শহরের হাল দেখিলেই সে কথা যে-কেহ সহজে বুঝিতে পারিবেন। যে হতশ্রী, জীর্ণ, দরিদ্র শহর তিনশ বছরে পদার্পণ করিয়াছিল, সেই শহরই অবিকল একই মূর্তিতে যাত্রা শুরু করিয়াছে তাহার জীবনের চতুর্থ শতাব্দীতে। কথাটিতে সামান্য ভুল হইল বোধ হয়। গত দুই বছরে কলিকাতার স্বাস্থ্য আরও ভাঙিয়াছে, তাহার নাগরিকদের দৈনন্দিন দুর্দশা আরও বাড়িয়াছে, 'নবীন' মহানগরের দেহে এবং মনে আলোকোজ্জ্বল ফোয়ারা কিংবা মনোরম উপবন অবশিষ্ট শহরের ভয়াবহ দৈন্য এবং দুর্দশাকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছে মাত্র। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, অবশিষ্ট শহরের জন্য আসলে কাহারও কোনও মাথাব্যথা নাই, দুটি চারটি 'দর্শনীয়' সুসজ্জিত করিতে পারিলেই শহরের একালের অভিভাবকেরা আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন, রোগব্যাধিতে ক্লিষ্ট মহানগরের মুখমণ্ডলে ইতস্তত দুই এক পোঁচ রঙ মাখাইয়া তাঁহারা 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা' সৃষ্টি করিতে চাহেন। তাঁহারা যে ব্যর্থ হইবেন, ইহাই প্রত্যাশিত, কারণ ফাঁকির দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম হয় না। কিংবা হয়তো প্রসাধনের অধিক কিছু তাঁহাদের কাম্যও নয়, শহরের সামগ্রিক উন্নতি ঘটানোর কোনও তাগিদ তাঁহাদের নাই, কারণ তাঁহারা সমাজের উপরতলার বাসিন্দা, নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকিলে অবশিষ্ট সমাজের জন্য ভাবিবার দরকার কি?

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, কলিকাতার স্বাস্থ্য দীর্ঘমেয়াদি বিচার নির্ভর করিতেছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এমনকি সমগ্র পূর্বভারতের স্বাস্থ্যের উপর। একটি বন্দর-শহর হিসাবে গড়িয়া উঠিবার ফলে কলিকাতা চিরকাল তাহার প্রাণশক্তি সংগ্রহ করিয়াছে, বাংলা বিহার ও ওড়িশার বিস্তীর্ণ পশ্চাদভূমি হইতে, আবার সেই পশ্চাদভূমির দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ব্যাপক কুসংস্কার এই শহরের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং তাহার মানসলোককেও বিপর্যস্ত ও কলুষিত করিয়াছে। দেশভাগের অভিঘাত এবং শরণার্থী পুনর্বাসনে পর্যন্ত অর্থ ও দূরদৃষ্টির অভাব—দুই দিক দিয়াই স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে মহানগর বিপাকে পড়িয়াছে। দেশের অন্যান্য বড় ও মাঝারি শহর যখন প্রভূত সরকারি বিনিয়োগ ও সামাজিক ব্যয়বরাদ্দের দাক্ষিণ্যে এবং স্বদেশি শিল্পবাণিজ্যের সমৃদ্ধির কল্যাণে সম্পন্ন হইয়াছে—বঞ্চিত, অবহেলিত কলকাতা তখন কেবল জনবাহুল্যে স্ফীতকায় হইয়া দারিদ্র্য ও রক্তাল্পতার নিদর্শন হিসাবে দেশবিদেশের অপযশ কুড়াইয়াছে। কলিকাতার এই অবক্ষয়ের পিছনে দিল্লীর রাজনৈতিক প্রভুদের দীর্ঘ অবিচার নিশ্চয়ই বহুলাংশে দায়ী। ভারতের 'কেন্দ্র-শাসিত' যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কৃপাদৃষ্টি ছাড়া একটি দরিদ্র শহরের পক্ষে আপন জটিল ব্যাধির ব্যয়বহুল চিকিৎসা করানোও দুঃসাধ্য ব্যাপার। কলিকাতা আজও 'ভারতের শহর', তাহার উন্নয়নও অতএব জাতীয় দায়িত্ব। কেন্দ্রের নূতন সরকার সেই দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হইবে কি না তাহা আপাতত জানিবার বিষয়, আপাতত ঋণসমুদ্রে ভাসিয়া থাকিবার প্রাণপণ চেষ্টাতেই তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় হইতেছে।

কিন্তু কখন দিল্লীশ্বররা মুখ তুলিয়া চাহিবেন বা চাহিবার ফুরসত পাইবেন, কখন পূর্বাঞ্চলে সমৃদ্ধি ঘটিবে এবং তাহার প্রসাদে কলিকাতা ধন্য হইবে, কখন পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হইবার ফলে কলিকাতায় সম্পাদকের প্লাবন আসিবে—সেই ভরসায় বসিয়া থাকিলে ব্যাধি দ্রুত আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। আর, পশ্চাদভূমির উন্নতি যে স্বতন্ত্রচালিতভাবে মহানগরের উন্নতি ঘটাইবে, এমন কথা মনে করিবারও কোনও কারণ নাই। গত পনেরো বছর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। খরা বা বন্যার সময়ে অতীতে হাজার হাজার গ্রামবাসী প্রাণরক্ষার তাগিদে শহরের পথে সাহায্য চাহিয়া বেড়াইতেন, আজ প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রাম বিপন্ন হইলেও সে দৃশ্য আর বিশেষ চোখে পড়ে না। ইহা অবশ্যই উন্নতির লক্ষণ। কিন্তু তাহা যে কোনও স্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদি উন্নতি, তেমন লক্ষণ অন্তত শহরে পাওয়া যায় না। আসলে শহরের জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কার্যকর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং তাহার তৎপর রূপায়ণ। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বহুবার মতামত জানাইয়াছেন। স্বভাবতই, তাহাদের সুপারিশে সংযোজিত হইয়াছে বিশদ বহুমুখী উন্নতির পরিকল্পনা। বস্তুত, বিশেষজ্ঞদের ধারণাও কালক্রমে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সংশোধিত হইয়াছে। প্রথম যুগে সত্তরের দশকের গোড়ায়, সি এম ডি এ কলিকাতার উন্নয়নের জন্য জোর দিয়েছিল প্রধানত রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর, এককথায় পরিকাঠামোর উপর। কিন্তু পরে, বিশেষত ১৯৭৬ সালে নগর উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা 'ডেভেলপমেন্ট পার্সপেকটিভ প্ল্যান' রচনার পরে উন্নয়নের সংজ্ঞা প্রসারিত হয়, পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হয় আবাসন, পুরজীবনের সঙ্গে সঙ্গে আসে নির্বাচিত পুরসভা, রাজ্য সরকারের নগর উন্নয়ন দফতর সাড়ম্বরে আপন মহৎ উদ্দেশ্য ঘোষণা করে। কিন্তু তাহার পর, দেড় দশকে তিনটি মন্ত্রিসভা রাজত্ব করার পরেও বামফ্রন্ট সরকার কলিকাতার হাল ফিরাইতে পারেন নাই। সামগ্রিক উন্নয়ন অনেক দূরের কথা, অনেক বৃহৎ ব্যাপার; শহরের মানুষের ন্যূনতম দাবিগুলি মেটানোর কাজেও তাঁহারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। রাস্তাঘাট সম্বৎসর বিধ্বস্ত ; বর্ষায় গলি হইতে রাজপথ অজস্র নদী এবং শাখানদীর সমতুল , সমস্ত শহরে যত্রতত্র পথ জুড়িয়া বেআইনি বেসাতি ; অগণিত বেআইনি বাড়ি ; পর্বতপ্রমাণ জঞ্জালের স্তূপ ; যানবাহন হইতে—বিশেষত সরকারি বাস হইতে নিয়ত বিষাক্ত, কালো ধোঁয়া ; গাড়ির হর্ন, মাইক্রোফোন এবং লক্ষ লক্ষ ক্যাসেটের দোকান হইতে অহোরাত্র কর্ণবিদারক ধ্বনি—সর্বপ্রকারে একটি নরকের দৃশ্য। কলিকাতার মানুষ রাজ্য সরকার, পুরসভা এবং নগর উন্নয়নের অন্যান্য হোতাদের নিকট কোনও স্বর্গ কামনা করেন না, আশাও করেন না। তাঁহারা চাহেন কেবল বাসযোগ্য একটি শহর। প্রবল প্রতাপান্বিত মুখ্যমন্ত্রী এবং তাহার অনুগামীরা চৌদ্দ বছরে সেই প্রত্যাশা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এবার পারিবেন কি ? না কি, জন্মোৎসবের পর এখন আর কলিকাতাকে লইয়া তাঁহাদের কোনও মাথাব্যথা নাই।

১. আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭ মে ২০০৩

১৯৯১ সন থেকে হুজুগটা একটু কমে এল। ১৯৯৮ সনে সাবর্ণ জমিদার পরিবারের কিছু মানুষ কলকাতার জন্মদিন নিয়ে পুরনো প্রশ্নটি আবার নতুন করে সামনে নিয়ে এলেন, তারা দাবি করলেন জন্মদিন করলে তারিখ হোক ১০ নভেম্বর, সন হোক ১৬৯৮। 'সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদ' জনস্বার্থে মামলা করলেন, মামলার রায় বের হলো। সংবাদটি শিরোনাম পেলো এইভাবে—

জন্মদিন নেই কলকাতার, জনকও নন জোব চার্নক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জোব চার্নক আর কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা নন। এই শহরের এখন থেকে কোন জন্মদিনও নেই।

কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় কলকাতার নতুন ইতিহাসের সূচনা করল। শুক্রবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অশোককুমার মাথুর ও বিচারপতি জয়ন্ত বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চ বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট মেনে জানিয়েছেন, ইতিহাস বই এবং অন্যান্য নথি থেকে চার্নকের নাম মুছে দিতে হবে। মুছে ফেলা হবে কলকাতার জন্ম-তারিখও। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বলাই রায় এ দিন হাইকোর্টে জানান, বিশেষজ্ঞ কমিটির সঙ্গে রাজ্য সরকার একমত। অর্থাৎ কলকাতার কোনও জন্মদিন বা প্রতিষ্ঠাতা নেই, তা মেনে নিল সরকারও। অবিলম্বে সরকার পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য নথি থেকে কলকাতার জন্মদিন ও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে চানকের নাম মুছে দেবে।

সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদ একটি জনস্বার্থের মামলা দায়ের করে জানায়, কলকাতার কোনও জন্মদিন নেই এবং চার্নক এখানে আসার আগেই কলকাতার অস্তিত্ব ছিল। রায়চৌধুরী পরিবার কলিকাতা-সহ তিনটি গ্রাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়েছিল। সেই সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি তারা ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে আনায়। ওই চুক্তিপত্রে দেখা যায়, কলকাতায় নগরায়ণের কাজ ইংরেজরা শুরু করেছিল চার্নক এখানে পৌঁছনোর বহু আগে।

কলকাতা হাইকোর্ট গত বছর এপ্রিলে পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ে দেয়। সেই কমিটিকে কলকাতার জন্মদিন এবং প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। কমিটিতে ছিলেন ইতিহাসবিদ নিমাইসাধন বসু, বরুণ দে, প্রদীপ সিংহ, অরুণ দাশগুপ্ত এবং সুশীল চৌধুরী। দীর্ঘ সময় বিভিন্ন নথি ও কাগজপত্র ও গবেষণাপত্র পরীক্ষা করে কমিটি জানায়, জোব চার্নক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা নন। কলকাতার কোনও নির্দিষ্ট জন্মদিনও নেই। কলকাতা এক দিনে গড়ে ওঠেনি। কোনও প্রাচীন শহরই হঠাৎ এক দিনে গড়ে ওঠে না। কমিটি আরও জানায়, চার্নক আসার বহু আগের বিভিন্ন লেখায় কলকাতার কথা আছে। যেমন বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যে কলকাতার কথা আছে, ১৫৯৬ সালের 'আইনি আকবরি'তে কলকাতা থেকে রাজস্ব সংগ্রহের উল্লেখ আছে। সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী কলকাতার জমিদারী পান ১৬০৮ সালে। চার্নক আসার আগেই তিনটি গ্রাম উন্নয়নের জন্য সাবর্ণ রায়চৌধরীরা চক্তি করেছিলেন। আইনজীবী স্মরজিৎ রায়চৌধুরী

বলেন, যে-সব নথি পাওয়া গিয়েছে কিংবা যে-নথিগুলি সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের কাছে আছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, কলকাতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে চার্নকের কোনও যোগ নেই। তিনি ১৬৯০ সালে কলকাতায় এসে ১৬৯৩ সালে মারা যান। অথচ সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে ইংরেজরা কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের ইজারা নিয়েছিল তারও পরে, ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর। বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বহু মানুষের স্বপ্ন, কল্পনা, উদ্যমে আজকের এই কলকাতা তৈরি হয়েছে। কলকাতা আর-পাঁচটা শহরের মতো পরিকল্পিত নগর নয়। ইংরেজরা আসার আগে থেকেই কলকাতা গ্রাম জমজমাট হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। কোনও বিশেষ ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ে কলকাতা তৈরি করেছেন, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। সেই অর্থে কলকাতার কোন জনক নেই। আর জন্মদিনের প্রশ্নই ওঠে না। অথচ চার্নক যে-দিন নদীপথে কলকাতায় পৌঁছেছিলেন, সেই দিনটাকেই কলকাতার জন্মদিন বলে পালন করা হচ্ছে। চার্নকের কলকাতায় পদর্পণের সঙ্গে কলকাতার জন্মদিনকে মিলিয়ে দেওয়ায় বিষয়টিতে কল্পনা প্রশ্রয় পেয়েছে। এই ধরনের শহর এক দিনে জন্মায় না। তাই জন্মদিনের প্রশ্নই ওঠে না।

বলাইবাবু বলেন রাজ্য সরকার বিশেষজ্ঞ কমিটির অভিমত গ্রহণ করেছে। তবে এই বছরের পাঠ্যপুস্তক ছাপা হয়ে গিয়েছে। তাই ওই পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন করা হয়তো সম্ভবপর হবে না। তবে যথাশীঘ্র ওই পরিবর্তন করা হবে। এই প্রথম হাইকোর্টে মামলা করে কোনও একটি শহরের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাতা সংক্রান্ত ইতিহাস বদলে গেল। দীর্ঘদিন ধরে জোব চার্নক যে এই মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতার আসনে বসেছিলেন, তা-ও মুছে গেল। আর কয়েকদিন পরেই সমস্ত পাঠ্যপুস্তক ও গ্রন্থ থেকে কলকাতার জন্মদিন ও জোব চার্নকের নাম মুছে যাবে। শুরু হল কলকাতার নতুন ইতিহাস।

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ন'পাতার রিপোর্টে কলকাতার ইতিহাস নিয়ে অনেক কথাই বলছেন। রিপোর্টের গোড়াতেই দু'টি প্রশ্ন সামনে রেখেছিলেন কমিশনের সদস্যরা। প্রথমত, কলকাতার জন্মদিন কবে? এটা কী ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট তারিখে? না কি অন্য কোনও প্রতিষ্ঠা দিন রয়েছে ? দ্বিতীয়ত, জোব চার্নকই কি কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বা জনক?

জবাব খুঁজতে গিয়ে ইতিহাসের পথ বিশেষজ্ঞ কমিটি দু'টি ক্ষেত্রেই নেতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। তারা জানিয়ে দেয়, চার্নক প্রতিষ্ঠাতা নন। বস্তুত কলকাতার কোন প্রতিষ্ঠা দিবসই নেই। হাইকোর্টের নির্দেশে গড়া কমিশনের সদস্য প্রখ্যাত পাঁচ ইতিহাসবিদ যে রিপোর্ট দেন একটি সারসংক্ষেপে বলা যায়—

১. কলকাতার কোনও 'জন্মদিন' নেই। এর মূল জনপদগুলি ছিল গ্রামাঞ্চল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে এই গ্রামগুলিই সংযুক্ত হয়। তার মূলে ছিল ইংরেজ কোম্পানি। এরপর অষ্টাদশ শতকে ওই অঞ্চলটিই ধীরে ধীরে একটি শহরে পরিণত হয়। তাই কোনও বিশেষ একটি বছরের নির্দিষ্ট কোনও দিনকে কলকাতার 'জন্মদিন' বলে চিহ্নিত করা যায় না।

২. সাধারণভাবে কাউকেই কলকাতার 'প্রতিষ্ঠাতা' বলে চিহ্নিত করা উচিত নয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে কয়েকটি নাম উচ্চারিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন

জোব চার্নক, যিনি সুতানুটিতে এসে নৌকা থেকে নামেন। আছেন আয়ার এবং গোল্ডসবোরোফ, ইংরেজদের পক্ষে যাঁরা এলাকার উন্নয়ন করেছিলেন। উল্টোদিকে রয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, এবং তাঁরা বাস করতেন গোবিন্দপুরে। তিনি এবং সাবর্ণ চৌধুরি পরিবার। ইংরেজদের কাছে তাঁরাই গ্রামগুলি বেচেছিলেন।

৩. ইতিহাসের নথি বিশেষ কোনও দিন বা প্রতিষ্ঠাতাকে খুঁজে বের করার জন্য তৈরি হয় না। কোথায় কতটা বদল হল, আগেকার প্রক্রিয়া কতটা ধারাবাহিকভাবে চলছে বা মিশেছে, এই নিয়েই কাজ ইতিহাসের নথির। এর পিছনে অবশ্য সব সময় থাকে তথ্য এবং যুক্তি।

হাইকোর্টের রায়ে কলকাতার ইতিহাস আবার শিরোনামে এলো। নতুন হুজুগ 'জোব চার্নক'। পথে ঘাটে জোব চার্নককে নিয়ে কেচ্ছা, সরকারের ঐতিহাসিক ভুল সবই এখন সাধারণ মানুষের আলোচনার বিষয়। এই বিষয় নিয়েই সাধারণ মানুষ আবার উৎসুক হলো জোব চার্নককে নিয়ে। কলকাতা তিনশ হুজুগ বার বছর আগে শেষ হয়েছে। স্মৃতি পুরনো হয়ে গেছে। নতুন হুজুগে আবার অনেক বই লেখা হবে, সেই হুজুগে এই বই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে লেখা হলো—

জনকহীন কলকাতা

সম্পাদকীয়[১] *লেখা হল এক পত্রিকায় :* কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে কলকাতার জন্ম এবং জন্মদাতা নিয়ে দীর্ঘদিনের একটি কিংবদন্তির অবসান হল। আমাদের এই বিচিত্র দেশে নানা বিচিত্র বিষয়ে বিতর্কের মীমাংসার দায়িত্ব নিতে হয় আদালতকে। অযোধ্যায় রামমন্দির ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ গড়ে তোলা হয়েছিল কি না, এই প্রশ্নের ফয়সালার দায়িত্ব পড়েছে সুপ্রিম কোর্টের উপর। তেমনই জোব চার্নক কলকাতা নামক মহানগীর প্রতিষ্ঠাতা কি না এবং ২৪ আগস্ট এই মহানগরীর 'জন্মদিন' কি না, এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্য আর্জি পেশ করা হয় কলকাতা হাইকোর্টের দরবারে; পাঁচ বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের[১] অভিমত মেনে নিয়ে বিচারপতিরা রায় দিয়েছেন যে, জোব চার্নক নামক ইংরেজ বণিক কলকাতা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না; তেমনই এই অঞ্চলে পাকাপাকিভাবে বসবাসের জন্য তৃতীয়বার যখন তিনি সুতানুটিতে পদার্পণ করেন সেই দিনটিকেও কলকাতার জন্মদিন হিসাবে গণ্য করা চলে না।

আদালতের এই রায়ে বেশ কিছু লোক ধাক্কা খেতে পারেন, কারণ কলকাতার এই তথাকথিত জন্মদিন নিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য জমে উঠেছে। ঘটা করে এই দিনটি পালন করা শুরু হয় গত শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে। আদালতের রায়ে সেইসব উৎসব-অনুষ্ঠানে বাধা পড়বে ঠিকই, কিন্তু আক্ষেপের কিছু নেই। কারণ বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকেরা যে অভিমত প্রকাশ করেছেন অথবা বিচারপতিরা যে রায় দিয়েছেন তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ইতিহাসের সত্য। কোনও মহানগরই একটি মাত্র ব্যক্তির প্রয়াসে স্থাপিত হতে পারে না।

---

১. সংবাদ প্রতিদিন ১৮ মে ২০০৩। পাঁচ ঐতিহাসিক হলেন—নিমাইসাধন বসু (আহ্বায়ক) বরুণ দে, অরুণকুমার দাসগুপ্ত, সুশীল চৌধুরী এবং প্রদীপ সিনহা।

থাকতে পারে না তার 'জন্মের' বিশেষ দিনক্ষণ। প্রাচীন রোম সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, রোম একদিনে গড়ে ওঠেনি। কোনও জনপদই সম্পর্কেই এই কথা বলা চলে। তাও জোব চার্নক যদি হতেন কোনও দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজাধিরাজ, তা হলেও না হয় কথা ছিল। কারণ তাঁরা অনেকে শহর-নগর প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিতান্তই ভাগ্যান্বেষী এক ইংরেজ বণিক। ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট তারিখের আগে ১৬৮৬ এবং ১৬৮৭ সালে দু'বার তিনি কলকাতায় এলেও ফিরে যেতে বাধ্য হন। তৃতীয়বার তাঁর আসার তারিখটি কেন যে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, তার কোন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন। চার্নককে ঘিরে গড়ে উঠেছিল নানা কিংবদন্তি। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হল কলকাতা প্রতিষ্ঠার কাহিনি। এ যেন প্রায় রোম শহরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রোমুলাসকে নিয়ে গড়ে ওঠা কিংবদন্তির মতো। কলকাতায় কুঠি প্রতিষ্ঠার পর চার্নক বছর তিনেকও বাঁচেননি। ওই স্বল্প সময়ের মধ্যে কোনও শহর 'প্রতিষ্ঠার' সম্ভাবনার কথা তাঁর মাথায় আসার কথা নয়, কারণ আরও পাঁচজন বিদেশি বণিকের মত তাঁরও ছিল ব্যবসা নিয়ে নানা দুর্ভাবনা। দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে ফরমান পেতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লেগে যায় আরও বিশ বছর। পলাশীর যুদ্ধের সাফল্যের আগে এই এলাকায় পাকাপোক্তভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসার ভাবনা ইংরেজদের মনে আসেনি।

জোব চার্নকের আগমনের অনেক আগে থেকেই যে কলকাতা এলাকার অস্তিত্ব ছিল, এ-কথা স্বীকার করতে সাধারণ বুদ্ধিই যথেষ্ট। ইতিহাসের নথিপত্র সেই সত্যকেই সমর্থন করে মাত্র। ভারতে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়েছিল কলকাতা থেকেই। সেই সূত্র ধরেই গড়ে উঠেছে এই মহানগরী। তাও যে খুব সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে তা নয়। রুডিয়ার্ড কিপলিংকে আমরা যতই গালমন্দ করি, এই মহানগর তো সত্যিই আকস্মিকভাবেই গড়ে উঠেছে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কলকাতা হাইকোর্টের রায় আমাদের একটি ঐতিহাসিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং রায় নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়ে রাজ্য সরকার বাস্তব বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন।

কলকাতার জন্মদিন নেই—কলকাতার নতুন হুজুগে গা ভাসাতে এই বই নয়। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সল্টলেকের আদি পর্বের ইতিহাস লেখার জন্য 'কুচিনান' পূর্ব কলকাতার 'কুচিনান' প্রসঙ্গের নতুন তথ্যের দিকে চোখ পড়ে। সেই তথ্য শুধু পূর্ব কলকাতার নয়—গোটা কলকাতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

ইতিহাস গ্রন্থের কাজ হলো সময়কে ধরে রাখা। কলকাতার ইতিহাসে বাংলায় 'কলিকাতা' এবং ইংরেজি Calcutta বানান লেখা হত। দুটো বানান একই করার জন্য ১৯৯৯ সনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি প্রস্তাব আনেন, এই প্রস্তাবটি কতটা যুক্তিযুক্ত সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল সেইসময় পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে[১], লেখা 'ও' কার যোগ করার কলকাতা প্রস্তাবের কথা—আগামী দিনের মানুষের জন্য এখানে যুক্ত করে রাখা হলো—

১ আনন্দবাজার পত্রিকা ২২ আগস্ট ১৯৯৯

'ওহ্ ক্যালকাটা!'

তিনশো নয় বছর আগে এমনই এক বর্ষণমুখর দিনে আগস্টের ২৪ তারিখে ইংরেজ সওদাগর জোব চার্নক সুতানুটির ঘাটে নোঙর করিয়াছিলেন। নয় বছর আগে ওই দিনটিকে সরকারিভাবে কলিকাতার জন্মদিন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। জন্মদিন উপলক্ষে ঘোড়ায় টানা ট্রাম ছাড়াও নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেই উদ্যোগে সরকারি বেসরকারি দুই তরফেই বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। তাহার পর হইতে প্রতি বছরই দিনটি কলকাতায় একটি স্মরণীয় দিন হিসাবে গণ্য। সম্ভবত এবারও তাহার অন্যথা হইবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে কলিকাতার জীবনে একটি পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, এক অর্থে যাহা যুগান্তকারী। রাজ্যের বিধায়করা এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এই শহরের সঙ্গে বিদেশি ইংরেজ শাসকদের সম্পর্ক ছেদ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন দেশে বিদেশে কলিকাতা যেহেতু 'ক্যালকাটা' সুতরাং, তাহা সংশোধন করিয়া 'কলকাতা' রাখাই শ্রেয়। পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি একটাই, 'কলকাতা' বাংলা নাম, ইংরেজরা তাহা বিকৃত করিয়া নিজেদের সুবিধা মতো লিখিয়াছে— 'ক্যালকাটা'। ইংরেজরা বিদেশি এবং সাম্রাজ্যবাদী, সুতরাং তাঁহাদের এই অধিকার মানিয়া লওয়া যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের বদলে 'বাংলা' নামকরণ উপলক্ষে তবু মৃদুমন্দ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা গিয়াছে, 'ক্যালকাটা'র বদলে 'কলকাতা' লইয়া বিশেষ উচ্চবাচ্য শোনা যায় নাই। সকলেই যেন ধরিয়া লইয়াছেন, উদ্যোগটি বিশেষ যুক্তিপূর্ণ। এ কালের বাঙালি যুক্তির চেয়ে বেশি পছন্দ করেন আবেগ। সুতরাং কেহ কোনও বিপরীত যুক্তি পেশ করেন নাই। সত্য, 'ক্যালকাটা' পরে আগে ছিল কলকাতা নয় কলিকাতা। কিন্তু 'ক্যালকাটা'ও নিতান্ত অর্বাচীন নাম নয়। জোব চার্নকের পদার্পণের আগে হইতেই পশ্চিমের মানুষের কাছে 'ক্যালকাটা' নামটা পৌঁছাইয়াছে। 'হবসন জবসন' অনুসারে তাহার প্রথম ব্যবহার ১৬৮৮ সালে। ১৬৯৮ সালেও 'ক্যালকাটা' পরিচিত শব্দ। 'কলিকাতা' এবং 'ক্যালকাটা' ছাড়া নানা সময়ে, নানা কলমে ও মানচিত্রে এই শহরের নানা নাম শোনা গিয়াছে। কিন্তু প্রায় চারশো বছর ধরিয়া শেষ পর্যন্ত বহাল ছিল দুটি নাম---'কলিকাতা' এবং 'ক্যালকাটা'। পৃথিবীর অনেক দেশ এবং অনেক শহরেরই দুইটি নাম রহিয়াছে। আমরা যে দেশকে বলি বেলজিয়াম সে দেশের মানুষের কাছে তাহা বেলজিক। ঠিক তেমনই স্পেন স্বদেশের মানুষের কাছে এসপানিয়া, ইতালি— ইতালিয়া। অনেক শহরেরও স্বদেশি বিদেশি দুটি নাম রহিয়াছে। কোপেনহেগেন—কোভ্ন হাভ্ন, ব্রাসেলস—ব্রুক্সেল, রোম—রোমা। ফরাসিরা প্যারিসকে বলে পারী, লন্ডনকে লঁদ্র। তাহাতে ওই সব দেশ বা শহরের মানুষের মাথা খারাপ হয় নাই। সম্ভব সেখানে বাল ঠাকরে বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো কেহ নাই। কিংবা নামবদলের চেয়ে তাঁহাদের হাতে রহিয়াছে আরও অনেক জরুরি কাজ।

কলিকাতার মতো একটি শহরের একটি নাম কাটা পড়িল বস্তুত বিনা আলোচনায়। কে যেন একবার লিখিয়াছিলেন 'ক্যালকাটা' নামটা কিছু অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজির ফল। তৎকালে বস্ত্রশিল্পের সুবাদে ইউরোপে সুপরিচিত ছিল কালিকট। 'কেলিকো' বলিতে তখন

কাপড় বুঝাইত, 'স্ল্যাং' বা অপভাষায় কালিকো ছিল আবার সুন্দরী মেয়ে! তাই কালিকট নামের সঙ্গে বিভ্রম সৃষ্টির জন্য বিকৃত অথচ কাছাকাছি বানানে সৃষ্ট হইয়াছিল 'ক্যালকাটা', ইংরেজ বণিকদের দৌলতে সেই শহর একদিন সাম্রাজ্যের 'দ্বিতীয় নগরী'তে পরিণত হয়। আশ্চর্য চারশো বছর পরে এই বন্দর শহরের নাম বদলের আগে বণিক সভাগুলির সঙ্গেও কেহ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করেন নাই। বাঙালির কাছে এই শহর তো চিরকালই 'কলকাতা', না হয় বিদেশিরা 'ক্যালকাটা'ই লিখিত বা বলিত, তাহাতে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হইত?

১৪ এপ্রিল ২০০০/১লা বৈশাখ ১৩০৭ থেকে কলকাতা নামে 'ও' কার যুক্ত হবার প্রস্তাব কার্যকরী হলো ছমাস পর। কলকাতায় 'ও'-কার যুক্ত হওয়ার পর প্রস্তাব পাশ হবার খবর পেয়ে আবার সম্পাদকীয় স্তম্ভে ঐ প্রসঙ্গটির কথা বলা হলো এইভাবে—

কলকাতার ও প্রাপ্তি?

রাজ্যের সংস্কৃতিমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই শহরের জন্য একটি নতুন উপহার ঘোষণা করিয়াছেন। উপহারটি আর কিছু নয়, বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণ 'ও-কার'। হিন্দি ভাষায় শহরের নামের বানান কী হইবে, এই প্রসঙ্গে তাঁহার বিধান, নামের আদ্যক্ষরের সঙ্গে 'ও-কার' যোগ করিয়া 'কোলকাতা' লিখিতে হইবে। কিছু দিন আগে শহরের আন্তর্জাতিক নাম 'ক্যালকাটা' থাকা উচিত, না 'কলকাতা' হওয়া উচিত, সে প্রশ্নে শহরের ঐতিহ্য লইয়া তাঁহাকে সাংস্কৃতিক গেণ্ডুয়া খেলিতে দেখা গিয়াছে। এই নামবদল কী ভাবে ঔপনিবেশিক দাসত্ব হইতে চূড়ান্ত মুক্তির ঐতিহাসিক মুহূর্ত সৃষ্টি করিবে, তাহা সম্পর্কে অনেক সুললিত ও অন্তঃসারশূন্য বাক্যবন্ধ রচিত হইয়াছিল। এবার তেমন কোনও স্মরণীয় উপলক্ষও নাই। তবে হঠাৎ আবার শহরের নামটির উপর সংস্কৃতিমন্ত্রীর নজর পড়িল কেন? বর্ণপরিচয়ের 'ঊ-কার'-এর মতো 'ও'-টি গাছেও ঝুলিয়া নাই যে পাকা ফলের মতো তাহাকে টুপ করিয়া পাড়িয়া আনিয়া শহরের নামের মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে হইবে। উচ্চারণের ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে বানানের সামঞ্জস্য ইহাতে রক্ষা হইল কি হইল না, তাহার বিচার করিবেন বৈয়াকরণেরা। বুদ্ধদেব বৈয়াকরণ নহেন, উপরন্তু ইতিমধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে সরকারি কৃত্যের ণত্ব-ষত্ব জ্ঞানটুকুও তাঁহার নাই। শহরের নাম ও নামের বানান দীর্ঘ ব্যবহারের সুবাদে জনসংস্কৃতির পরিসরের ('সিভিক স্পেস') অংশ, রাজনীতিকদের খেয়ালখুশিতে তাহার যদৃচ্ছ অদলবদল চলে না—তাহা করিলে উহা স্বৈরাচারেরই নামান্তর মাত্র। বুদ্ধদেববাবু আলাদা করিয়া সংস্কৃতিমন্ত্রক ও পুলিশ দফতরের দায়িত্ব পালন করুন, ক্ষতি নাই (কাহারও কাহারও মতে)। কিন্তু দুটিকে গুলাইয়া ফেলিয়া সাংস্কৃতিক পুলিশগিরি তাঁহাকে কেহ দেয় নাই।

সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল'র হিজিবিজবিজ বলে, 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব' নামক ছাতা ও 'অবিমৃশ্যকারিতা' নামক জুতার মালিক একটি বাড়ি বানাইয়া তাহার নাম 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়ে[১]। বুদ্ধদেববাবুকে এ গল্প স্মরণ করাইয়া দিবার কারণ—এক দিকে তাঁহার চলচ্চিত্র-নাটক-কবিতাপ্রীতি, অন্য দিকে তাঁহার উদ্যোগে

১. আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭ মার্চ ২০০০।

'ক্যালকাটা' হইতে 'কলকাতা' হইতে 'কোলকাতা'-য় দ্রুত রূপান্তরের আখ্যানটি লক্ষ করিলে সন্দেহ হয়, তিনি এক জন সূক্ষ্ম রুচির অস্থিরমতি মানুষ। কখন আবার শহরের পরবর্তী নামবদলের জন্য তিনি উদ্যোগী হইবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। সংশয়, 'প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব' তাঁহার পছন্দ হইবে না, কিন্তু 'অবিমৃশ্যকারিতা' বা 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়'র অনুমোদন পাইবার সম্ভাবনা প্রবল। সে ক্ষেত্রে কলিকাতার ভবিষ্যৎ লইয়া আশঙ্কা থাকিয়াই যাইতেছে। সে আশঙ্কা যে এখন নাই, এমনও নহে। শহরে পথ-দুর্ঘটনা, অপরাধপ্রবণতা, দূষণের মাত্রা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, জনবিস্ফোরণ ও পরিকল্পনার অভাব নাগরিক উন্নয়নকে ছায়াচ্ছন্ন করিতেছে অথচ রাজ্যের নিয়ামকদের যাবতীয় ভাবনা অপচিত হইতেছে নামবদলে, কবিতা বা চলচ্চিত্র-উৎসবে, কিংবা শিল্পী-সংবর্ধনায়। সংস্কৃতির ঘোলা জলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মাছ ধরিবার নিরন্তর প্রয়াস সেই কারণেই অতিরিক্ত দৃষ্টিকটু।

বুদ্ধদেববাবু তাঁহার জরুরি কৃত্যগুলি সম্পন্ন করিবার পরিবর্তে যেরূপ তুচ্ছতার বেসাতি করিয়া যাইতেছেন তাহা শুধু সাংস্কৃতিক উঞ্ছবৃত্তির পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকিলে সহনীয়তার মাত্রা অতিক্রান্ত হইত না। কিন্তু তিনি প্রতিনিয়ত তাঁহার 'মস্তিষ্কস্রোত' গুলি নাগরিক সংস্কৃতির উপর আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শহরের নামের বানানকে উচ্চারণ-অনুসারী করিবার সাম্প্রতিকতম প্রয়াস তাঁহার মুকুটে একটি নতুন পালক যোগ করিল। তিনি কি জানেন না যে এমন প্রয়াস বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ কাঠামো ও ব্যবহারবিধিকেই অমান্য করে? হিন্দিভাষীদের তিনি কি পরামর্শ দিবেন যে তাঁহার মুকুটে একটি নতুন পালক যোগ করিল। তিনি কি জানেন না যে এমন প্রয়াস বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ কাঠামো ও ব্যবহারবিধিকেই অমান্য করে? হিন্দিভাষীদের তিনি কি পরামর্শ দিবেন যে তাঁহার নিজের নামের বানান 'বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যো' লেখা হউক? এই প্রশ্নগুলির কী উত্তর তিনি দিবেন, জানা নাই। খুব সম্ভবত, উত্তর দিবার প্রয়োজন তিনি মনে করিবেন না। ফলত, তাঁহার সাংস্কৃতিক-ভাষাতাত্ত্বিক স্বেচ্ছাচারিতার দায় বহন করিয়া যাইতে হইবে এই মহানগরীকেই। কলিকাতার হিন্দী বানানে ওই 'ও'-কার টিই বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁহার সর্ববৃহৎ অবদান থাকিয়া যাইবে, এমন বলা অত্যুক্তি হইবে না। সম্ভবত তাঁহার 'কোলকাতা'কে তিনি ইংরেজি Kolkata হইতে পাইয়াছেন। তিনি সাহেবদের বিলাত স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, নিশ্চয়ই জানেন, ইংরেজদের কথ্য ভাষায় শূন্য সংখ্যাটিকে সচরাচর 'ও' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বুদ্ধদেববাবু অকৃত্যের যে শূন্যকুম্ভ রচনা করিলেন, তাহা এই সাযুজ্যকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

কোলকাতা (Kolkata) বানান, সব একই রকম হয়ে গেল, বাকী রইল 'কোলকাতা' নামের একটি স্টেশন। রাজধানী কলকাতার 'কোলকাতা' নামে কোনো স্টেশন নেই। রেলস্টেশন গঙ্গার ওপারে হাওড়া এবং এপারে শিয়ালদা। বিমান বন্দরের নাম দমদম বিমান বন্দর। তাই এই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করার তোড়জোড় শুরু হয়েছে; শিয়ালদার নাম পাল্টে 'কোলকাতা' হচ্ছে। রেল কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে কোলকাতা নামকরণের কোন আপত্তি আছে কিনা জানার জন্য চিঠি পাঠিয়েছিল। ১৭ই এপ্রিল ২০০০ মহাকরণে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের জানান 'শিয়ালদার নাম বদলে কোলকাতা করার জন্য পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানজার রাজ্যের মুখ্যসচিবকে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমরা তাতে সম্মতি দিয়েছি।' আশা করা যাচ্ছে 'কোলকাতা' নামে একটি রেলস্টেশন কোলকাতাবাসী খুব তাড়াতাড়িই পেয়ে যাবেন।

মহম্মদ ইয়ার খাঁ বাদশা
আহম্মদ শাহ গাজীর সীল

সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর
দৌলত জং বাদশা শাহ
গাজীর সীল

কলকাতা বিক্রয়ের দলিলের প্রতিলিপি

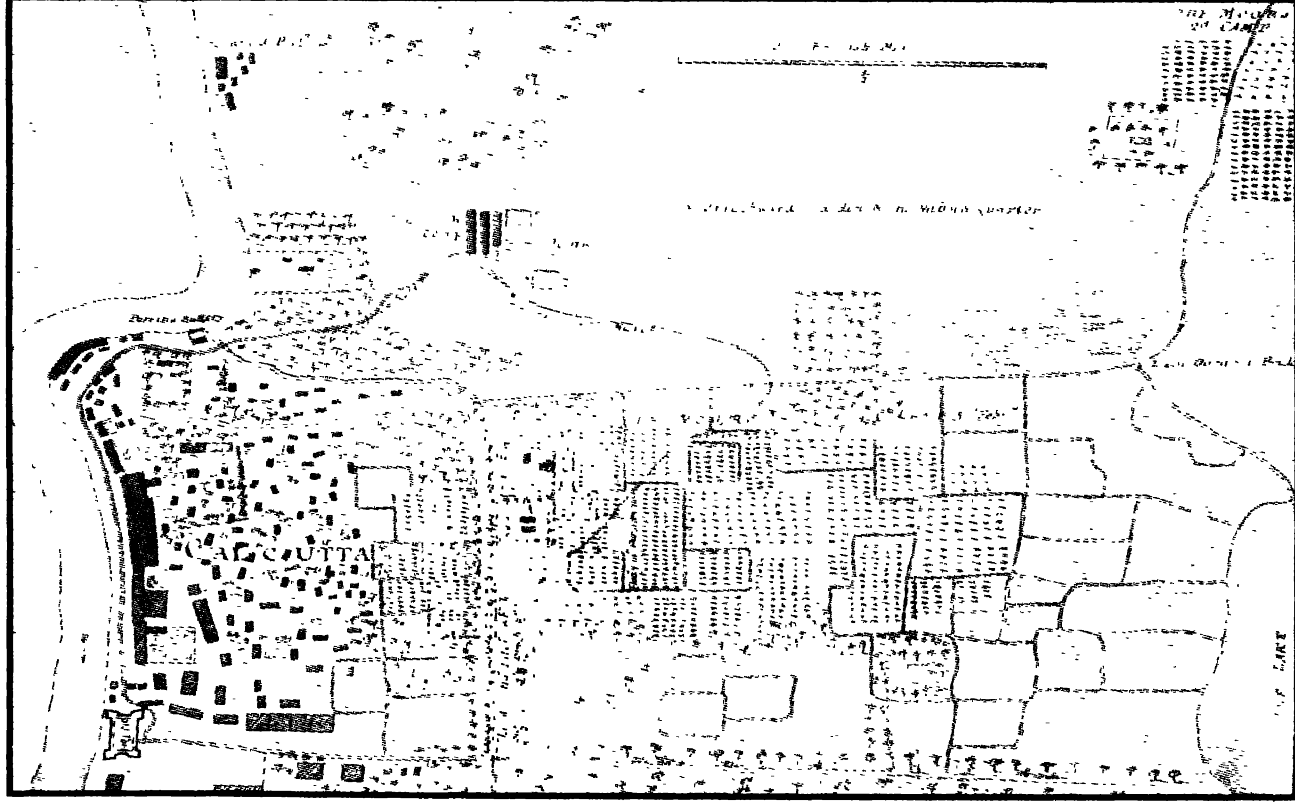
কলকাতা বিক্রির দলিল

(বাংলা অনুবাদ)

ইসলামের প্রতি অনুগত থেকে আমরা আমাদের নাম ও পিতা পিতামহের পরিচয় ঘোষণা করছি, (যথা) মনোহর দত্ (দেব) পিতা বাসুদেব পিতামহ রঘু [দেব] এবং রামচাঁদ পিতা বিদ্যাধর পিতামহ জগদীশ এবং রামভদ্র পিতা রামদেব পিতামহ কেসু (কেশব) এবং প্রাণ পিতা কুলেশ (কুলেশ্বর) পিতামহ গৌরী এবং মনোহর সিংহ পিতা গন্ধর্ব পিতামহ ঐ (গৌরী); আইনসঙ্গত অধিকার থাকায় এবং বৈধ অধিকারসমূহ ভোগী হিসেবে শপথ নিয়ে এরূপ ঘোষণা করছি যে, আমরা সম্মিলিতভাবে ঐতিহ্যগত ও আইনগত এবং ঘোষিত চৌহদ্দিযুক্ত আমিবাবাদ পবগনার শাসনাধীনে মৌজা ডিহি কলকাতা এবং সুতানুটি ও পাইকান এবং কলকাতা পরগনাব শাসনাধীন গোবিন্দপুর মৌজা খাজনা, অনাবাদি জমি, পুষ্করিণী, বাগবাগিচা, মৎস্য শিকার, বনভূমি, কারুশিল্পীদের কর আদায় ও ভোগের অধিকার, তৎসহ সংলগ্ন ভূমি যা এই সময় পর্যন্ত আমাদের মালিকানায় ও ভোগদখলে ছিল এই বস্তু (সম্পত্তি) নির্দায় বৈধ ও মোকদ্দমাযুক্ত (যা নির্দায় ক্রয় বিক্রয়ের বাঁধাস্বরূপ হতে পারত) বর্তমানে মুদ্রায় এক হাজাব তিনশ টাকাব বিনিময়ে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ আনুষঙ্গিক বস্তু ও অধিকারসহ বিক্রয় করেছি এবং আইন অনুযায়ী এই দলিল করছি ; উক্ত ক্রয় উক্ত ক্রেতার মালিকানা হতে আমাদের মালিকানায় হস্তান্তবিত হয়েছে এবং আমরা উক্ত খরিদা বস্তু তাকে দিয়ে দিয়েছি এবং সকল প্রকার না হক দাবি এই দলিল হতে বাদ দিয়েছি এবং আমরা এই নির্বিশেষ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যদি কোন ব্যক্তি উক্ত চৌহদ্দিতে অধিকারী থাকা বিধায় দাবিদার হন, তা হলে (ক্রেতার অধিকার) রক্ষার দায়িত্ব আমাদের থাকবে এবং এর পরবর্তী কোন সময়ে আমবা বা আমাদের প্রতিনিধি তর্কাতীত এবং সম্পূর্ণ কোনরূপেই উক্ত চৌহদ্দিতে দাবিদার হবেন না; এবং (সেই) মোকদ্দমার ব্যয় কোম্পানিকে বহন কবতে হবে না, প্রয়োজন হলে এই দলিল যাতে সাক্ষ্যরূপে পেশ করা যেতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আমরা এই দলিল লিখিয়ে (ক্রেতাকে) দিলাম। হিজরি সনের ১১১০ সনে জামাদি ১ মাসের ১৫ তারিখে যা গৌরবান্বিত ও সমৃদ্ধ রাজত্বের ৪৪তম বছরের সমতুল।

তাবিখ হল, ১০ নভেম্বর ১৬৯৮।

[রায়নামার মূল দলিলটি বৃটিশ মিউজিয়ামে রয়েছে। পুঁথি সংখ্যা ২৪০৩৯, নথি সংখ্যা-৩৯। মিঃ ডবলিউ আরউইন, সি. এস. কর্তৃক ফার্সি থেকে ইংরেজিতে অনূদিত। মিঃ সি. আর. উইলসন সাবর্ণ জমিদার বংশের শ্রদ্ধেয় অতুলকৃষ্ণ রায়কে (A. K. Roy) দিয়েছিলেন। তিনি কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে (সেন্সাস রিপোর্ট ১৯০১) প্রকাশ করেন। বাংলা অনুবাদটি এই তথ্যসূত্র থেকে হয়েছে।]



Old Fort William in Bengal (vol-II) by - C. R. Wilson

১৭৪২ খ্রীঃ Scrapton-এর জরীপের উপর ১৭৫৬ খ্রীঃ কলকাতার মানচিত্র। ম্যাপে গঙ্গার বাঁক নেওয়া রূপ

পূর্ব কলকাতার পূর্ব কথা

কলকাতা নিয়ে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। ঐতিহাসিক গবেষণায় তথা সমৃদ্ধ আলোচনার মধ্য দিয়ে কলকাতা নামকরণের সঠিক কারণ বের করা সম্ভব হয় নি, তবে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন 'কলকাতা' নামকরণের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে একটি নূতন তথ্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই তথ্যের সন্ধানে বেরিয়ে খুঁজে পাওয়া গেল পূর্ব কলকাতার ঋদ্ধ ঐতিহ্যপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রকে। নূতন তথ্যের আলোকে আমরা দেখব গোবিন্দপুর-সুতানুটি-কলকাতার বাণিজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে ইংরেজ আগমনের বহু আগে থেকে গড়ে ওঠা পূর্ব কলকাতার বিখ্যাত আর একটি বিশাল বাণিজ্য-কেন্দ্রকে, যার ব্যাপ্তি উল্টোডাঙ্গার দক্ষিণদ্বারী থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত।

প্রথমে, শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন 'কলকাতা' নামকরণ নিয়ে যে নূতন তথ্যটি দিয়েছেন সেই প্রসঙ্গটি দেখা যাক। শ্রদ্ধেয় সেনের মতে- "কলিকাতা নামটি নিয়ে কল্পনা-জল্পনা গল্প গাথা অনেক দিন থেকেই প্রচলিত হয়েছিল। ..আমি অনুমান করি 'কলি' (আরবি) মানে 'অস্থির, নির্বোধ' এবং 'কাতা' (আরবি) মানে বদমাইসের দল ; খুনেরা। গঙ্গার পূর্বকূলে এই অংশে একদা খাল ও খাঁড়ি ছিল। সেখানে জলদস্যুরা ফৌজদারের পাহারা এড়াতে পারত। এই ব্যাখ্যার কাছাকাছি আরও একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 'কলি' (তদ্‌ভব) মানে সরু খাল (তুলনীয় সংস্কৃত 'কুল্যা' মানে কুলি) 'কাতা' মানে পাকানো দড়ি (তুলনীয় ছড়া 'আয়রে আয় ছেলের কাতা মাছ ধরতে যাই')।..

কলিকাতা নামটির মদীয় ব্যুৎপত্তি যে যথার্থ তার প্রমাণ পাচ্ছি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে। এই কাব্যের কোনো কোনো প্রাচীন পুঁথিতে কলিকাতাকে কুচিনান বলা হয়েছে। যেমন—

কালিঘাটা মহাস্থান   কলিকাতা কুচিনান
দুইকূলে বেসাইআ হাটে
ডানিবামে জত গ্রাম   তার কত লব নাম
বন্ধন ভোজন হাণ্ডুঘাটে।

কুচিনান আসলে কুচিনাল, ছন্দের অনুরোধে ন-কার হয়েছে। কুচিনাল কথাটির মানে হল সরু নালা অর্থাৎ খাল যেখানে।

এই পাঠ যদি মৌলিক হয় তা হলে কলিকাতা গ্রামের ইতিহাস আরও একশ বছর পিছিয়ে যায়।"

এমনভাবে উপরের ঐ উদ্ধৃতি অন্য পুঁথিতে রয়েছে

ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান
দুই কূলে বসাইয়া বাট।

পাষাণে রচিত ঘাট দু'কূলে যাত্রীর নাট
কিঙ্করে বসায় নানা হাট॥

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। এর বহু পুঁথিতে এমন কী সুপ্রাচীন পুঁথিতেও উপরে উদ্ধৃত অংশটি মেলে। সুতরাং এর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

'কলিকাতা'র সঙ্গে 'কুচিনান' মৌলিক পাঠ, সুতরাং কলকাতার লাগোয়া 'কুচিনান' বলে একটি স্থানের হদিস পাওয়া গেল, যে স্থানের 'দুই কূলে' 'নানা হাট'-এর উল্লেখ রয়েছে। একই সঙ্গে জব চার্নকের কলকাতা পদার্পণের প্রায় একশ বছর আগে 'কুচিনান' অঞ্চলে 'পাষাণে রচিত ঘাট'-এর কথা এর সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে।

সঙ্গত কারণেই শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের বলা 'কুচিনান আসলে কুচিনাল'—এই অনুমানকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। তা ছাড়া ১৫৯৪ থেকে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'কুচিনান' বানানই 'কুচিনাল'কে পাওয়া যাচ্ছে। কুচিনান কোথায় ছিল তা শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন খুঁজে পাননি। কুচিনান ছিল সেকালে ডিহি শুঁড়ার মধ্যে, অঞ্চলটির একদিকে মানিকতলা মেন রোড, অন্যদিকে নারকেল ডাঙ্গা মেন রোড, একপাশে কাঁকুড়গাছি ও অন্যপাশে নিউ ক্যানেল।

১৮৫২-৫৬ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চান্ন গ্রামের যে ম্যাপ 'The City and Environs of Calcutta' নামে পরিচিত, ঐ ম্যাপে Circular Canal শুরু হয়েছে বাগবাজার-চিৎপুর ব্রিজ ঘাট (Chitpoor or Baugbazar Bridge) থেকে। এখান থেকে নারকেল ডাঙ্গা সাউথ পর্যন্ত পাঁচটা ব্রিজ ছিল ১. ব্যারাকপুর ব্রিজ (Barrackpoor Bridge) ২. দমদম ব্রিজ (Dum Dum Bridge) ৩. উল্টাডাঙ্গা ব্রিজ (Ultadangah Bridge) ৪. মানিকতলা ব্রিজ (Manicktolla Bridge) ৫. নারকেল ডাঙ্গা ব্রিজ (Narikaldangah Bridge)।

শ্যামবাজার (Sham Bazar) বেলগাছিয়ার (Belgatchya) দিয়ে খালের উপর দিয়ে দমদম ব্রিজ পেরিয়ে বেলগাছিয়া পড়ার মুখে সার্কুলার ক্যানেলের নূতন মুখ কেটে (New Cut) নূতন খালের (New Canal) সঙ্গে যোগ করেছে। এই সংযোগ স্থলটি V (ভি)-র মতো দেখতে হয়েছে। বাঁ দিকে লেখা রয়েছে New Cut আর ডান দিকে লেখা রয়েছে Dock। এই Dockটি বেলগাছিয়া রোডের মুখে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই নূতন খালটি এপাড়ে উল্টোডাঙ্গা (ultadangah) East, West, South এবং বড় রাস্তাটি উল্টাডাঙ্গা মেইন রোড নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণদ্বারীকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল, ১. নিজ দক্ষিণদ্বারী সেন্টার (Neej Dukhyan Daree, Centre) ২. দক্ষিণদ্বারী নর্থ (Dukhyan Daree, North) ৩. দক্ষিণদ্বারী সাউথ (Dukhyan Daree, South)। দক্ষিণদ্বারীর একটা বড় অংশের নাম ছিল KAKOORAH আর লেকের দিকে অনেকটা অঞ্চল জুড়ে ABAD (আবাদ) লেখা রয়েছে।

মানিকতলা মেইন রোড সোজা সল্টলেকের দিকে গিয়েছে। এর উত্তর দিকটায় লেখা রয়েছে GHOORERABAD (ঘোরেরাবাদ) আর মানিকতলা মেইন রোডের নীচের দিকে

কাঁকুড়গাছি (KANKOORGATCHA) দেখানো হয়েছে। কাঁকুড়গাছির পূর্ব দিকে বড় করে লেখা রয়েছে (KOOCHNAN (কুচিনান), আর পূর্বে রয়েছে দত্তাবাদ (DOTTABAD)। কাঁকুড়গাছি রোডের পাশে দেখা যাচ্ছে কাঁকুড়গাছি লেন, তার পাশেই রয়েছে কুচিনান রোড ও কুচিনান লেন।

এই ম্যাপ অনুসারে কাঁকুড়গাছি-কুচিনানের পরের বড় করে একটি অঞ্চলের নাম লেখা রয়েছে শুঁড়া (SORAH EAST)। অঞ্চলটি ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল। নোনা জলের হ্রদের দিকে (সল্ট লেক) ABAD-এর লাগোয়া BALLIA GHAT (NORTH), আর বেলেঘাটা মেইন রোডের লাগোয়া দক্ষিণে BELIAGHATTA PHARRY এবং এর দক্ষিণে বেলেঘাটা সাউথ (BELIAGHATTA. SOUTH)। বেলেঘাটা নর্থের পশ্চিমদিকে একটি বিশাল পাড়া JALLEAH PARAH (জেলে পাড়া) বলে দেখানো হয়েছে। জেলে পাড়ার দক্ষিণে রয়েছে ফড়ে পাড়া (FORRA PARRAH)। এর পাশে দেখা যাচ্ছে ইহুদী গঞ্জ (IHODI GUNGE)। খালের এক পাড়ে রয়েছে ধাপা টোল হাউস (DHAPA TOOL HOUSE), অন্য পাড়ে চিংড়িঘাটা (CHINGREE GHATTA)।

পূর্ব কলকাতার দক্ষিণদ্বারী, উল্টোডাঙ্গা, বাগমারী, কাঁকুড়গাছি, কুচিনাল, নারকেলডাঙ্গা, শুঁড়া, বেলেঘাটা, শিয়ালদা—এই অঞ্চল জুড়ে এক সময় গড়ে উঠেছিল বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ রয়েছে কুচিনান, বেলেঘাটা, ধনগুা-র। এই অঞ্চলের বাণিজ্যের সঙ্গে সুতানুটি-গোবিন্দপুরের বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। সেই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস খুঁজতেই আমরা প্রথমে আলোচনা করবো গোবিন্দপুর ও সুতানুটি।

গোবিন্দপুর ঃ সুতানুটি

সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম নিয়ে আজকের কলকাতা। সেই সময় এই তিনটি গ্রামের অবস্থান ছিল, উত্তরে চিৎপুর খাল, দক্ষিণে কালীঘাট, পশ্চিমে গঙ্গা আর পূর্বে মারাঠাখাল। এই তিনটি গ্রামের মধ্যে গোবিন্দপুর ও সুতানুটি গ্রাম দুটির পত্তন ও নামকরণ সপ্তগ্রামের শেঠ-বসাকগণ করেছিলেন বলে দাবি করেন। একঘর শেঠ অর্থাৎ মৌদ্গল্য গোত্রীয় মুকুন্দরাম শেঠ আর চার ঘর বসাক অর্থাৎ অগ্নিঋষি গোত্রীয় কালিদাস বসাক, ব্রহ্মঋষি গোত্রীয় বাসুদেব বসাক, অলম্বঋষি গোত্রজ রাবপতি বসাক এবং অলদ্ঋষি গোত্রজ করুণাময় বসাক গোবিন্দপুরে এসে প্রথম বসতি করেন। এঁরাই কলকাতার শেঠ-বসাক পরিবারের আদিপুরুষ।

সপ্তগ্রামে যখন এঁরা ছিলেন, তখন ব্যবসা করার জন্য এঁদের বরানগরে আসতে হতো। তাঁরা নিজেরা জানিয়েছেন[১]—'বরানগরের তন্তুবায়দের কাছে বস্ত্রাদি বয়ন করিয়ে বিদেশি বণিকদের কাছে সরবরাহ করতেন। এই জন্য তাঁরা 'দাদ্নী-বণিক' নামে খ্যাত ছিলেন।' এর পর সপ্তগ্রাম থেকে তাঁরা সপরিবারে কলকাতা অঞ্চলে চলে আসেন। কোথায় কেমন করে প্রথম বসতি স্থাপন করেন তার ইতিহাস দেওয়া রয়েছে শেঠ বসাকদের পারিবারিক ইতিহাসে। সেখানে লেখা হয়েছে[২]—

১. কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস পৃ ১৫ — নগেন্দ্রনাথ শেঠ

২. তদেব পৃ ১৪

'খৃঃ ১৫২০-৩০ অঃ মধ্যে সরস্বতী নদী মজে যাওয়া শুরু করলে সপ্তগ্রামে বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতি হতে থাকে। তখন শেঠ-বসাক বণিকরা শিবপুরের কাছে বিটোরে (বেতরায়, বাঁটরায়) পর্তুগীজদের সঙ্গে কাপড়ের ব্যবসা করতে যেতেন। তখন সামুদ্রিক বাণিজ্যতরী গার্ডেনরীচে লঙ্গর করত। সে সময়ে বিটোর বৈদেশিক বণিকদের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিটোরের বাণিজ্যের অবসাদ কালে শেঠ-বসাকরা 'ধনস্ত' গ্রামে প্রাচীন কলকাতায় পর্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, দীনেমার, ফরাসী, জার্মানি প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য গমনাগমণ করতেন। ধনী শেঠদের নাম হতেই 'ধনস্ত' গ্রাম নামে খ্যাত হয়।

সপ্তগ্রামের অবসাদকালে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে মৌদ্‌গল্য গোত্রীয় মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠী, অগ্নিঋষি গোত্রীয় কালীদাস বসাককে নিয়ে কালীক্ষেত্রে (কালিঘাটে) এসে প্রথম বসতি করেন। তাঁর গৃহদেবতা গোবিন্দজীউকে সেখানে স্থাপিত করেন। গোবিন্দজীউর নামানুসারে ঐ স্থানের নাম গোবিন্দপুর হয়। ঐ স্থানটি নাবাল ও অস্বাস্থ্যকর থাকায় পরে তা ধাপ্পাধারা গোবিন্দপুর নামে বিদিত হয়। কিছুদিন পরে সেখান থেকে উঠে এসে বর্তমান লালদিঘীর উঁচু ভূমিতে বসবাস করেন এবং গোবিন্দজীউকে এখানে স্থাপিত করেন। গোবিন্দজীউর নামানুসারে এই গ্রামের নাম গোবিন্দপুর হয়।

প্রাচীন কলকাতা অঞ্চলে বৈদেশিক বণিকগণের সতত সমাগম দেখে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠী তাঁর কুলদেবতা শ্রীশ্রী ˇগোবিন্দ রায় জীউকে নিয়ে অগ্নিঋষি গোত্রজ কালিদাস বসাকের সঙ্গে কালীক্ষেত্রে এসে প্রথমে বসতি করেন। ঐ জায়গাটি কালীদেবীর পীঠস্থানের এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে আদিগঙ্গার সংযোগস্থলে, গঙ্গার পূর্বকূলে অবস্থিত ছিল। সেখানে তাঁর কুলদেবতা গোবিন্দজীউকে স্থাপন করেন। গোবিন্দজীউর নামানুসারে এখানকার নাম হয় গোবিন্দপুর। আগে ঐ জায়গাকে কালীক্ষেত্র বলতো। আস্তে আস্তে তা 'কলিকাতা' নামে রূপান্তরিত হয়। এখানে ধনী শেঠ-বসাকেরা বসবাস করতো বলে কবিকঙ্কন চণ্ডী কাব্যে 'ধনস্ত গ্রাম' নামে বর্ণনা করা হয়েছে। জায়গাটি নাবাল ছিল. বছর বছর লবণ হ্রদের (বাদার) জল এসে ভেসে যেতো। জল নেমে গেলে ধীবরেরা মাছ ধরে শুকতো বলে জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হয়ে মহামারী হতো। কালক্রমে এ স্থানটি 'ধাপ্পাধারা গোবিন্দপুর' নামে খ্যাত হয়। এর দক্ষিণ সীমান্ত খাতটি 'গোবিন্দপুর খাত' (বুড়ি গঙ্গা) নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রাচীন কলকাতা তখন সুন্দরবনের মধ্যে ছিল, ছিল হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল। ছিল চোর ডাকাতের ভয়। অধিকাংশ জায়গা ছিল জলময় এবং খালে বিলে পরিপূর্ণ। মুকুন্দরাম অস্বাস্থ্যকর ধাপ্পাধারা গোবিন্দপুর ছেড়ে বর্তমান লালদিঘী অঞ্চলে চলে আসেন। সেখানে নবাব সরকার হতে অনেক জমিজমা নিয়ে, জঙ্গল কেটে, জলাশয় খনন করিয়ে গৃহনির্মাণ করেন এবং সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। তাতেই শেঠ-বসাকরা 'জঙ্গলকাটা বাসিন্দা' নামে খ্যাত হয়। তিনি তাঁর ভদ্রাসনের সংলগ্ন দিঘীর পাড়ে গোবিন্দজীউর মন্দির তৈরি করেন। বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং ও লালগীর্জার জায়গায় এই ঠাকুরবাটি ছিল। মন্দিরের সংলগ্ন পুরো জায়গাটিরই নাম হয় গোবিন্দপুর। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই গ্রামের নাম গোবিন্দপুর হয়।



by James Baillie Fraser

হোয়াইট কলকাতার নেটিভ টাউন।



by Solvyns

দেশীয় বাজারের খেটে খাওয়া মানষ।



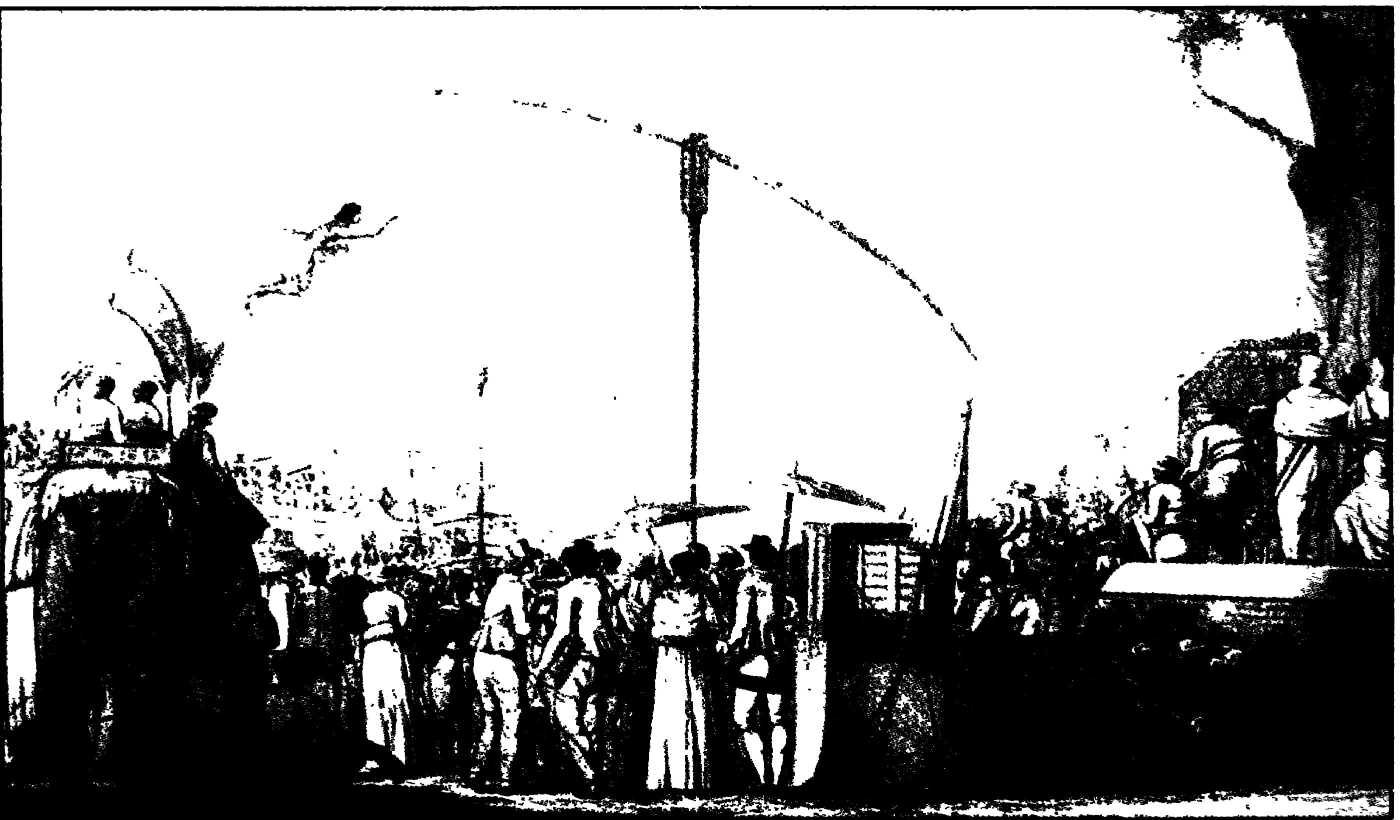
by Solvyns

দেশীয় শিল্পী ঃ বাবুবাড়ীর অনুষ্ঠান।



by Solvyns

দেশীয পাড়ার দেশীয় বাজারে কেনা-বেচার মুহূর্ত।



by Solvyns

নেটিভ টাউনের নেটিভ উৎসব চড়কের মেলায় হোয়াইট টাউনের সাহেব।



by Solvyns

নেটিভ টাউনের কালীপূজার বিসর্জনের শোভাযাত্রা।



by George Lambert and Samuel Scott

কলকাতা বন্দরে দেশী বিদেশী নৌযান।



by Jan van Ryne

পুরনো ফোর্ট উইলিয়ামের লাগোয়া গঙ্গায় ব্যবসায়ীদের নৌযান।

উপরের লেখা থেকে প্রধানত দুটি বিষয় আমরা পাচ্ছি, এক, ১৫২০-৩০ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রাম থেকে শেঠ বসাকগণ প্রথমে বেতড়, পরে বেতড় থেকে 'ধনস্থ' গ্রামে বাণিজ্যের জন্য আসেন। এই 'ধনস্থ' গ্রাম ধনী শেঠদের জন্যই হয়েছে এবং কলকাতার আদি নাম 'ধনস্থ'। দুই, ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে 'প্রাচীন কলকাতা অঞ্চলে বৈদেশিক বণিকগণের সতত সমাগম দেখে মুকুন্দরাম শেঠ, কালিদাস বসাক এঁরা প্রথমে কালীঘাটের কাছে আদিগঙ্গার তীরে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে, গৃহদেবতা গোবিন্দজীউকে স্থাপন করে গোবিন্দপুরের পত্তন করেন, পরে যা 'ধাপ্পাধারা গোবিন্দপুর' নামে গ্রাম ও 'গোবিন্দপুর খাত' নদীর শাখাটির নামকরণ হয়। শেষে কালীঘাটের ধাপ্পাধারা গোবিন্দপুর থেকে বর্তমান লালদিঘী অঞ্চলে নবাব সরকারের কাছ থেকে জমিজমা নিয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং গৃহদেবতা গোবিন্দজীউর নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম গোবিন্দপুর করেন, শুধু তাই নয় ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন নামকরণ তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলেও দাবি করেন।

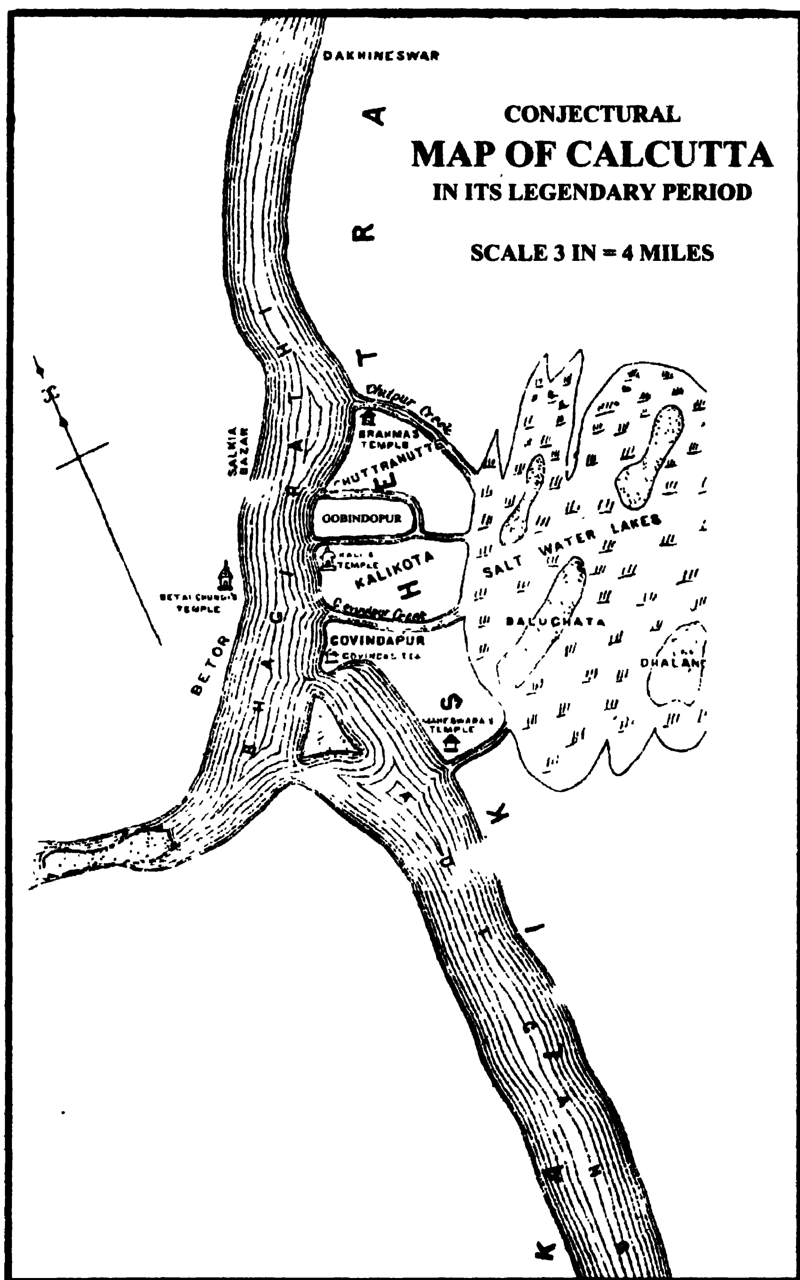
শেঠ-বসাকদের দাবি থেকে দুটো গোবিন্দপুরের উল্লেখ পাচ্ছি, ১. ধনস্থ বা ধাপ্পাধারা গোবিন্দপুর ২. সুতানুটি-গোবিন্দপুর। প্রথম যুগের দুই গোবিন্দপুরের যে চিত্রটি পাওয়া যায় তা সল্ট ওয়াটার লেকের মানচিত্র দেখলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে (১৪১৭ শকাব্দ) রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসা মঙ্গল'-এ 'ধনণ্ড' এবং 'ধনস্থ' দুটি জায়গার নাম পাচ্ছি। মানচিত্রে বালুঘাটার পাশে ধনণ্ড দেখানো রয়েছে, আজও সল্টলেক অঞ্চলে ধনন্দার পরিচয় বহন করছে।

'মনসামঙ্গল' কাব্যে চিতপুর, ধনণ্ড, কালীঘাট এবং ধনস্থান-এর বর্ণনা রয়েছে এই ভাবে —

"চিতপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা
নিশি দিসি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা।
পূর্ব কূল বাহিয়া এড়ায় **কলিকাতা**
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা।
স্নান তর্পণ করি কৈল ইষ্টি-পূজা
পূজিল বেতাই চণ্ডী চাঁদো মহারাজা।
নানা উপহারে কৈল রন্ধন ভোজন
ধনণ্ড বাহিয়া গেল ত্বরিতগমন।
কালিঘাটে চাঁদো রাজা কালিকা পূজিয়া
চুড়াঘাট বাহি যায় জয়ধ্বনি দিয়া।
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে
বাহিল বারুইপুর মহাকোলাহলে।"

মনসা মঙ্গলে কলকাতা এবং ধনস্থান আলাদা জায়গা হিসেবে দেখানো হয়েছে, সুতরাং শেঠ-বসাকদের দাবি অনুসারে কলকাতার প্রাচীন নাম 'ধনস্থান, তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে হয়।



দুটি গোবিন্দপুর। একটি সুতানুটির পাশে, অন্যটি কালীঘাটের গায়ে।

ধনস্থান বা ধাপ্পাধারা গোবিন্দপুরের প্রতিষ্ঠাতা শেঠ-বসাকগণ সুতানুটি-গোবিন্দপুরের প্রতিষ্ঠাতা নন একথা জোড় দিয়ে বলা যায়। কারণ সুতানুটি-গোবিন্দপুর তাঁদের প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরা সুতানুটি থেকে অনেক দূরে গিয়ে ধাপ্পাধারা গোবিন্দপুরের প্রতিষ্ঠা করতেন না। শ্রদ্ধেয় এ. কে রায় তাঁর 'কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে' (পৃ. ২৪) জানিয়েছেন—'পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের জন্য সপ্তগ্রামের বহু বণিক গোবিন্দপুর ও গার্ডেনরীচের দিকে আকৃষ্ট হন তাঁরা বিপুল সংখ্যক তন্তুবায়কে এনে সূতা ও কার্পাস তূলার ব্যবসা আরম্ভ করেন—এই ব্যবসায়ে পর্তুগীজরাও অংশগ্রহণ করেন।' যদি শেঠ-বসাকরাই প্রতিষ্ঠাতা হন তা হলে গোবিন্দপুরের দিকে তাঁদের আকৃষ্ট করার কথা বলা হলো কেন? এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথম গোবিন্দপুর আগে হয়ে থাকলে তার প্রতিষ্ঠা কে করেছেন?

যশোরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক বৌদ্ধ পরিব্রাজক কবিরাম গোবিন্দপুর প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"ইদানীং নৃপশার্দ্দূল চরভূমৌ কথা শৃণু।
কালীদেব্যাঃ সন্নিধৌ চ গঙ্গায়াং প্রাচ্যকে তটে॥১০৫২

গোবিন্দদত্তো রাজা চ কলিবেদাব্দসহস্রগে।
সিন্ধুসঙ্গমতীর্থযাত্রাকরণার্থং সমাগতঃ॥ ১০৫৩

গোবিন্দদত্তভূপালং তীর্থাৎ প্রত্যাগতং শুভম্।
কালীদেবী স্বপ্নচ্ছলে নৌকায়ানন্তমুবাচ হ॥ ১০৫৪

অকর্ষণীপুরীং রাজন্ আগচ্ছ হি মমাজ্ঞতঃ।
বাদর-রসা-পৃথিব্যাঞ্চ ছেদয়িত্বা তৃণাদিকম্॥ ১০৫৫

পুরং........মহতীং মৎসকাশতঃ।
প্রাপ্স্যৎসি শৃণু ভূপাল তে কল্যাণং ন চেদপি॥ ১০৫৬

কালীদেব্যা বচো জ্ঞাত্বা গঙ্গায়াশ্চ তটান্তরে।
বসতিং ভূয়সীং তত্র চকার হি মুদান্বিতঃ॥ ১০৫৭

পারীন্দ্রগ্রামাৎ সর্ব্বাণি দ্রবিণানি মহীপতিঃ।
আনয়িত্বা চ বসতিং কৃতবান্ সুরসরিত্তটে॥ ১০৫৮

লাঙ্গুলী দ্বিস্কন্দযুতঃ দেব্যাঃ পৃষ্ঠে চ বর্ত্ততে।
যদাদেশেন তন্মূলে............॥ ১০৫৯

প্রাপ্তা তনৈব ভূপেন মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিশি।
কাঞ্চনকর্ষপূরিতাশ্চালভ্যা দেবাসুরৈরপি॥ ১০৬০

ভূরীণি দ্রবিণান্যেব প্রাপ্য গোবিন্দভূপতিঃ।
চতুঃষষ্টিসংখ্যকৈশ্চ বলিভিঃ পূজনং কৃতম্॥ ১০৬১

গোত্রবৃদ্ধ্যা বৃত্তবৃদ্ধ্যা তেজোবৃদ্ধ্যা হি ভূমিপ।
বভূব গোবিন্দদত্তো বর্দ্ধিষ্ঠপ্রবরো মহান্॥ ১০৬২

ভাগীরথীপূর্ব্বতটে পুরীবর্দ্ধনহেতবে।
বাস্তুযাগং দ্বিজান্ নীত্বা চকার বাসহেতবে॥ ১০৬৩

—'হে নৃপতি শ্রেষ্ঠ! এক্ষণে চরভূমির কথা বলছি শ্রবণ কর। গঙ্গার পূর্বপারে কালীদেবীর সন্নিকটে চার হাজার কল্যাব্দে গোবিন্দ দত্ত নামক একজন রাজা গঙ্গাসাগর তীর্থের উদ্দেশে আগমন করেন। যখন তিনি তীর্থকার্য সম্পন্ন করে ফিরে আসেন, সেই সময়ে কালীদেবী নৌকামধ্যেই তাঁকে এমন স্বপ্নাদেশ করেন ; 'রাজন! তুমি আমার আজ্ঞায় অকর্ষণ পুরীতে (যে ভূমি কর্ষিত হয় নাই) আগমন করে আমার নিকটবর্ত্তী বাদররসা ভূমিতে তৃণগুল্মাদি পরিষ্কার করে একটি মহাগ্রাম সংস্থাপন কর। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করলে তোমার অমঙ্গল হবে।' রাজা দেবীর আদেশ অবগত হয়ে পারীন্দ্র গ্রাম হতে নানাবিধ ধনরত্ন আনয়ন করে সুরধুনী তটে বসতি স্থাপন করলেন। গোবিন্দদত্ত স্বপ্নকালে দেবীর পৃষ্ঠদেশে যে স্কন্ধদ্বয় যুক্ত লাঙ্গল দেখেছিলেন, পবে দেবীর আদেশে ঐ রকম লাঙ্গল দিয়ে তথাকার ভূমি খনন করে প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ঐ অর্থ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে গোবিন্দদত্ত চতুঃষষ্টি বলি দ্বারা দেবীর পূজা করেন। ধন, ধান্য, বংশ ও বলের বৃদ্ধি প্রযুক্ত তিনি কালক্রমে ঐ স্থানের বর্দ্ধিষ্ঠ লোক হয়েছিলেন। এইরূপ অচিন্তিত ঐশ্বর্য্যলাভে তিনি পুরীর শ্রীবৃদ্ধি এবং ঐ স্থানে বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বাস্তুযাগ করিয়েছিলেন।'

কবি রামের লেখা থেকে জানা গেল গোবিন্দপুরের প্রাচীন নাম 'বাদররসা'। 'বাদররসা'র 'বাদর' শব্দের অর্থ হলো কার্পাস বৃক্ষ, আর 'রসা' শব্দের অর্থ হলো পৃথিবী'।[১] এই নামকরণ থেকে মনে হয় এখানে প্রচুর কার্পাস বৃক্ষ ছিল। তিনি লিখেছেন—গোবিন্দদত্তো রাজা চ কলিবেদাব্দসহস্রগে'। অর্থাৎ চার হাজার কল্যাব্দে গোবিন্দ দত্ত এখানে এসেছিলেন। কল্যাব্দ থেকে ৩১৭৯ বিয়োগ করলে শকাব্দ এবং শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। সুতরাং ৪০০০ কল্যাব্দ থেকে ৩১৭৯ বাদ দিলে ৮২১ শকাব্দ এবং এর সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে ৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে, সুতরাং গোবিন্দ দত্ত ৪০০০ কল্যাব্দে বা ৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দপুরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অনার্য অধিকৃত জমি যখন কোন আর্য রাজা গ্রহণ করেছেন. সেই ঘটনাকে তখন রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হত। অহল্যার পাষাণ উদ্ধারের কাহিনী তেমনি রূপক বলে কবিগুরু জানিয়েছেন —'যে ভূমি হালচালনের অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়াছিল রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।'' 'অকর্ষণ পুরী' বাদররসায় রাজা গোবিন্দ দত্তের লঙ্গল দিয়ে

১ ছাত্রবোধ অভিধান—আশুতোষ দেব পৃ. ৮৯৩, ৯৯৩

ভূমি খনন', 'দেবীর পৃষ্ঠদেশে 'স্কন্দদ্বয় যুক্ত লাঙ্গল' প্রভৃতি অনার্য পতিত জমিতে আর্য রাজাদের চাষাবাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ও এই অনুমান করেছেন—'কবিরামের লিখিত কাহিনী হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয়—যে গঙ্গাসাগর যাত্রী রাজা গোবিন্দ দত্ত সেই ইতিহাস বর্জিত পুরাকালে জঙ্গল কাটাইয়া কালীর স্বপ্নাদেশে কালীক্ষেত্রের একটু উন্নতি করিয়াছিলেন।'

আমাদের বিশ্বাস, বাদররসা গ্রামকে এই গোবিন্দ দত্ত ৮৯৯ খ্রিঃ গোবিন্দপুর নামকরণ করেছিলেন। বাদররসা গ্রামটি আক্ষরিক অর্থেই কার্পাস বৃক্ষের গ্রাম—সুতরাং এই গ্রামকে কেন্দ্র করে সুতোর কারখানা গড়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক, হয়েছিলও তাই। দেশীয় বণিকদের জন্যই পর্তুগীজরা এই অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হন। সুতানুটির হাটও সেই কারণেই এত প্রাচীন বলে মনে হয়, পর্তুগীজরা কার্পাস তুলোর একটা কারখানা করেছিলেন ক্লাইভ স্ট্রিট এলাকাতে। ওদের ভাষায় এই কারখানার নাম হয় 'আল্‌গোদাম', এর অর্থ তুলোর দেশ।

তুলোর দেশে সুতোকে নুটি করার কারখানা হবে না তো কোথায় হবে! সুতোর নুটি থেকেই সুতানুটি নাম হোক বা সুতো হাটের সঙ্গে নটী বা বারবনিতাদের জন্য সুতানুটী নাম হোক তাতে কিছু যায় আসে না, তবে এই অঞ্চলটি তুলোর দেশ ছিল বহুকাল ধরে একথা সত্য।

ডিহি শুঁড়ার মধ্যে শুঁড়া, কাঁকুড়গাছি, কুচিনান ও দত্তাবাদ গ্রাম ছিল। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে শুঁড়া ও কাঁকুড়গাছি গ্রাম কেনার অনুমতি ইংরেজরা পেলেও 'কুচিনান' ও 'দত্তাবাদ' কিনতে পারেন নি। কিনতে পারেননি বেলেঘাটা গ্রামও। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দেও 'কুচিনান' অঞ্চল অর্থাৎ ডিহি শুঁড়ার মধ্যে মাত্র শুঁড়া গ্রামের রাজস্ব আদায় ছিল সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ দক্ষিণদ্বারী থেকে বেলেঘাটা—এই অঞ্চলটি ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দেও প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিদ্যাধরী নদীর তীরের এই বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে গোবিন্দপুরের গঙ্গার সোজাসুজি যোগাযোগ ছিল গঙ্গার একটি ধারার মাধ্যমে। এই খালটি বুজিয়ে পরে ডিঙ্গাভাঙ্গা লেন, ক্রিক রো তৈরি করা হয়েছে। বেলেঘাটা থেকে এই খাল বরাবর শিয়ালদা দিয়ে সোজা যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে বি.বা.দী বাগের দিকে—ঐ রাস্তাটির নাম বৈঠকখানা রোড।

শ্রদ্ধেয় প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এই বৈঠকখানা কুচিনান-বেলেঘাটা-গোবিন্দপুরের বাণিজ্য কেন্দ্রের মাঝে বিরাট এক বটবৃক্ষ তলে বৈঠক করার স্থান ছিল বলে জানিয়েছেন—

'বৈঠকখানা বাজার।[১] এই বাজারটিই কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী হবার প্রধান আকর্ষণ। যে ফটক দিয়ে ট্রাম গাড়ি শিয়ালদা স্টেশনে যাতায়াত করে, সেই দক্ষিণ ফটকের সম্মুখে সার্কুলার রোডের চৌমাথার মধ্যস্থলে একটি বহু বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষ ছিল। তার একটি শাখার নিচে একটি ৭০ ফুট উঁচু বড় রথ থাকতো। এই রথটি অবশ্য সে সময়ের কোন ধনাঢ্য

১ কলিকাতার ইতিহাস পৃ. ৬২

অধিবাসীর হবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা এ পর্যন্ত তাঁর কোন সন্ধান পাইনি। শিয়ালদহ, শুঁড়া ও বালিয়াঘাটা তিনটিই যখন অতি পুরাতন জনপদ, তখন বোধ হয় এরই কোন স্থানে রথাধিকারীর নিবাস ছিল। বাদা পূর্বে সুগভীর থাকায়, পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল হতে বড় বড় নৌকায় নানারকম দ্রব্য এসে বালিয়াঘাটায় পৌঁছতো, তথা হতে বলদযোগে গোবিন্দপুর, চেতলা, সুতানুটী ও বাটোরের হাটে চলে যেতো। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র নৌকো ও তালডোঙ্গায় নিম্নশ্রেণীর বিক্রেতারা এসে বালিয়াঘাটায় নামতো। এই সমস্ত বিক্রেতাদের সম্মিলন স্থান ছিল উপরোক্ত বৃহৎ বটবৃক্ষ। এর নীচে তারা দ্রব্যাদি নামিয়ে বিশ্রাম করতো, রন্ধনাদি করতো এবং সঙ্গীদের জন্য অপেক্ষা করতো। এত লোকের যেখানে সমাগম, সেখানে একটি সুন্দর বাজার হবে, তাতে আর সন্দেহ কী? জব চার্ণক যখন হুগলীতে ছিলেন, তখনও মধ্যে মধ্যে এই বটমূলে এসে দ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানী দেখতেন এবং পাইপ খেতেন। বেনী এবং আপজন উভয়ের মানচিত্রেই উক্ত বটবৃক্ষের চিত্র ও বৈঠকখানা বাজারের উল্লেখ আছে। বটবৃক্ষের অনুরোধে মহারাষ্ট্রে খালকেও সরলরেখা ছেড়ে এখানে একটু বক্র করতে হয়েছিল। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে মার্কুইস অয়েলেসলি সার্কুলার রোড নির্মাণার্থে ঐ বৃহৎ বটবৃক্ষ কাটতে আদেশ দেন।'

১৭৩৭ সনের ঝড়ের সঙ্গে ভূমিকম্পে, পূর্বদিকের ভূমি উঁচু হয়ে খরস্রোতা বিদ্যাধরী নদীর লবণহ্রদের ধারার গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। লবণহ্রদের চলমান স্রোত আটকে বদ্ধ জলায় পরিণত হয়। গঙ্গা-বিদ্যাধরী মিলিত প্রবাহ-তীরে বেলেঘাটা কুচিনান বাণিজ্যকেন্দ্র সে কারণেই বন্ধ হয়ে যায়। চলমান বন্দরের বিশাল আয়ের ভূমিখণ্ড পরিণত হয় বাদায় (জঙ্গলে)। একইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুন্দরবনের বিশাল এলাকা। শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র মিত্র তথ্য সহযোগে মন্তব্য করেছেন[১] এই বলে—"এই সকল ঝটিকার সময় নদীর গতি দুই এক স্থলে এমন বিপর্যস্ত করিয়া দেয় যে, কোন প্রকাণ্ড নদী বালুকা-মণ্ডিত হইয়া প্রবাহশূন্য হয় এবং নিকটবর্তী অন্য একটি ক্ষুদ্র খাল সামান্য পয়ঃপ্রণালী হইতে প্রবল নদীতে পরিণত হয়। কোন কোন স্থান বসিয়া গিয়া জলমগ্ন হয় এবং অন্য কোন স্থান কারণ-বিশেষে দ্রুতবেগে উন্নত হইবার সুযোগ পায়।" "খুলনা ও শিয়ালদহে ভগ্ন বৃক্ষের গুড়ি ও উপরে জোব মাটি দেখিয়া বোধ হয় যে, ভূমির নিমজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রবল ঝটিকা বা জলোচ্ছ্বাস ছিল।"[২]

বহুবাজার

আমাদের বিশ্বাস, গোবিন্দ দত্ত ৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেছিলেন। এই গোবিন্দপুর বর্তমান লালদিঘী অঞ্চল। এখান থেকে নৌকো পথে যেমন বেলেঘাটা বন্দরে আসা যেতো, তেমনি এই দুই স্থানের মাঝে বসতো আর একটি বাজার। যে বাজারে বিক্রি হতো বহুরকম জিনিস—সেই সূত্রেই এই বাজারের নাম হয় বহুবাজার। এই বহুবাজারের

১. যশোর-খুলনাব ইতিহাস ১ম খণ্ড পৃ ৫৩, ৫৭
২. কলিকাতার ইতিহাস পৃ. ২৮

নাম ১৬৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া যাচ্ছে। কৃষ্ণদাস নামে এক কবি বহুবাজারের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি 'নারদপুরাণ' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। ঐ কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন এই বলে—

"আপনি কনিষ্ঠ মোর রামকৃষ্ণ নাম।
সাকিম কলিকাতা বহুবাজারে ধাম।।"

পুঁথি রচনা কালের পয়ারে লেখা হয়েছে—

"দশ দশ শত নিরেনব্বুই সালে।
মাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে।।"

১০৯৯ সাল (বঙ্গাব্দ) ১৬৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দ হয়।

বেলেঘাটা-গোবিন্দপুরের মাঝে বৈঠকখানার পরে ছিল বহু রকমারি দ্রব্যের বাজার, যা থেকে নাম হয়েছে বহু বাজার। কেউ কেউ মনে করেন, বহুবাজারের ধনী বিশ্বনাথ মতিলাল স্থানীয় বাজারটি তাঁর পুত্রবধূকে যৌতুক দেন বলে নাম হয় 'বধূবাজার', তা থেকেই বৌবাজার বা বহুবাজার হয়। এই গল্পের বহু আগে থেকেই বহুবাজার ছিল, সুতরাং এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন জানিয়েছেন—'কবি মুকুন্দের কবিকঙ্কন চণ্ডীর একটি পুঁথিতে (এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত).....লেখক পুস্তিকায় আত্মপরিচয় অংশে বলেছেন যে, তিনি পুঁথিটি লিখেছেন ডিহি কলিকাতার অন্তর্গত বহুবাজারস্থ এক দোকানে বসে।' পুঁথিটির লিপি কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক।

গঙ্গা থেকে চিৎপুর হয়ে গঙ্গার যে শাখা সল্টলেকের দিকে এসে বিদ্যাধরী নদীর জলস্রোত নিয়ে শিয়ালদহ ক্রিক রো হয়ে গঙ্গায় পড়ছে, অন্যটি ধাপ্পাধারা নাম নিয়ে কালীঘাটের কাছে মিশেছে। বন্দর কুচিনান বেলেঘাটা অঞ্চলকে বোঝার জন্য গ্রামগুলির নামকরণ বোঝার প্রয়োজন রয়েছে।

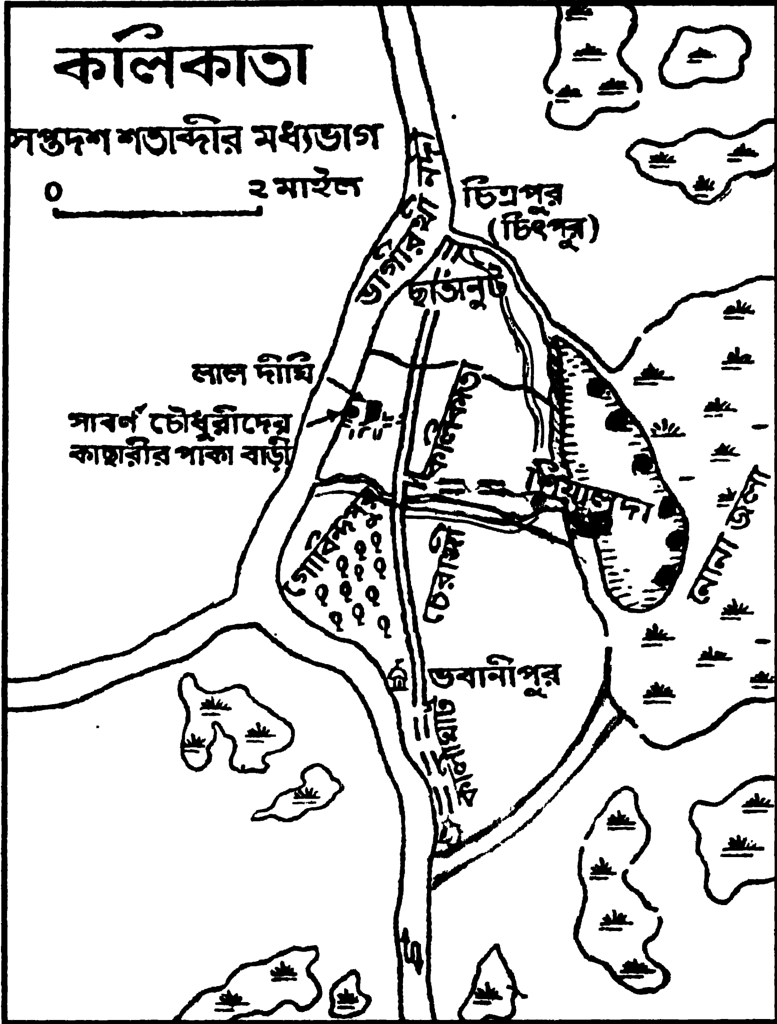
বেলেঘাটা

বেলেঘাটা নামের মধ্যেই রয়েছে বালিযুক্ত ঘাটের কথা। ১৮৬৪ খ্রি. শিয়ালদা অঞ্চলে একটি পুকুর খোঁড়ার বিবরণ পাওয়া যায়, ১৮৩৫ থেকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে ৪৮১ ফুট গভীর পর্যন্ত খনন করেও সুপেয় জলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বালিমাটির স্তরে কেমনভাবে এই অঞ্চলের ভূমিগঠন হয়েছে অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া তথ্য থেকে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে—

বেলেমাটির স্তরে নদীতীরে ঘাট হয়ে 'বেলেঘাটা' নামকরণ হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত অবশ্য মানতে রাজি নন শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন[১] মহাশয়। তাঁর মতে ইংরেজি 'Bailey' থেকে এই নাম হয়েছে। Bailey শব্দটির মানে হল দুর্গ বা প্রাসাদের বাহিরের রক্ষীসেনা। বেলেঘাটা

১. কলিকাতার কাহিনী পৃ. ৪৬

নামটিতেও এই ব্যুৎপত্তি খাটে। একদা এখান দিয়ে যে খাল প্রবাহিত ছিল সেই খালের ঘাটে ফোর্ট উইলিয়মের বাহির-রক্ষীরা যাওয়া-আসা করত।' বেইলি-ঘাটা থেকে বেলেঘাটা।



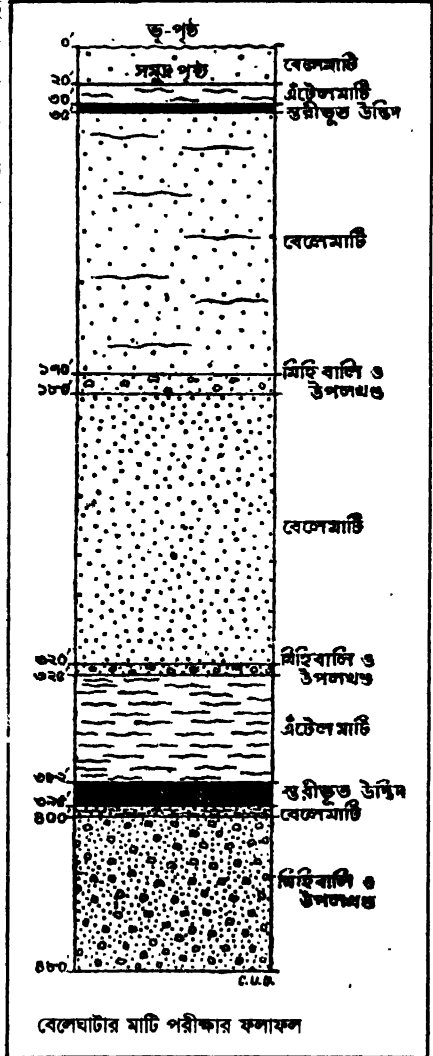
জোব চার্নক আসার আগে লবণ হ্রদ ও কলকাতা।

অনেকে মনে করেন, বন্দর বেলেঘাটায় কেনা জিনিস দূর-দুরান্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ঘাটে 'বলিয়া' নৌকা বাঁধা থাকতো, সেই ঘাটকে বলা হতো 'বলিয়া ঘাট্র', তা থেকেই বলিয়াঘাট বা বেলিয়াঘাটা, লোকমুখে বেলেঘাটা হয়। শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র মিত্র[১] 'বলিয়া' নৌকা

১. যশোহর খুলনার ইতিহাস পৃ. ২১৫

প্রসঙ্গে লিখেছেন—'বলিয়া নৌকা বোধ হয় আমরা যাকে 'ভাউলিয়া' বলি সেরূপ ছোট, লম্বা, একপার্শ্বে ছইওয়ালা দ্রুতগামী নৌকাকে বোঝায়'।

বেলেঘাটা নাম কেমন করে হলো, তা নিয়ে আরো অনেক দাবি রয়েছে, যেমন কেউ কেউ মনে করেন এই ঘাটে একটি 'বেল' গাছ থাকায় এই গাছের নামানুসারে ঘাটের নাম হয় 'বেলঘাটা' তা থেকে বেলেঘাটা হয়। অন্য আর একটি মত আছে, তা অবশ্য গাছ নিয়ে নয়, মাছ নিয়ে। 'বেলে' মাছ সকলেই চেনেন। নরম এই মাছ কিন্তু অগভীর জলে বালি মাটির উপরই শুয়ে থাকে। এই মাছকে কেউ বলে বালিয়া, বাইল্যা বা বালকড়া ইত্যাদি। বেলে মাছ যে ঘাটে পাওয়া যেত সেই ঘাট 'বেলেঘাটা' নামে পরিচিত হয়েছিল। কলকাতা অঞ্চলে বেলেঘাটাতেই প্রথম জনবসতি শুরু হয় বলে একজন দাবি করেছেন—'কলিকাতা পূর্বে বরুণের দেশ ছিল। বেলিয়াঘাটা অঞ্চলেই সবপ্রথম বসবাসের উপযোগী হয়। বালি জমে নদীগর্ভ ভরাট হয়ে এই অঞ্চলের উৎপত্তি, সেইজন্য এর নাম বেলেঘাটা হয়।'[১]



বেলেঘাটার মাটি পরীক্ষার ফলাফল

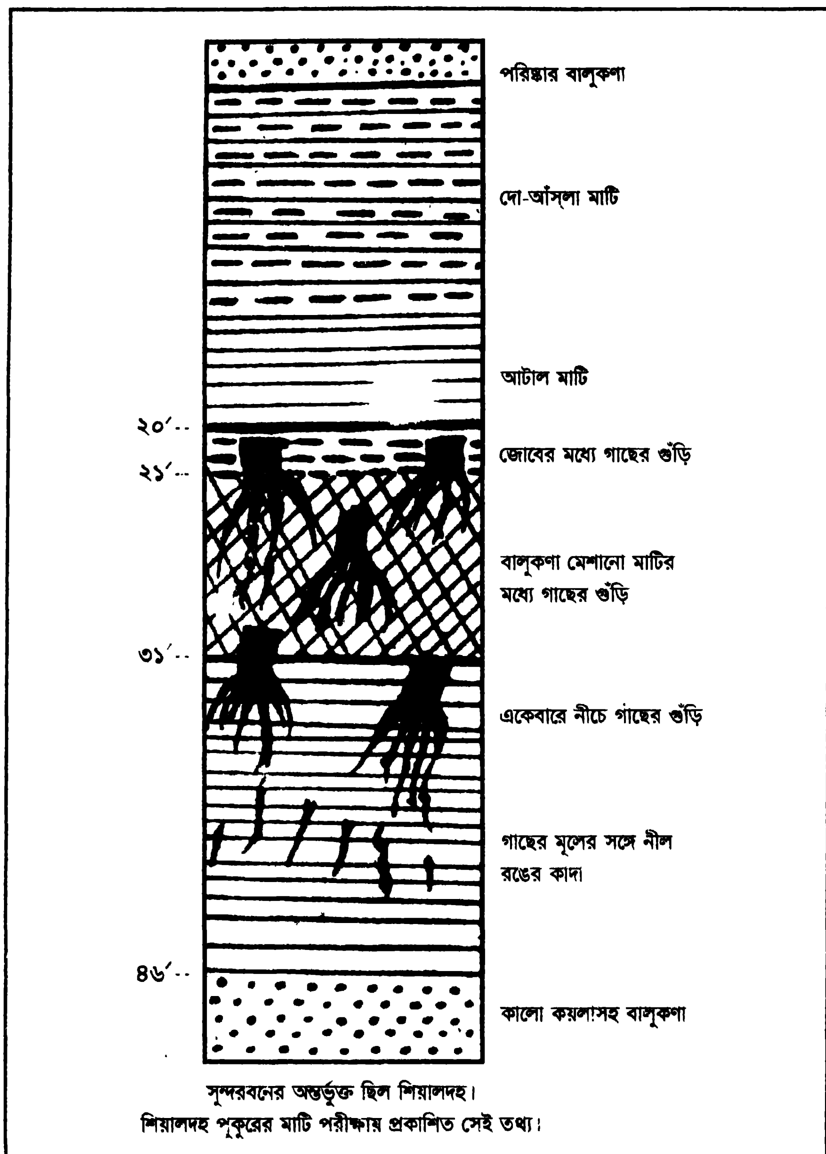
শিয়ালদহ

প্রাচীন নাম শৃগালদহ। দা, দহ, দহা, দহি গ্রাম নামে অন্তপদে এই শব্দগুলি কোল 'দাক' অর্থাৎ নদীর জল অর্থে এসেছে।[২] 'দহ' দেশীয় অর্থে চারিদিকে জল, মধ্যে স্থল। যে দহে প্রচুর পরিমাণে শৃগাল ছিল সেই দহ শৃগালদহ নাম পায়। অন্য আর একটি মত আছে, তাঁরা বলেন শিয়ালদা অঞ্চল একসময় সুন্দরবনের মধ্যে ছিল। প্রমাণ, শিয়ালদা অঞ্চলে একটি পুকুর খনন করার সময় প্রচুর সুন্দরী গাছের গুঁড়ি পাওয়া গিয়েছিল। সুন্দরবনে বহু জলা অঞ্চলে বুনো শিয়ালকাঁটা জন্মায়, যে দহে শিয়ালকাঁটা ছিল প্রচুর, তার নাম হয় শিয়ালদহ।

১. ছেলেদের কলকাতা পৃ. ১২৯

২ বাঙ্গলার গ্রামের নামের অনার্য ও দেশী উপাদান পৃ. ২৮৫

না, শিয়ালকাঁটা থেকে শিয়ালদা হয়েছে এমন যুক্তি অনেকেই মানেন না, তাঁদের দাবি সুন্দরবনের বড় বাঘকে স্থানীয় লোক 'শ্যালদা' বলে। এই অঞ্চলে প্রচুর বাঘ ছিল বলেই



সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত ছিল শিয়ালদহ।
শিয়ালদহ পুকুরের মাটি পরীক্ষায় প্রকাশিত সেই তথ্য।

অঞ্চলটির নাম হয় 'শ্যালদা'। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন একেবারে অন্য কথা বলেছেন[১], তাঁর

১ কলকাতার কাহিনী পৃ. ৫১

মতে 'শিয়ালদা বা শিয়ালদহ কলিকাতার কক্‌নিতে শ্যালদা। নামটির আসল অর্থ প্রবাহিত উপনদী বা খাল শৈবালে অর্থাৎ সংকীর্ণ নদীস্রোতের অংশ যা শৈবাল বা জলজ উদ্ভিদে আচ্ছন্ন।'

এখন শিয়ালদায় শিয়াল না থাকলেও, কলকাতায় একসময় শিয়ালের খুব উপদ্রব ছিল, তা শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়—"কলকাতায়, আমাদের শৈশবে দেখেছি, বড় শিয়ালের উৎপাত ছিল। সর্বত্র এঁদোপুকুর ও বাঁশঝাড় থাকায় শেয়ালের উৎপাত ছিল। এমনকী রাতে আমাদের উপরের ঘরে গিয়ে তক্তপোষের নীচে থেকে হাঁড়ি চুরি করে নিয়ে পালাতো। হাঁড়ি মাথায় করে দুপায়ে তাকে ধরে বেশ সতর্কে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতো। পরদিন কানাচে খালি হাঁড়ি পাওয়া যেতো। কখনও কখনও ছোট ছেলেকেও নিয়ে যেতো। ভাদ্র মাসে হন্যে শিয়াল হতো এবং দু-একজনকে কামড়িয়েছে প্রায় শোনা যেতো।"

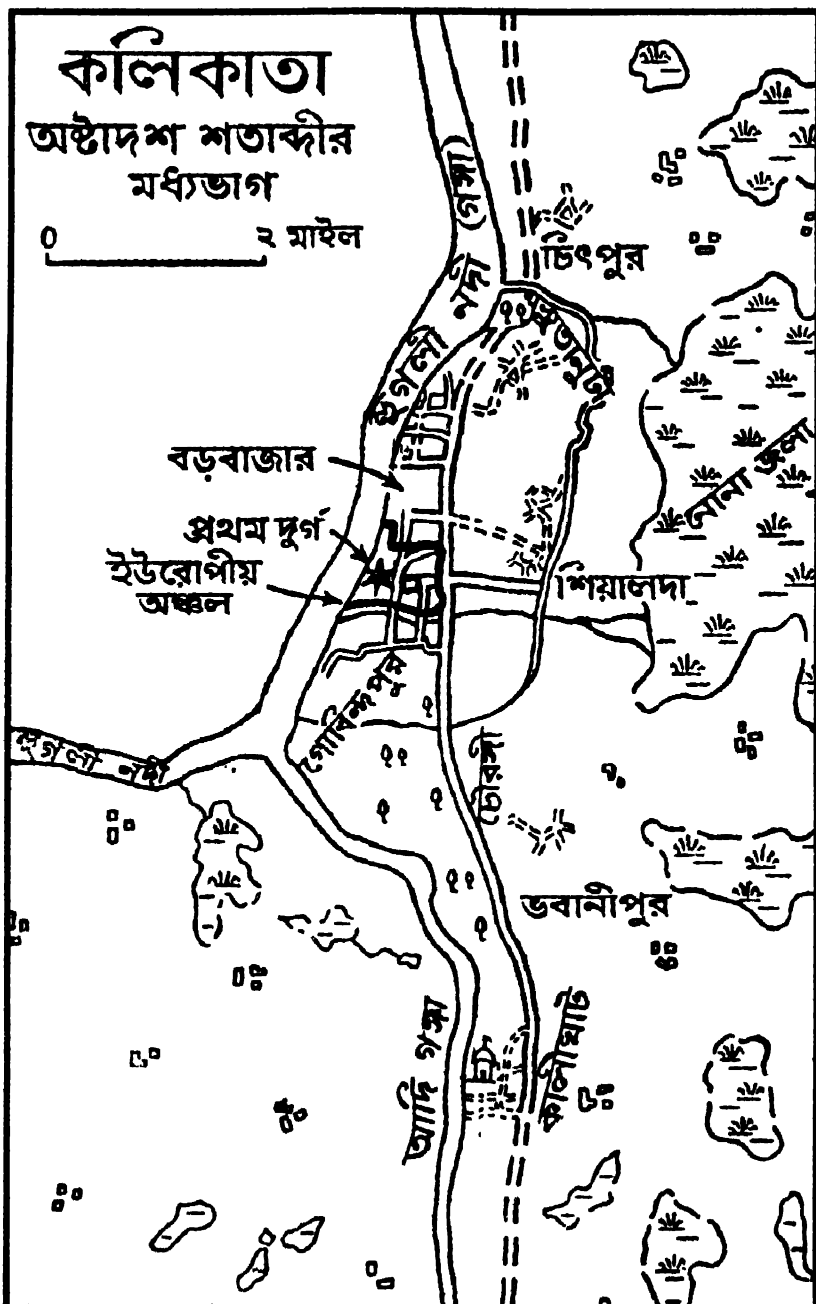
উল্টাডাঙ্গা

শৃগালদহের উল্টোদিকে জলের মাঝে যে নূতন ডাঙ্গা উঠে ছিল, লোকমুখে তার নাম হয় উল্টোডাঙ্গা। বাঁকবাজার থেকে যে নদী লবণ হ্রদে এসে বেলেঘাটা হয়ে শিয়ালদহ, ডিঙ্গেভাঙ্গা, ক্রিক রো হয়ে আবার গঙ্গায় পড়েছিল—এই নদীতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রায়ই ছোট ডিঙ্গি নৌকো উল্টে যেতো, মাঝিরা অন্য মাঝিদের সতর্ক করতে ঐ স্থানটির নাম দেয় উল্টোডিঙ্গি। আর একটি মত হল, দক্ষিণদ্বারী, কাঁকুড়গাছি, কুচিনান, শুঁড়া, বেলেঘাটা—এই দীর্ঘ বাণিজ্যকেন্দ্রের প্রধান মাল পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল নৌকায়। ফলে এই অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল ডিঙ্গি নৌকা তৈরির কারখানা। সকলেরই জানা আছে, নৌকো তৈরি বা সারাই হয় উল্টো করে—সেই সুবাদেই স্থান নাম উল্টোডিঙ্গি। এটা গল্পকথা নয়, একরকম ছোট ডিঙ্গি ছিল যার নাম ঘুঘু। যে পরিবার এই নৌকো তৈরি বা সারাইয়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের পদবী ছিল 'ঘুঘু'। বেলেঘাটা, সল্টলেকে 'ঘুঘু' পদবীর পরিবারের মানুষ আজও আছে। বড় নৌকো উল্টোডিঙ্গিতে তৈরি হলেও, 'ঘুঘু' নামে ছোট ডিঙ্গি তৈরির স্থান 'ঘুঘুডিঙ্গি' বলেও দাবি করা হয়। দমদমের ঘুঘুডিঙ্গি এইভাবেই নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অনেকে আবার বলেন দমদমে ডিঙ্গি তৈরি হতো না, তবে এই ডাঙ্গায় 'ঘুঘু' পদবী মানুষের বাস ছিল বলে নাম হয়েছে 'ঘুঘুডাঙ্গা'। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণপদ গোস্বামীর মতে, 'ঘুঘু দেশীয় শব্দ আখ্যা দেওয়া হয়, সম্ভবত অনার্য ভাষা থেকে এসেছে।'[১]

দক্ষিণদ্বারী

কলকাতার যে বাণিজ্যকেন্দ্রটি দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, বা সত্যিকারের দক্ষিণের দরজা হয়েছিল সেই স্থানটির নাম দক্ষিণদ্বারী। অন্য মতে, বরানগরের হাটে পর্তুগীজ সহ সকল বণিকরা কেনা-বেচা করলেও এই হাটের দক্ষিণদ্বারের গুরুত্ব ছিল তখন সবচেয়ে

১. বাঙ্গলার গ্রামের নামের অনার্য ও দেশী উপাদান—কৃষ্ণপদ গোস্বামী. পৃ. ২৮৫



ভূমিকম্পে বিদ্যাধরী নদীর স্রোত প্রবাহ বন্ধ হয়ে লবণ হ্রদ বদ্ধ নোনা জলের হ্রদে পরিণত হয়।

বেশি। কারণ তখনও সপ্তগ্রামের শেঠবসাকরা সুতানুটি-গোবিন্দপুর পত্তন করেননি, তাঁরাও বরানগরেই ব্যবসা করতো।

গঙ্গা বাঁক নিয়ে একটি ধারা লবণ-হ্রদে এসে যুক্ত হয়, গঙ্গার এই দুই মুখে দুটি বাজার বসে। প্রথম বাঁকের মুখে বাজারটি বাঁকবাজার নাম পায়, আর দ্বিতীয় মুখটি দক্ষিণদ্বারী নাম পায়। এই দক্ষিণদ্বারী দিয়েই প্রতাপাদিত্য বাগবাজার-চিৎপুর ঘাট সহ পার্শ্ববর্তী যে ছ'টি কেল্লা বানিয়েছিলেন সেখানে যাতায়াত করতেন।

অন্য মতে দক্ষিণদাঁড়ি—তুলাদণ্ডে মালপত্রের হিসেব নিকেশ করে 'কুদ' বা রাজকর নেওয়া হতো। দক্ষিণা নেওয়া হতো দাঁড়ি মেপে তাই দক্ষিণদাঁড়ি নাম।

দক্ষিণে যাওয়ার জন্য নৌকো প্রস্তুত, মাল উঠলেই দাঁড় ফেলা হতো এখান থেকে, তাই দক্ষিণদাঁড়ি নাম।

নারকেলডাঙ্গা

একদিকে লবণহ্রদের নোনা জল, অন্যদিকে বেলেমাটি—সুতরাং এই ডাঙ্গায় যে নারকেল গাছ ভালো হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না, আর এই নারকেল গাছের ডাঙ্গার জন্যই জায়গার নাম 'নারকেলডাঙ্গা'।

শিমুলিয়া

শিমুল বৃক্ষের কারণে অঞ্চলের নাম শিমুলিয়া, শিমুলিয়া থেকে সিমলা শব্দটি এসেছে। এই অঞ্চলে একসময় প্রচুর কার্পাসের চাষ হতো বলে অঞ্চলটির নাম হয় কাপাসডাঙ্গা।

শুঁড়া

বন্দর বেলেঘাটা বাণিজ্যকেন্দ্র। জমজমাট হাটের পাশে শুঁড়িখানা অর্থাৎ মদ খাওয়ার জায়গা থাকবে না তা কি করে সম্ভব! যারা মদ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত তাদের বলা হতো শুঁড়ি, আর যে জায়গায় মদ তৈরি হতো সেই জায়গাকে বলা হতো শুঁড়া। এইভাবেই স্থান নাম 'শুঁড়া' হয়।

এই তথ্য মানেননি শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয়, তাঁর মতে[১], 'নামটি এসেছে সংস্কৃত শুণ্ড অর্থাৎ সুরঙ্গ থেকে। মানে দীর্ঘ সংকীর্ণ বসতি।' প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রের কারণে এই অঞ্চল একসময়ে ঘন বসতিপূর্ণ ছিল একথা সত্য, অনুমান নয় ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে শুঁড়া এত বড় এলাকা জুড়ে ছিল যে, তাকে দুটো ভাগে ভাগ করতে হয়েছিল—শুঁড়া ও বাহির শুঁড়া। পূর্ব কলকাতায় সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হতো এই অঞ্চল থেকেই। শ্রদ্ধেয় প্রাণকৃষ্ণ দত্ত জানিয়েছেন[২], 'শিয়ালদহের পূর্বে যে সারপল্লী নামক অতি প্রাচীন গ্রামের উল্লেখ আমরা পূর্বে করেছি, তাই এখন শুঁড়ো বলে পরিচিত।' এই তথ্যানুসারে সারি দেওয়া ঘন বসতিপূর্ণ স্থান হলো 'সারপল্লী'।

১. কলকাতার কাহিনী

২. কলকাতার ইতিবৃত্ত পৃ. ১৩৭

কুচিনান

'নান' কথাটি মূলত ফার্সি শব্দ, অর্থ রুটি। ভূমি-স্বত্ব বিষয়ে, যারা জমিদারের কাছ থেকে খোরপোষ বাবদ জমি পেতেন, সেই জমিকে 'নান' জমি বলা হতো। খাইখোরাকি বাবদ দেওয়া জমির 'নান'-এর উপর 'কর' ধরায় একসময় 'নানকর বিদ্রোহ' হয়েছিল। 'নান' জমি আসলে এক বা বহু মানুষের রুটির সংস্থান হতো বলে এই ধরনের জমিকে 'নান' বলা হতো। এই শ্রেণির জমিতে গ্রামের পত্তন হয়ে নামকরণের সময় 'নান' শব্দটি অন্ত্যপদে ব্যবহৃত হয়েছে।

'কুচি' অর্থে ছোট। যারা জমিদারের কাছ থেকে ভরণপোষণ বাবদ যে 'নান' জমি পেয়েছিলেন, তা খোরপোষ বাবদ আয়ের তুলনায় জমি ছোট ছিল—তাই 'কুচি', একারণেই জমিটির নাম 'কুচিনান'।

ছোট জমি বোঝাতে 'এক রতি জমি' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। এক রতি হলো কুঁচ ফল। পরিমাণ মাপতে সোনার দোকানে লাল কুঁচ ফল ব্যবহার করা হয়, ওজন ধরা হয় $\frac{১}{৯৬}$ তোলা বা এক রতি। ছোট জমিকে কুঁচ জমিও বলা হতো, ছোট নান জমিকেও 'কুঁচনান' বলা অসম্ভব নয়। পূর্ব কলকাতায় 'কুচিনান' ছিল বর্তমান কাঁকুড়গাছি-নারকেল ডাঙ্গার মাঝে।

কাঁকুড়গাছি

গ্রাম নামে গাছ, গাছা, গাছি এই শব্দগুলি ভূপ্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বালি মাটিতে কাঁকুড়-এর ফলনের জন্যই কাঁকুড়গাছি এই নামকরণ। অনেকে এর উল্টোটা মনে করেন, তাঁদের মতে কাঁকড় বা কঙ্কর যুক্ত মাটিতেও গাছ রোপা হয়েছে, চাষাবাদ হয়েছে তাই নাম কাঁঙ্কড়গাছি, তা থেকে লোকমুখে কাঁকুড়গাছি।

বাগমারী

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে এই অঞ্চলে বাঘ আসার কথা জানা যায়. সংবাদের শিরোনাম সহ সংবাদটি ছিল এমনটি—

ব্যাঘ্র

কয়েকদিন হইল কলিকাতার দমদমার নিকটস্থ গৌরীপুর নামে এক গ্রামে এই প্রকারে এক ব্যাঘ্র মারা গিয়াছে সে ব্যাঘ্র সুন্দরবন ছাড়িয়া শুড়িটোলা ও বাঘমারি ও বেলগাছী এই তিন গ্রাম বেড়িয়া গৌরীপুর গ্রামে একজন স্ত্রীলোককে ধরিয়া খাইল। পরে একজন দুঃখী লোকের ঘরে প্রবেশ করিল। সে ব্যক্তি ভয় পাইয়া ঘরের বাহির হইয়া ঘরের দ্বার রোধ করিয়া দমদমাতে সমাচার দিল সেখানকার সাহেব লোকেরা আপন চাকর ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গৌরীপুরে গিয়া গুলি মারিয়া তাহাকে হত করিল।"

এই বাঘটা বর্তমান এয়ারপোর্টের কাছে যশোর রোড-বিরাটীর মুখে গৌরীপুর গ্রামে মারা গিয়াছিল। বাগমারী অঞ্চলে একসময় শিকারীদের প্রিয় স্থান ছিল - বিশেষ করে বাঘ শিকারের জন্য। বাঘ মারার জন্যই 'বাঘমারি' নাম।

নামকরণ নিয়ে অন্য দাবিও আছে, তাঁদের মতে, 'বাগ' অর্থে উদ্যান। এই বিশাল উদ্যানে কোন পোকা বা অন্য কারণে মারি বা মড়ক লাগায় বাগানটি নষ্ট হয়ে যায়, সে কারণেই 'বাগমারি'। অন্য আর একটি মতও রয়েছে, কাঁকুড়গাছি-কুচিনান হাটে বা ব্যবসাকেন্দ্রে নানা দ্রব্যের আলাদা আলাদা বাজার ছিল। চাষবাস সংক্রান্ত দ্রব্যাদি এই বাজারে বিক্রি হতো বলে মনে করা হয়। যেমন চায়ের মাড়াই সংক্রান্ত, গরু-মহিষের মুখের লাগাম দড়ি 'বাগডোর', লাঙ্গলের মধ্যস্থলের মোটা বাঁকা 'বাগেমুড়া' বা 'বাগমুড়া' অংশ প্রভৃতি। এই সূত্রেই 'বাগে মুড়া' বা 'বাগমুড়া' থেকে বাগমারী নাম হয়ে থাকবে।

ধনগু

বেলেঘাটা-সল্টলেকের মধ্যে দুটো দ্বীপের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে একটি 'ধনগু' এবং অন্যটি 'ধাপ্পা'। মনসামঙ্গল কাব্যে 'ধনগু বাহিয়া গেল ত্বরিতগমন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'ধনগু'-ই পরবর্তীকালে দলন্দ নাম পেয়েছে বলে মনে হয়। 'ধনগু' শব্দটি এসেছে সম্ভবত ধন দণ্ড বা অর্থ দণ্ড থেকে। ধনগ্রহণ রূপ দণ্ড থেকে 'ধনগু'।[১]

ধাপা

ধাপার প্রাচীন নাম 'ধাপ্পা'। শেঠ-বসাকগণ প্রাচীন সল্টলেক থেকে বিদ্যাধরী-গঙ্গার মিলিত প্রবাহিত ধারার পাশে কালীঘাটের কাছে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এই স্রোতধারাকে শেঠ-বসাকগণ 'ধাপ্পাধারা' বলে উল্লেখ করেছেন। 'ধাপ্পাধারা' নামকরণ কীভাবে হয়েছে জানা যায় না বটে, তবে 'ধাপ্পা' শব্দের অর্থ হলো ধোঁকা দেওয়া, আর 'ধারা' শব্দের এক অর্থ জলের স্রোত, অন্য অর্থ রীতি। ধোঁকা দেওয়া রীতির জন্যই নাম হয় 'ধাপ্পাধারা'।

কোনো রাজাকে ধাপ্পা বা ধোঁকা দেওয়ার জন্যই হয়তো কাউকে ধনরূপ দণ্ড দিতে হয়েছিল, তাই 'ধনগু' ও 'ধাপ্পা' পাশাপাশি গ্রাম। এই ধাপ্পাই পরে 'ধাপা' নাম পেয়েছে।

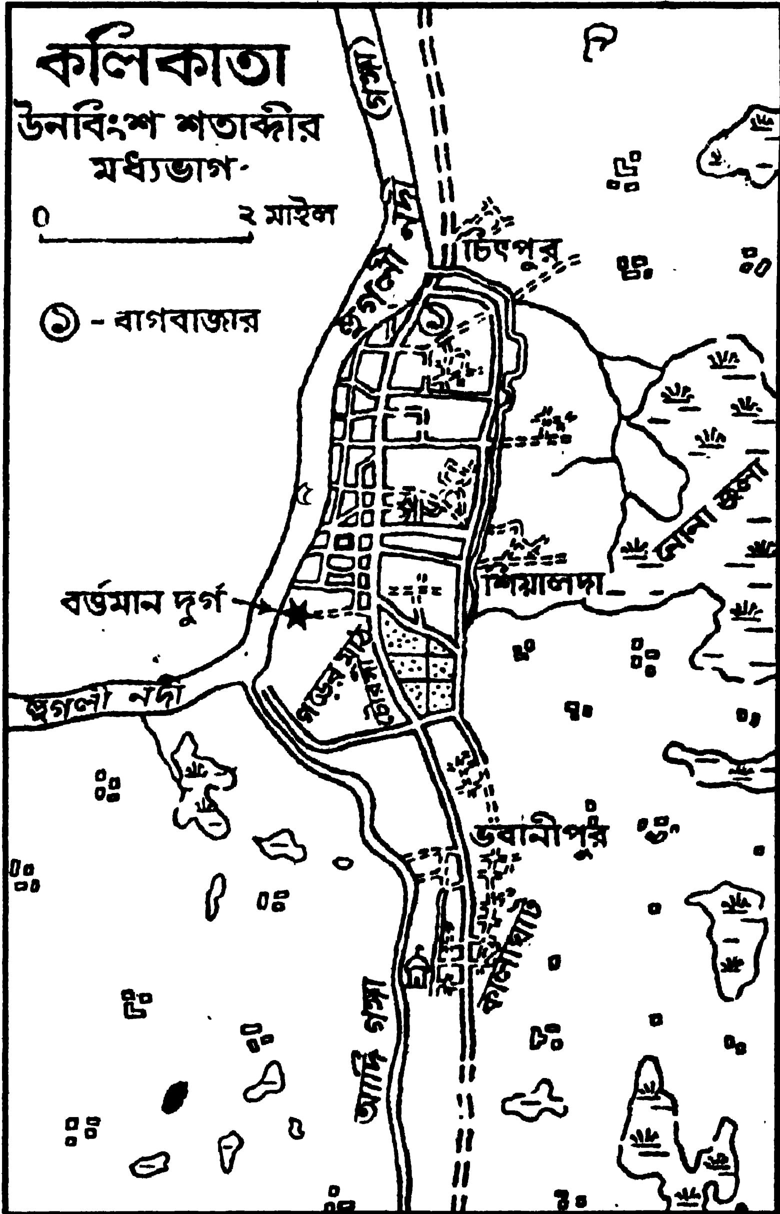
লবণ হ্রদ

নদীমাতৃক বাংলাদেশে খাল, বিল, নদী, নালা আছে অসংখ্য, কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশে একটিমাত্র হ্রদ আছে—নাম 'লবণ হ্রদ' বা 'সল্ট লেক'। শ্রদ্ধেয় এ. কে. রায় জানিয়েছেন[২]—কলকাতার 'পূর্বে অবস্থিত ছিল লবণ হ্রদ, সে যুগে এর আয়তন ও গভীরতা দুইই ছিল বর্তমান অপেক্ষা অনেক অধিক, এইজন্য একে মহা হ্রদ বলা হতো।' কলকাতা অঞ্চলের এই হ্রদটি আসলে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ বলে মনে হয়। অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের জন্ম প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় কপিল ভট্টাচার্য বলেন—'নদীর মধ্য বা সমভূমি প্রবাহে ভূপৃষ্ঠের উঁচু-নিচু স্থানে প্রতিরোধ পেলে নদী বেঁকে যায়। বাঁক ঘোরবার সময়ে নদীর যে কূল বাইরের দিকে, সেই স্রোতের আঘাত

১. বঙ্গদেশে কোন হ্রদ নেই—কলিকাতার দক্ষিণে যে বাদাভূমি আছে, তাহাই ইংরেজগণ কর্তৃক 'সল্টলেক' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।'

বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত (পৃ. ১১) পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০৪

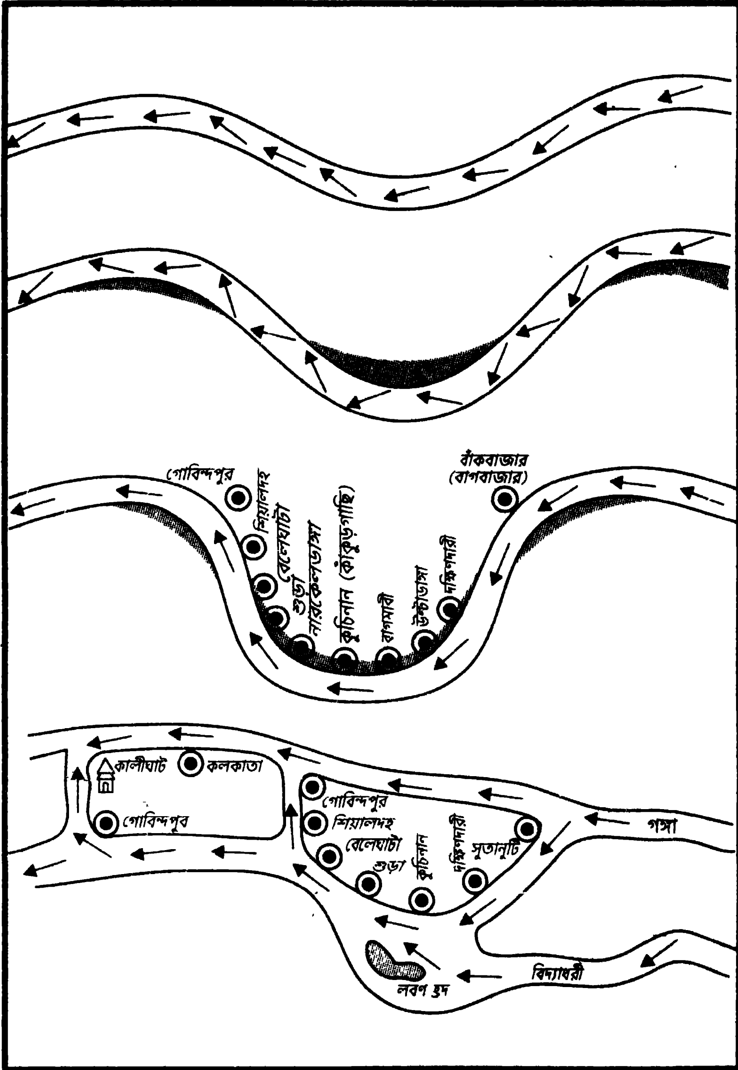
২. কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (পৃ. ২৪২)



একদিন পূর্ব কলকাতা বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, পরে পশ্চিমের গঙ্গার ধার ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণে কালীঘাট পর্যন্ত কলকাতা বেড়ে ওঠে।

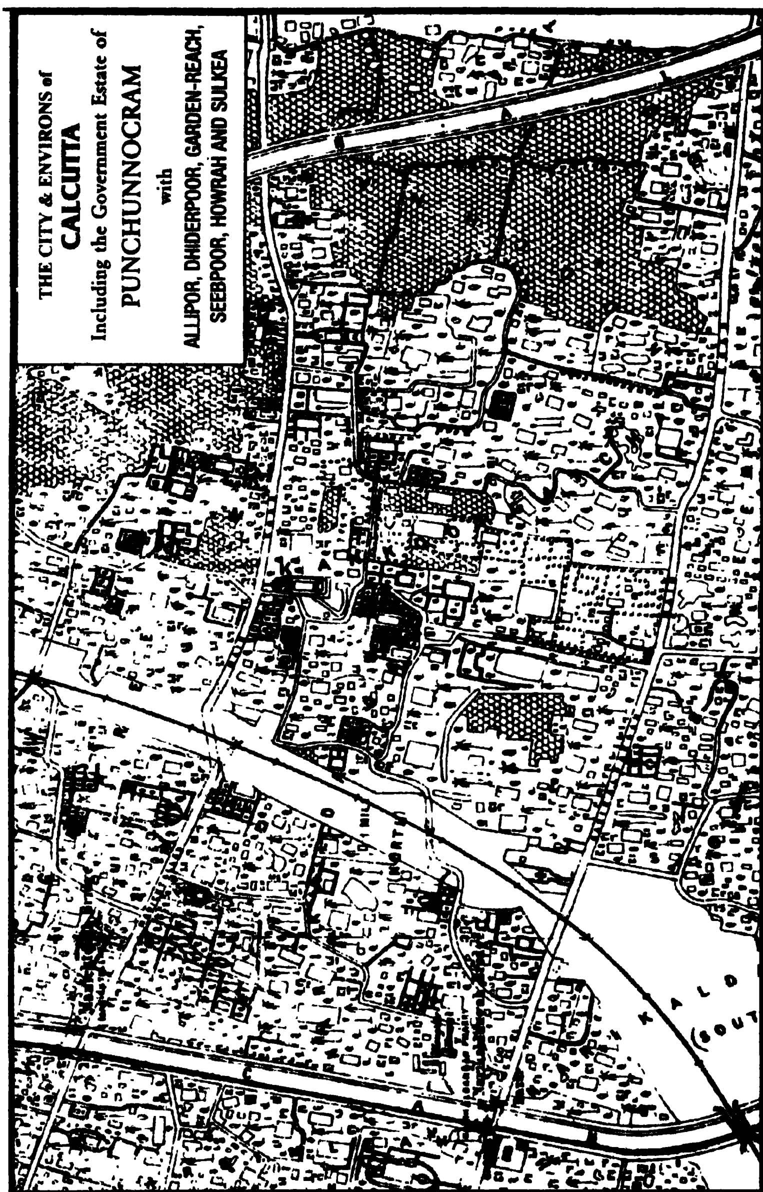
পড়ে বেশি (centrifugal force)। তাই সেই অংশের পাড় ভাঙতে থাকে এবং গর্ভ গভীরতর হতে থাকে। বিপরীত তটে স্রোতের বেগ কম, সেখানে তলানি জমে চর পড়ে। এমনিভাবে

বাঁক ক্রমশঃ ছোট আয়তন থেকে বৃহত্তর হতে থাকে। ছোট বাঁকটির ব্যাসার্ধ কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই নদীর খাতের প্রশস্ততার চেয়ে ছোট হয় না। জলের পদার্থতাত্ত্বিক প্রকৃতি (Physical



অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ যেভাবে লবণ হ্রদে পরিণত হয়েছে বলে ভাবা হচ্ছে।

Properties of Water) এর জন্য দায়ী। নদীপ্রবাহ গতিতত্ত্বের এই নিয়মটি বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে নদী-শাসনের কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।



১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে P.W.D Simmis-এর ম্যাপে কুচিনান অঞ্চল।

নদীর বাঁক বড় হতে হতে বৃত্তাংশ থেকে নদী ক্রমশ বৃহত্তর বৃত্তের আকার ধারণ করে—অনেকটা ঘোড়ার পায়ের নালের মত। যখন দুই দিকের মধ্যবর্তী স্থান খুব ছোট হয়ে আসে,

তখন সেই সঙ্কীর্ণ ব্যবধান ভেদ করে (সাধারণতঃ বর্ষার বন্যার সময়ে) নতুন সোজা পথ সৃষ্টি করে নিতে নদীর অসুবিধা থাকে না। পুরাতন খাত তখন অশ্ব-খুরাকৃতি হ্রদে (Horse-shoe Lake) পরিণত হয়। গঙ্গা এবং উত্তরবঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় এইরকম অনেক জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। প্রবল বন্যায় যখন নদীর খাতে জল ধরে না, তখন উপচানো জল এইসব জলাভূমিতে (spill area) আশ্রয় গ্রহণ করে আর পলি পাতিত করে ক্রমশঃ তাদের উঁচু করতে চেষ্টা করে। উত্তরবঙ্গের অনেক বিল এইরূপ জলাভূমি। ভাগীরথীর তীরে এদেরই নাম 'ঝিল'। সুন্দরবনের কাছে এরাই 'বাঙর' আর 'বাদা'।'

সুপ্রাচীন কালে এইভাবেই চিৎপুর অঞ্চলে নদী বাঁক নিয়ে বেলেঘাটার পাশ দিয়ে শিয়ালদা-ক্রিক রো হয়ে আবার গঙ্গায় মিশে অশ্বখুরাকৃতি রূপ নেয় এবং বিদ্যাধরীর নোনা জল গঙ্গার অশ্বখুরাকৃতি হ্রদে জমা হয়ে লবণ হ্রদ নাম পায়। অশ্বখুরাকৃতির নীচের ধারা আগে মূল ধারা ছিল বলেই মঙ্গলকাব্যে বেলেঘাটা-কুচিনান-কালীঘাট গঙ্গার পূর্ব দিকের ধারাতে পাওয়া গেছে। শ্রদ্ধেয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়[১] এই ধারাই গঙ্গার প্রাচীন ধারা এমন অনুমান করেছিলেন। কবিকঙ্কনের চণ্ডী কাব্যে লেখা রয়েছে—

বেতেড়েতে উত্তরিল বেনিয়ার বালা।
কলিকাতা এড়াইল অবসান বেলা।।....
বালিঘাটা এড়াইল বানিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙা অবসান বেলা।।

রেনেল সাহেব 'হিন্দুস্থানের মানচিত্র' নামক গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্বে বেলেঘাটার নিম্নে একটি নদীধারা ছিল, কবিকঙ্কণের বর্ণনার 'বালিঘাটা' যদি এই বেলেঘাটা হয়, তাহা হইলে ঐ নদীধারাই যে ভাগীরথীর আদিস্রোত তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না, কারণ এই নদীধারার উপরেই শ্রীমন্ত কালীঘাট পাইয়াছিলেন।

অনেকে অনুমান করেন যে পূর্বে চাঁদপাল ঘাটের নিকট হইতে যে খাল (যাহাকে ডিঙ্গাভাঙ্গার খাল বলিত) ধর্মতলার উত্তর দিয়া পূর্বমুখে বর্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ক্রিক রো নামক স্থানের ভিতর দিয়া বেলেঘাটার নিকট বড় খালে মিলিত হইয়াছিল' সে খালে পূর্বে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিত, শ্রীমন্তের ডিঙ্গা এই খাল দিয়াই বড় খাল হইয়া আদিগঙ্গার উপর দিয়া কালীঘাটে পঁহুছিয়াছিল, আর এখানের দৈর্ঘ্য চাঁদপাল ঘাট হইতে বেলেঘাটা পর্যন্ত ছিল। কিন্তু রেনেলের মানচিত্রে বেলেঘাটার নিম্নে যে নদীধারা আছে তাহাকে সামান্য খাল বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

গঙ্গার প্রাচীন খাতই যে লবণহ্রদ একথা শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ও স্বীকার করেছেন[২]—

১. কলিকাতা রঙ্গালয় (পৃ. ৪৬) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
২. পুরনো কলকাতার কথা পৃ (৭৭-৭৮) —সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী

"এই তিনটি (সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতা) গ্রামই তৎকালে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর ছিল। ভাগীরথী নদীর সমুদ্রসঙ্গমের নিকটবর্তী শেষাংশ বারবার পলিমাটি জমিয়া জমিয়া মজিয়া যাইতেছে। তাই ভাগীরথীর জল বারবার পুরাতন এক একটি খাত পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন খাতে প্রবাহিত হইতেছে। সেই সকল পুরাতন পরিত্যক্ত খাত প্রথমত বিল ও জলাভূমির আকার ধারণ করে ; ক্রমে তাহার কোন কোন অংশ ভরাট হইয়া মানুষের বাসোপযোগী হয়। মন্থরগতি স্রোতস্বতীতে এইরূপ মজিয়া যাওয়া, জলাভূমির সৃষ্টি হওয়া, চড়াপড়া প্রভৃতি ঘটনা নিত্যই ঘটিতেছে। এখনও কলিকাতা নগরীর পূর্ব দিকে কয়েকটি বৃহৎ লবণাক্ত জলাভূমি বর্তমান রহিয়াছে। সেগুলিকে 'সল্ট লেকস' (Salt Lakes) বলা হয়। সেই জলাভূমিগুলি কোনও কালে ভাগীরথীর মজিয়া যাওয়া খাতের খণ্ড খণ্ড অবশিষ্টাংশ মাত্র।" প্রধান ধারা এদিকে থাকায় কুচিনানে 'নানা হাট' এবং ষোড়শ শতকে 'পাষাণে রচিত ঘাট'-এর উল্লেখ কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে পাওয়া যাচ্ছে। এই বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্রটি ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ঝড় এবং ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায়, প্রধানতম কারণ লবণ হ্রদের পূর্ব দিকের ভূমিস্তর উঠে যাওয়ায় বিদ্যাধরী নদী তার গতি প্রবর্তন করে নেয়। এই কারণে ১৭৪২ খ্রি. নবাব আলিবর্দীকে এই অঞ্চলের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখিয়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর বাকি পরা রাজস্ব মকুব করিয়ে নিয়েছিলেন।

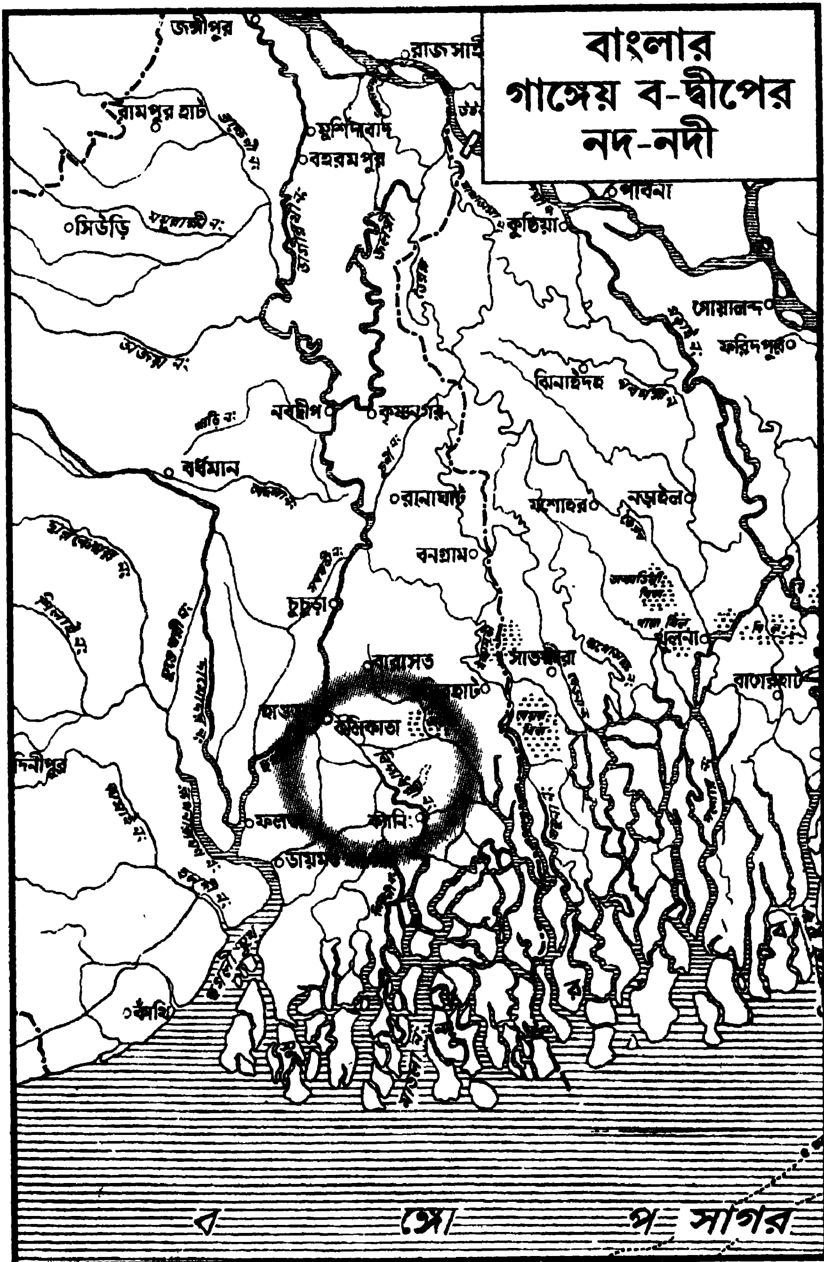
১৭৩৭ সনের ঝড় ও ভূমিকম্পের প্রসঙ্গ কথা ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিলের তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এইভাবে—

কলিকাতার বিবরণ

.....সতর শত সাঁইত্রিশ সনে ১১ অক্তুবরে এক মহাঝড় হইল ও ঝড় কালীন বৃহৎ ভূমিকম্প হইল। সে সময়ে কলিকাতার বড় গ্রিজাঘরের চূড়া ভাঙ্গিয়া ভূমিতে পড়িল ও জাহাজ ও নৌকা প্রভৃতি বিশ হাজার মারা পড়িল এবং ইংগ্লন্ডীয়েরদের নয় জাহাজের মধ্যে আট জাহাজ মারা পড়িল ওলন্দেজেরদের চারি জাহাজের মধ্যে তিন জাহাজ নষ্ট হইল। আর অতিশয় ভারি বোঝাই নৌকা ঐ সময়ে অর্দ্ধ ক্রোশপর্যন্ত ভূমিতে উঠিল তিন লক্ষ লোক মারা পড়িল..."।

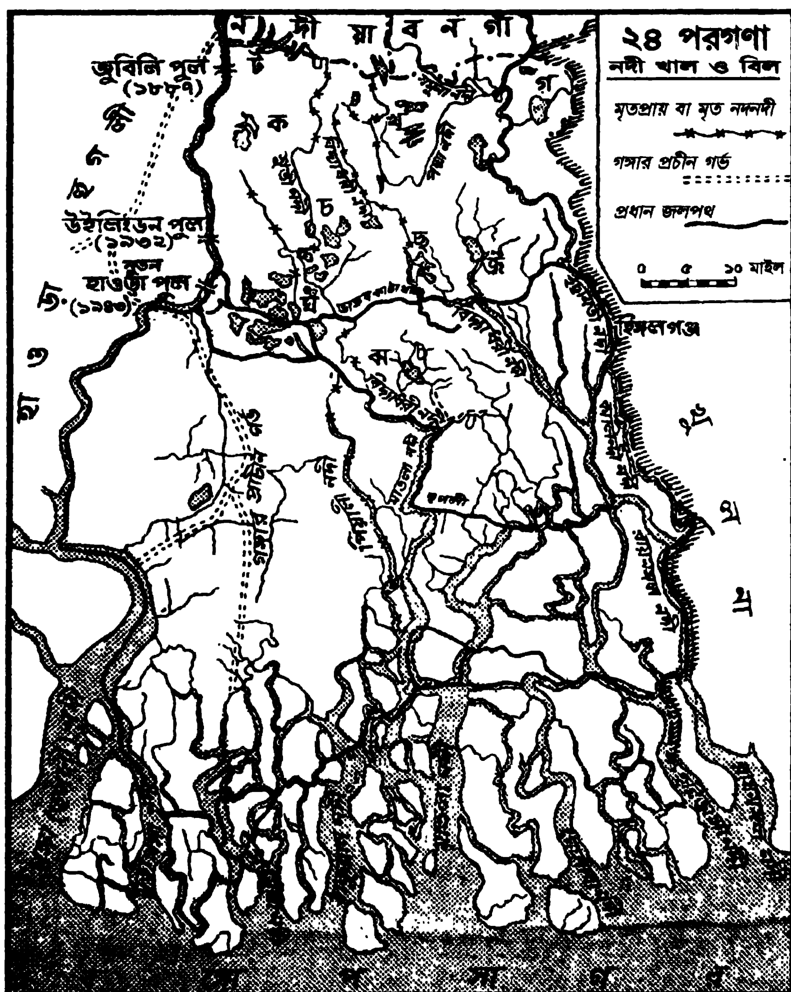
লবণহ্রদের জল প্রবাহ এই সময় স্তব্ধ হয়ে যায় বলে শ্রদ্ধেয় প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় জানিয়েছেন--"কলিকাতার পূর্বে একটি লবণ হ্রদ (বাদা) আছে তাহা পূর্বে অত্যন্ত গভীর ছিল। ঐ ভূমিকম্পে হঠাৎ উচ্চ হইয়া উঠিল। সহর ও পল্লীগ্রামের নানা স্থানের মাটি ফাটিয়া নর্দ্দামার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য পশু ও প্রায় তিন লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে।"[১]

১ কলিকাতার ইতিবৃত্ত পৃ. ৫-৬



সূত্র: বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা (চিত্র নং ২) - কপিল ভট্টাচার্য

বিদ্যাধরী নদী যেভাবে লবণ হ্রদের সঙ্গে যুক্ত ছিল।



সূত্র: চব্বিশ পরগণা ও কলকাতা (ভৌগোলিক কাহিনী) - ড শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গঙ্গার আধুনিক ও প্রাচীন ধারার সঙ্গে বিদ্যাধরীর প্রাচীন ধারা।

বেলেঘাটার বিদ্যাধরী নদী

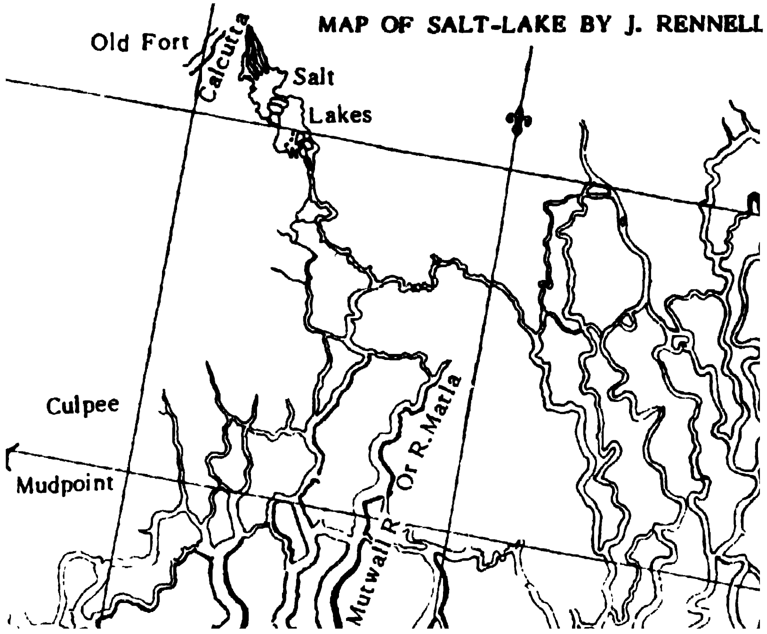
বেলেঘাটা-লবণহ্রদ দিয়ে বিদ্যাধরী নদী ৩৫ কিলোমিটার অতিক্রম করে বিদ্যাধরীর অন্য শাখার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। O'malley সাহেবের District Gazetteer, 24-Parganas গ্রন্থে (২৮) বিদ্যাধরী নদী বেলেঘাটা অঞ্চল হয়ে প্রবাহিত হতো বলে মন্তব্য করেছেন—

'The Bidyadhari is a tidal river with a very circuitous course. Beginning in the Sundarbans, it flows north-east past Harua where it is known as the Harua Gang and then bends westwards and is joined by the Nona Khal, After this, it flows south-west-wards to the junction of the Beliaghata canal and Tolly's Nallah, and thence south-east to Matla or Canning where it is joined by the Karatoya and Atharabanka rivers. The united stream forms the Matla river which flows south to the sea and is navigable by river steamers up to Canning.'

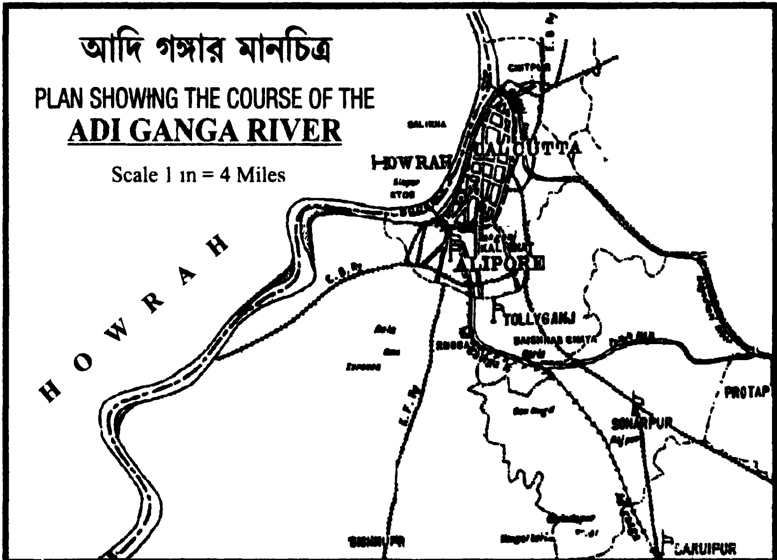
হান্টার সাহেবের লেখাতেও এই বিদ্যাধরী প্রসঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে এমন ভাবে—

'The Bidyadhari is a large river with a very circuitous course in the district of 24-Parganas. It flows from the Sundarbans on the east, northwards past Harua, where it takes the name of Harua Gang, after which it takes a bend to the West and is joined by the Nona Khal ; it then flows south-west to the junction of the Beliaghata and Tolly's Canals, and afterwards takes a south-easterly direction to the town of Canning. Here it is joined by the Karatoya and Atharabanka (Atharabeki?) and the united streams flow southwards through the Sundarbans as the Matla river, debouching upon the Bay of Bengal under that name. The Bidyadhari has an average breadth of from two to three hundred yards, and, as the Matla, affords a means of navigation for shipping to within 28 miles by railway from Calcutta.'

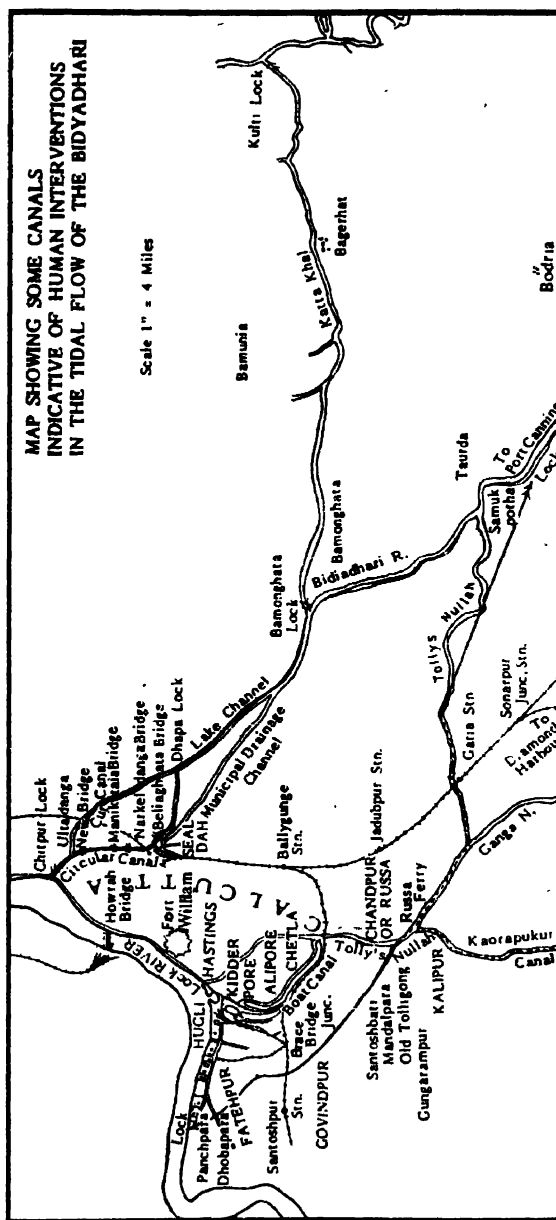
বিদ্যাধরী নদী বহু প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষী নিয়ে আজও বয়ে চলেছে, তবে প্রাচীন খাত অতীতের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তবে এই নদীর তীরে বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড়, হাড়োয়ার বালন্দায় পাওয়া পুরা-সমগ্রী সেই প্রাচীনত্বের সাক্ষী। এই নদী দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নদীর অধিকার অর্পণ করেছিল বলে, একে ডাকা হতো দ্বিতীয় গঙ্গা বা আদি গঙ্গার সঙ্গে মিলিত দীর্ঘ গঙ্গা বলে। দেগঙ্গা নাম এই থেকেই এসেছিল বলে মনে করা হয়।



রেনলের মানচিত্রে লবণ হ্রদ।



কলকাতার সঙ্গে বিদ্যাধরী যেভাবে যুক্ত।



বিদ্যাধরী নদী যেভাবে এখন লবণ হ্রদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

প্রতাপাদিত্যের রাজত্বে কলকাতা

যশোরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পূর্ব পুরুষ রামচন্দ্র বাকলা থেকে সপ্তগ্রামে এসে হুসেন শাহের রাজত্বের সময়ে নবাবী শাসনকর্তার অধীনে রাজস্ব সংগ্রহ ও শাসনকার্য পরিচালনার কাজ করেন। রামচন্দ্রের দই বিয়ে, প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ৪০ বছর সম্মানের সঙ্গে রামচন্দ্র রাজকার্য পরিচালনা করেন। ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দও রাজদপ্তরে কাজ করে কার্যদক্ষতা গুণে বাহাদুর শাহের কাছ থেকে তিন ভাইই 'মজুমদার' উপাধি লাভ করেছিলেন। ভবানন্দের শ্রীহরি, গুণানন্দের জানকীবল্লভ এবং শিবানন্দের হরিদাস, গোপালদাস ও বিষ্ণুদাস নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

ভবানন্দ সহ তিন ভাই, শাসনকর্তা সুলেমানের রাজ দরবারে সম্মানের সঙ্গে আরো উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। এক সময় ভবানন্দ মন্ত্রিত্ব লাভ করেন, আর শিবানন্দ কানুনগো দপ্তরের অধ্যক্ষ হন। সুলেমান এই দুই ভাইকে এত বিশ্বাস করতেন এবং ভালবাসতেন যে তাঁর বয়াজিদ ও দায়ুদ এই দুই পুত্রের সঙ্গে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ একত্রে থাকতেন, ভ্রমণে যেতেন এবং একত্রে শিক্ষালাভ করেছিলেন। এইভাবে নবাবের পুত্রের সঙ্গে মন্ত্রীপুত্রের বিশেষ সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়।

সুলেমানের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে বিবাদ শুরু হয়, পরে সেনাপতি লোদী খাঁর চেষ্টায় সুলেমানের কনিষ্ঠপুত্র দায়ুদ ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসে দায়ুদ তাঁর পুরনো বন্ধু শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে নিজের আমাত্যপদে বরণ করেন। শ্রীহরিকে তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও জানকীবল্লভকে 'বসন্ত রায়' উপাধি দিয়ে খালিসা বিভাগের কর্তা ও কোষাধ্যক্ষ করেন। এত বড় রাজপদ পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই একখণ্ড জমিদারী পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। দক্ষিণবঙ্গে যমুনার পূর্ব পারে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত এক বিস্তৃত জায়গীর বিক্রমাদিত্য দায়ুদের কাছে প্রার্থনা করা মাত্র তা পেয়ে যান। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে এই নতুন রাজ্যে যশোর রাজের ভিত্তি স্থাপন হয়। এই রাজ্যের সীমা ছিল পূর্ব ভাগে মধুমতী নদী, উত্তরে কেশবপুর, পশ্চিমে কুশদ্বীপ ও প্রাচীন ভাগীরথী খাত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বলা হয়, গৌড়ের যশ হরণ করে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে এর নাম হয়েছিল যশোহর। যশোর রাজ্যের বাদশাহী সনন্দ পেতে বছর তিনেক সময়ে লেগে গিয়েছিল, সম্ভবত, টোডরমলের অনুরোধে এই সনন্দ দেওয়া হয়, এবং ঐ সময় (১৫৭৭ খ্রিঃ) হতে রাজস্ব দেওয়া শুরু হয়।

বিক্রমাদিত্যের (শ্রীহরি) পরম কুলীন উগ্রকণ্ঠ বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁর এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, নাম রাখা হয় প্রতাপাদিত্য। প্রতাপ বড় হলে, বিক্রমাদিত্যের পরিবারের সঙ্গে বসন্ত রায়ের পরিবারের অসদ্ভাব এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, এই গোলমাল থেকে দুই পরিবারকে রক্ষা করার জন্য বিক্রমাদিত্য

রাজ্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করে, দশ আনা অংশ প্রতাপকে এবং ছয় আনা অংশ ভাই বসন্ত রায়কে দেন। কালিন্দী থেকে ভাগরথী পর্যন্ত পশ্চিম অংশ (যা এখন ২৪ পরগনার অন্তর্গত) পান বসন্ত রায়। এই সময়ে কলকাতা-কালীঘাট অঞ্চল যশোর রাজ্যের মধ্যে বসন্ত রায়ের ছয় আনা মালিকানাভুক্ত জমিদারীর মধ্যে ছিল। প্রতাপাদিত্য তাঁর কাকা বসন্ত রায়কে হত্যা করার পর (১৬০২ খ্রিঃ) যশোরের পশ্চিম অংশের শাসনদণ্ড নিজের হাতে নিয়েছিলেন। পশ্চিম দিকে ভাগীরথী নদীই প্রতাপের রাজ্যের সীমা ছিল। তবে দক্ষিণাংশে তিনি হিজলী জয় করে রাজ্যের সীমানা উড়িষ্যা পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। ত্রিবেণী পর্যন্ত যমুনা নদীর দক্ষিণ, আজকের ২৪ পরগনার জেলার সমস্ত অংশ নিজের শাসনে ছিল। হালিসহর, কাঁচরাপাড়া, জগদ্দল প্রভৃতি জায়গা হুগলীর মোগল ফৌজদারদের হাত থেকে দখল করেছিলেন।[১] জগদ্দলে তাঁর একটা দুর্গও ছিল।

মানসিংহ বঙ্গ অভিযানে এসে প্রতাপকে পরাজিত করে যাবার সময় ভবানন্দকে বাগোয়ান, মহৎপুর, নদীয়া, মীরূপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাশিমপুর, বয়সা, ও মশুণ্ডা প্রভৃতি ১৪ খানি পবগণার জমিদারী দেন। এই সময় (১৬০৬ খ্রি) লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কেও মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান, আনোয়ারপুর এই পাঁচ পরগণা ও হাতিয়াগড়ের কিছু অংশের জমিদারী সনন্দ আনিয়ে দেন। শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র মিত্র জানিয়েছিলেন', 'এ সনন্দ ১৬১০ খৃঃ অব্দের পূর্বে প্রদত্ত হয়েছিল বলে মনে হয় না। সনন্দ পেলেও সমস্ত জমিদারী স্ববলে আনতে প্রায় দুপুরুষ লেগে গিয়েছিল'।

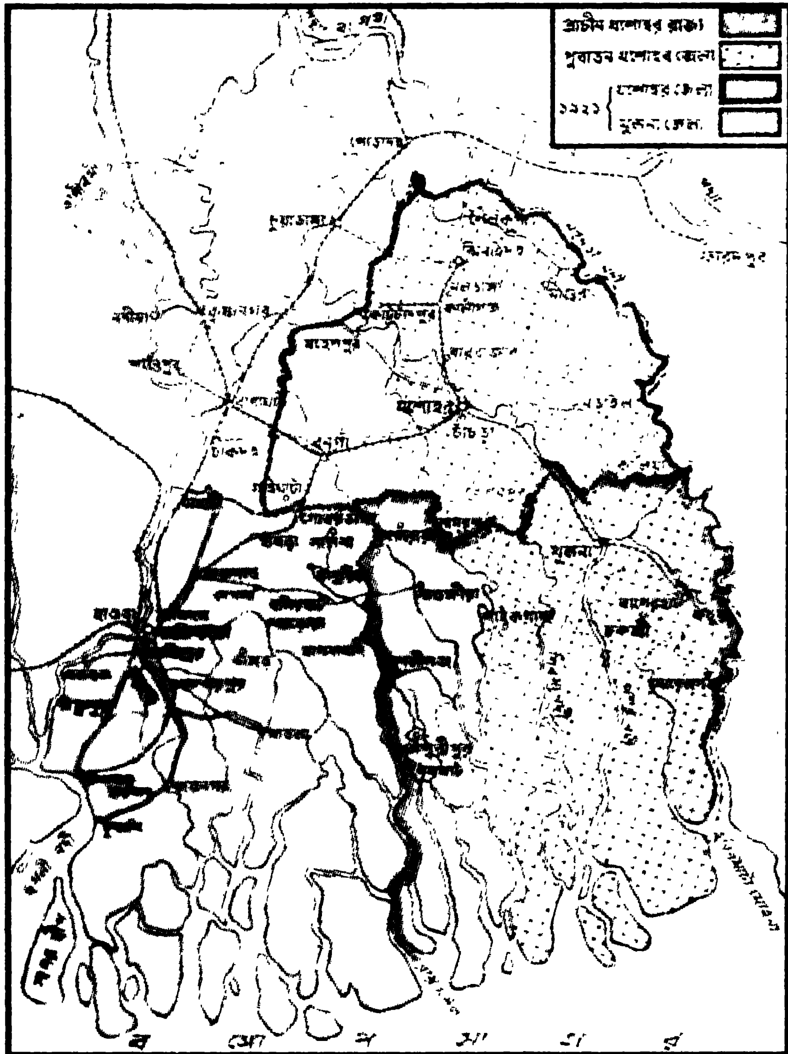
যশোর রাজ্যের কলকাতা, কি ভাবে সাবর্ণ জমিদারদের কলকাতা হল, সে অন্য ইতিহাস। পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

গঙ্গাবাসের জন্য প্রতাপাদিত্য মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজক কবিরাম যখন যশোরে গিয়েছিলেন, তখন গঙ্গাবাসের জন্য প্রতাপাদিত্য কলকাতায় ছিলেন—

"প্রতাপাদিত্যভূপস্য যশোরভূমিপস্য চ।
গঙ্গাবাসস্থলো রাজন্ ইদানীং বর্ত্ততে নৃপ॥"

কলকাতার কোথায় ছিল এই গঙ্গাবাসের স্থান? যে স্থানে গঙ্গা বাঁক নিয়ে পূর্ব দিকে গিয়েছিল সেখানে। প্রাচীন চিৎপুরের এই অঞ্চলে সুরক্ষিত, মজবুত করে সুন্দর এক গঙ্গাবাসের গৃহ তৈরি হয়। এর চারদিকে আরো ছটি দুর্গ তৈরি হয়েছিল, সেগুলি হল মাতলা, রায়গড়, টানা বেহালা, সালকিয়া ও আটপুর (মুলাজোড়, শ্যামনগর)। ইংরেজরা সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতার জমিদারী গ্রহণ করার পর চিৎপুর-বাগবাজারের প্রতাপাদিত্যের গঙ্গাবাসের এই সুরক্ষিত পরিত্যক্ত দুর্গটি নিজেদের রক্ষামঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য গ্রহণ করে। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এই রক্ষামঞ্চ মেরামতি করার জন্য যে অর্থ খরচ করা হয়েছিল তা পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম-এর খরচের খাতায় লেখা রয়েছে —

১। *যশোর-খুলনার ইতিহাস পৃ. ৪১৫*



সূত্র: যশোহর-খুলনার ইতিহাস - সতীশচন্দ্র মিত্র।

প্রাচীন যশোহর ও পুরাতন যশোহর জেলার সীমানা।

The Expenses of the Readoubt at Bogbuzar to 1st January, 1756.
1756 have been as follows :

Materials furnished by Collonel Scott and Monthly Account	8,9,39 - 12 - 9
Materials & furnished by the Buxey	14,145 - 2 - 3
Total Expenses to 1st January 1756	23,084 - 15 - 0
Estimate of the Expense will be finish the Redoubt draw Bridge and Lock at Bogbuzar from 1st January, 1756 :	
Wood Iron work & of the Draw Bridge	917 - 0 - 0
Gates Hinges & for Lock	300 - 0 - 0
Monthly Account for two months and a half	900 - 0 - 0
Chunam Brickdust Paint	500 - 0 - 0
	2,617 - 0 - 0
	25,701 - 15 - 0

এই রক্ষা মঞ্চটি যখন মেরামত করা হয় তখন নবাব আলীবর্দী খাঁ জীবিত। নবাবের অনুমতি না নিয়েই এই মেরামতের কাজটি করা হয়েছিল। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল আলীবর্দী খাঁ আশি বছর বয়সে পরলোক গমন করলে, সিবাজদৌল্লা বাংলার সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসে সিরাজ কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ এবং রক্ষা মঞ্চের মেরামত বন্ধ করার নির্দেশ দেন। রজার ড্রেক জানিয়েছেন, এপ্রিল মাসে নবাব তাঁকে জানান যে, ইংরেজদের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র দুর্গের নির্মাণ সম্পূর্ণ করা থেকে বিরত হলেই চলবে না, পেরিনের নিকটবর্তী দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও টানা সেতুও তাদের ধ্বংস করতে হবে এবং শহরের চারদিকে যে পরিখা খনন করা হয়েছে তাও ভরাট করে ফেলতে হবে। ইংরেজরা তা মানেন নি।

কলকাতার দুর্গ ও রক্ষামঞ্চ সংস্কার, নবাবের দূতকে অপমান এবং আরো কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নবাব সিরাজদৌল্লা কলকাতা আক্রমণ করেন। কলকাতায় ইংরেজগণ তিনটি স্থানে যুদ্ধের সরঞ্জাম ও সৈন্য বাহিনী নিয়ে সিরাজের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হন। এনসাইন্ পিকার্ডের নেতৃত্বে বাগবাজারে পেরিনের রক্ষামঞ্চে পঁচিশ জন সৈন্য নিয়ে সতর্ক ছিলেন, তাঁকে জলপথে সহযোগিতা করার জন্য গোলাবারুদসহ নেপচুন ও চান্দ্র নামে দুটি যুদ্ধ জাহাজ নদীতে প্রস্তুত ছিল। ১৬ই জুন ১৭৫৬ তারিখে নবাবের চার হাজার সৈন্যের একটি দল বাগবাজারের রক্ষামঞ্চের উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে, এনসাইন্ পিকার্ড ও সেনাপতি ব্লাগ নবাবের আক্রমণ প্রতিহত করেন। নবাবী সৈন্য পিছু হটে দমদমে চলে গিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে ন'জন ইউরোপীয় এবং নবাব পক্ষে উনআশিটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

প্রতাপাদিত্যের প্রসঙ্গ কথায় এই তথ্যটি দেওয়ার কারণ, ইংরেজেদের পেরিনি পয়েন্টের রক্ষা মঞ্চটি আসলে প্রতাপাদিত্যের চিৎপুরের গঙ্গাবাসের বাড়ি, যা চিৎপুর দুর্গ নামে পরিচিত ছিল। সেই পরিত্যক্ত দুর্গটি শুধুমাত্র সংস্কার করে ইংরেজগণ একে নিজেদের রক্ষামঞ্চে পরিণত করেছিলেন।

কলকাতার জমিদারী ও সাবর্ণ রায়চৌধুরী

যশোরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের দেওয়ানী বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন কলকাতার সাবর্ণ জমিদার বংশের আদিপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করার পর মানসিংহ নিজে দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে পাঁচটি পরগণার জমিদারী পাইয়ে দেন লক্ষ্মীকান্তকে। বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ এই জমিদারী লাভ, একথা বিশ্বাস করলেন অনেকে, কঠোর ভাষায় মন্তব্য করা হল এই বলে—

"মানসিংহ বাংলায় এলে পর আরো দুই জন নিমকহারাম তাঁর দলে যোগ দিল, এক জনের নাম ভবানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়।"[১] প্রথমজন কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আর দ্বিতীয়জন অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্ত কলকাতার সাবর্ণ জমিদারদের আদি পুরুষ।

লক্ষ্মীকান্তের জন্ম ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে[২] দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং তাঁর অনুসরণে বিনয় ঘোষ জন্মসন ১০০ বছর পিছিয়ে দিতে চান। জন্মস্থান নিয়েও মতান্তর রয়েছে। কেউ বলেন ইনি হুগলি জেলার অন্তর্গত গোহট্ট-গোপালপুরে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] অন্যমতে কালীঘাটের কালীমন্দিরের উত্তরে ফকিরডাঙায় তার জন্ম।[৪] হরিসাধন মুখোপাধ্যায় বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীর কাছ থেকে একটি পুরনো চিঠি পেয়ে তাঁর বইয়ে প্রকাশ করেন।[৫] ঐ চিঠিটি নাকি লক্ষ্মীকান্তের পিতার লেখা।[৬] চিঠিটি কৃত্রিম হলেও সাবর্ণদের পারিবারিক কিংবদন্তির সাহায্যে লেখা, তাই এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। চিঠিতে লেখা হয়েছে লক্ষ্মীকান্তের পিতা "নিজ স্ত্রী পদ্মাবতীকে সমভিবাহারে লইয়া ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ পূর্ব্বক" কালীঘাটে আসেন। এখানে আসার পর একদিন তিনি শোনেন, দেবী তাঁকে বলছেন ঃ "তোমার ঔরসে পদ্মবতীর গর্ভে, এক অতি সুললক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সেই পুত্র এ প্রদেশের ভুম্যধিকারী ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইবে এবং তাঁহার বংশ হইতে আমার সেবাদি প্রকাশ হইবেক। তদনন্তর কিয়ৎ দিবস মধ্যে পদ্মাবতী গর্ভবতী হইয়া যথাকালে সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করিয়াই, স্বর্গারোহণ" করেন। এই থেকে অনুমান করা যেতে পারে, লক্ষ্মীকান্ত কালীঘাটেই জন্মেছিলেন।

শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার মায়ের মৃত্যুর কথা ঘটক কারিকাতেও লেখা আছে ঃ

"প্রসব হইল পুত্র প্রসূতির কাল।
তাহাতে দ্বিজের ঘটে বিষম জঞ্জাল।।"

স্ত্রীর মৃত্যুর পর জিয়ো সদ্যোজাত সন্তান নিয়ে কি করবেন ভাবছেন; এমন সময় ঘরের উপর থেকে টিকটিকির ডিম মাটিতে পড়ে ভেঙে যাওয়ায় তা থেকে একটি টিকটিকির ছানা

---

১ চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, প্রতাপাদিত্য, পৃ ৪৯।
২ নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস · ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১মাংশ, পৃ. ২৬৪।
৩. সত্যচরণ শাস্ত্রী, প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত, সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৭৯।
৪ প্রমথনাথ মল্লিক, কলিকাতার কথা, আদি কাণ্ড, পৃ. ১৫।
৫ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের, পৃ. ৬৪-৬৫।
৬ চিঠিতে লক্ষ্মীকান্তের পিতার নাম কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় লেখা হয়েছে। বহু কলকাতা-গবেষক কামদেব ও জিয়োকে এক ব্যক্তি মনে করেন। কিন্তু এঁরা দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের ১৩১-১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বেরিয়ে আসে। সাদা লালায় ছানাটি ঢাকা ছিল, ফলে তার নড়বার ক্ষমতা ছিল না। সেই সময় একটি মাছি লালা খেয়ে ফেলে। খাওয়া বেশী হয়ে যাওয়ায় মাছিটি নড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন টিকটিকির ছানাটি অনেক কষ্টে ঐ মাছিটিকে খেয়ে একটু সবল হয়। বিস্মিত জিয়ো এই ঘটনায় ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেখতে পেয়ে একখণ্ড কাগজে লিখলেন :

"কাককৃষ্ণঃ কৃতো যেন, হংসশ্চ ধবলী কৃতঃ।

ময়ূরীশ্চিত্রিতো যেন, তেন রক্ষা ভবিষ্যতি।।"

অর্থাৎ যিনি কাককে কালো, হাঁসকে সাদা আর ময়ূরকে বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত করেছেন, তিনি একে রক্ষা করবেন। এই সদ্যোজাত সন্তানকে ঈশ্বরের হাতে রেখে জিয়ো চলে গেলেন কাশীতে। এই সময় কালীঘাটের কালীমন্দিরের পূজারী ছিলেন আত্মারাম ব্রহ্মচারী। জিয়োর পরিত্যক্ত শিশুকে আত্মারাম আশ্রমে নিয়ে আসেন এবং আশ্রমের ভৃত্য জগদানন্দ সর্দার ও তার স্ত্রীকে শিশুটির লালন-পালনের ভার দেন। লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন জন্ম বলে শিশুর নাম রাখা হয়েছিল লক্ষ্মীকান্ত। ঐ আশ্রমেই ভুবনেশ্বর নামে আর একজন ব্রহ্মচারী বালক ছিল। এরা একসঙ্গে আত্মারামের কাছে অধ্যয়ন করত। আত্মারামের মৃত্যুর পর ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী কালীমন্দিরের পূজারী নিযুক্ত হন।[৭]

লক্ষ্মীকান্ত যখন কালীঘাটের আশ্রমে পড়াশুনা করছেন, তখন এই অঞ্চল যশোর রাজ্যের মধ্যে ছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর যশোর রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়; দশ আনা অংশ পুত্র প্রতাপাদিত্যের ও ছয় আনা অংশ ভ্রাতা বসন্ত রায়ের ভাগে পড়ে। প্রতাপাদিত্য বিভক্ত যশোরের দশ আনা অংশের রাজা হন সম্ভবত ১৫০৬ শকের বৈশাখী পূর্ণিমায় (১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে)। রাজা বসন্ত রায় তাঁর অংশের রাজধানী করেন কালীঘাটের কাছে সরসুনা-বেহালা-বড়িশাতে। এখানে আগে নাকি বর্ধমানের রাজাদের রাজধানী ছিল : তিনশত বৎসর পূর্বে সরসুনার আর এক অবস্থা ছিল। কাটিগঙ্গার তীর হতে আবস্ত হয়ে টালিগঞ্জের আদিগঙ্গার কূলে করুণাময়ীর ঘাটের নিকট পর্যন্ত যে বাঁধা রাস্তা পুরাতন লোকেরা তাহাকে দ্বারির-জাঙ্গাল বলে জানে। পূর্বকালে বর্দ্ধমান রাজার এই অঞ্চলে রাজধানী ছিল।[৮] ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্রও লিখেছেন : তখন "কালীঘাটের সন্নিকটে বেহালা বড়িশা প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ সমাজপল্লী ছিল; তিনি [বসন্ত রায়] এই স্থানে রাজধানীর স্থান নির্বাচন করিলেন।[৯]

বেহালা অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন করে বসন্ত রায় শুনলেন ঃ "ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী নামক এক অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ কালীঘাটে অবস্থান" করেছেন।[১০] তিনি "যোগ সাধনায় রত থাকিতেন এবং পীঠস্থান নির্জ্জন কালীঘাটে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কালীর সেবা করিতেন।"[১১]

---

৭. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীঘাট-ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪৬।

৮. প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গাধিপ-পরাজয়, পৃ. ৪।

৯. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩।

১০. সত্যচরণ শাস্ত্রী, প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত, সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৬৪।

১১ সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালীক্ষেত্র দীপিকা, পৃ. ৬৫।

"বসন্ত রায় তাঁহার অলৌকিক কার্য্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন।"[১২] মনে হয় এরপরই ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী যশোর রাজসরকারে লক্ষ্মীকান্তের চাকরী করিয়ে দেন। এটা ১৫৯৬-৯৮ খ্রিস্টাব্দের কথা। তখন লক্ষ্মীকান্তের বয়স ২৬ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হবে। একমাত্র নগেন্দ্রনাথ বসুই আট বছর বয়সে লক্ষ্মীকান্তের প্রতাপের কাছে যাওয়ার কথা লিখেছেন।[১৩] অন্যেরা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে লক্ষ্মীকান্ত প্রাপ্তবয়সে চাকরী পান।[১৪] এবং পরে "স্বীয় প্রতিভাবলে প্রতাপাদিত্যের রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন।"

লক্ষ্মীকান্তের পিতা জিয়ো লক্ষ্মীকান্তকে কালীঘাটে রেখে "ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটনানন্তর বৃন্দাবন অভিমুখে গমনকালীন পথে রাজা মানসিংহের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহা কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদৃত হন।"[১৫] ঘটক কারিকার মতে কাশীতে জিয়োর সঙ্গে মানসিংহের সাক্ষাৎ হয় এবং মানসিংহ জিয়োর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন :

মানসিংহ মহারাজ কাশীতে আছিল।
জিয়োর নিকটে তিঁহ উপদিষ্ট হ'ল॥

মানসিংহ যশোর রাজ্য আক্রমণ করতে যাবেন শুনে, জিয়োর ফেলে আসা সন্তানের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি শিষ্য মানসিংহকে অনুরোধ করেন পুত্রকে খুঁজে বার করতে :

রাজারে কহিল দ্বিজ, শুন বাপধন।
শুনি করিতেছ তুমি বঙ্গেতে গমন॥
মম পুত্রে গিয়া তুমি ঠিকানা করিবা।
সেই কার্য্য করি বাপ, মোরে বাঁচাইবা॥

মানসিংহ বাংলায় এসেই গুরুপুত্রের সন্ধান করেন :

বঙ্গেতে আসিয়া রাজা , সে কার্য্য করিল
প্রথমতঃ ঐ কার্য্য, পশ্চাৎ সকল॥

গুরুপুত্রকে খুঁজে বার করার জন্য মানসিংহ যাঁদের নিযুক্ত করেছিলেন, পাটুলির জমিদার শূদ্রমণি তাঁদের অন্যতম :

পাটুলিতে হয় শূদ্রমণি জমীদার
তাহারে ডাকায়ে রাজা কহে সমাচার॥

এই শুদ্রমণিই কালীঘাটে সংবাদ পান (সম্ভবত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর কাছে) যে, লক্ষ্মীকান্ত রায়গড় দুর্গে আছেন। সুতরাং তিনি :

রাজাজ্ঞা-মতেতেই সেই, ঠিকানা করিল।

---

১২ প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত, পৃ ১৬৪।

১৩. বিশ্বকোষ, ১২শ ভাগ, পৃ ২৭৩।

১৪ কালীক্ষেত্র দীপিকা, পৃ ৭৮, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ৪১৫।

১৫ কালীক্ষেত্র দীপিকা,পৃ ৭৮।

গুরুবাক্য ঐক্য করি, ঠিকানা হইল।।

এর পর মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয় ঃ

পাতশাহি ঠাটে কবে কেবা আঁটে বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখি অভয়া কে করিবে দয়া প্রতাপাদিত্য হারে।।
শেযে ছিল যারা পলাইল তারা মানসিংহে জয় হইল।

—ভারতচন্দ্র রায়, অন্নদামঙ্গল

প্রতাপাদিত্য পরাজিত হয়ে মানসিংহের সঙ্গে সন্ধি করেন। এরপর লক্ষ্মীকান্ত মানসিংহের কাছ থেকে মাগুরা, খাসপুর, কলকাতা, পাইকান ও আনোয়ারপুর এই পাঁচ পরগণার জমিদারী পান। কেন তাঁকে ঐ জমিদারী দেওয়া হল? সতীশচন্দ্র মিত্রের অনুমান : প্রবাদ আছে তাঁহাকে [মানসিংহ] গুপ্তভাবে সংবাদ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। নতুবা মানসিংহ তাঁহাকে বহু পরগণার মালিক করিয়া যাইতেন না।[১৬] সতীশচন্দ্র মিত্রের এই অনুমান থেকেই সকলে মেনে নিলেন যে, লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় একজন 'নিমকহারাম'।[১৭] ফলে এখন যাঁরা কলকাতার ইতিহাস নিয়ে লিখছেন, তাঁদের অনেকেরই এই মত : মানসিংহ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভবানন্দ, লক্ষ্মীকান্ত ও জয়ানন্দ এই তিন সামন্তের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পান এবং নিজেদের কার্য্যের পুরস্কার হিসবে ইঁহারা তিনজনই সম্রাটের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হন।[১৮] প্রমথনাথ মল্লিক লিখেছেন : "কি আশ্চর্য! ইনিই প্রতাপাদিত্যের বিজয়ের পর সকলের অগ্রণী হইয়া তাঁহার [মানসিংহের] সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। ইনিই বড়িযার সাবর্ণ চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ।[১৯] লক্ষ্মীকান্ত মানসিংহকে গোপনে কোন সাহায্য করেছিলেন কি না তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসলে প্রতাপের পরাজয়ের পর লক্ষ্মীকান্ত পাঁচটি পরগনার জমিদারী পেয়েছিলেন বলেই সতীশচন্দ্র মিত্র এই অনুমান করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি স্বীকার করেছিলেন : মানসিংহের সহিত গুপ্তভাবে পরিচিত হইয়া, তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধকালে সিংহরাজাকে কি সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই, প্রতাপের পতনের পর লক্ষ্মীকান্ত একজন প্রধান ভূস্বামী।[২০]

একালের একজন গবেষক লিখেছেন : মানসিংহের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হল, গুরুর পুত্রকে প্রতাপের কাছ থেকে সরিয়ে আনা। এ দুঃসাধ্য কাজ কে করবে? কার এত সাহস? নিজের জীবন বিপন্ন করে গুরুপুত্রকে প্রতাপের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবে। অনেক ভেবে-চিন্তে মানসিংহ লক্ষ্মীকান্তের প্রতিবেশী, জয়ানন্দ শুদ্রমণিকে এ কাজে পাঠালেন। অনেক

১৬. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ৪১৫।
১৭ প্রতাপাদিত্য, পৃ. ৪৯।
১৮ উপেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা ও উহার কর্পোরেশন, পৃ. ৩।
১৯. প্রমথনাথ মল্লিক, কলিকাতার কথা, আদি কাণ্ড পৃ. ১৪।
২০ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৫।

খোঁজা-খুঁজির পর জয়ানন্দ কালীঘাটের কাছে এক কেল্লায় গুরুপুত্রকে পেলেন এবং তাঁকে মহারাজের কাছে নিয়ে এলেন।[২১]

আমরা আগেই বলেছি, শূদ্রমণি সম্ভবত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে লক্ষ্মীকান্তের 'রায়গড়' দুর্গে থাকার সংবাদ পান। তখন রায়গড় দুর্গ ছিল 'দুর্গম' ও 'সুরক্ষিত'। আর লক্ষ্মীকান্ত ছিলেন প্রতাপের সবচেয়ে প্রিয় ও বিশ্বস্ত অনুচর। সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন : "প্রতাপাদিত্যের রাজা; শঙ্কর দেওয়ানি ও মন্ত্রণা বিভাগের কর্ত্তা এবং সূর্য্যকান্ত সৈন্য-বিভাগের অধ্যক্ষ। প্রত্যেক বিভাগে ইঁহাদের সহকারী ছিল। দেওয়ানী বিভাগে লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, রূপরাম বা রূপবসু এই দুই জন শঙ্করের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন ব্রাহ্মণ বালক লক্ষ্মীকান্ত রাজসরকারে আশ্রয় লইয়া ক্রমে সদ্‌গুণ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে উন্নতি লাভ করিয়া প্রধান দেওয়ানের পদ পান। তিনি রাজস্ব বিভাগে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। এমন কি, প্রতাপাদিত্য ও শঙ্কর প্রভৃতি যখন যুদ্ধাদির জন্য স্থানান্তরে যাইতেন, তখন লক্ষ্মীকান্তের উপর রাজ প্রতিনিধির ভার অর্পিত হইত।[২২] সত্যচরণ শাস্ত্রী লিখেছেন : লক্ষ্মীকান্ত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট গমন করিয়া সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত এবং স্বীয় প্রতিভা বলে রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত হন।[২৩] সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে : লক্ষ্মীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যশোহরের প্রসিদ্ধ কায়স্থ রাজাদিগের সরকারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। পারসিক ভাষা ভালরূপ শিখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক দিল্লীর মোগল্ সম্রাট সমীপে দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হয়েন। বাদশাহ লক্ষ্মীকান্তের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মজুমদার উপাধি প্রদান করিয়া রাজস্ব আদায়ের জনৈক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন।[২৪]

প্রতাপাদিত্য যাঁর হাতে সমস্ত রাজ্যের দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে যুদ্ধের জন্য অন্যত্র যেতেন, যে লক্ষ্মীকান্ত "অত্যন্ত নিপুণতার সহিত প্রতাপের অনুপস্থিতিকালে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রতাপের প্রীতিভাজন হন।"[২৫] তিনি শত্রুপক্ষের লোক শূদ্রমণির কথায় মানসিংহের পক্ষে চলে যাবেন একথা কোনমতেই গ্রহণ করা যায় না।

মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষ্মীকান্ত প্রতাপের পক্ষেই ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হয়ে সন্ধি করেন। সম্ভবত এই সময়েই শূদ্রমণি মানসিংহের সঙ্গে লক্ষ্মীকান্তের পরিচয় করিয়ে দেন গুরু জিয়োর পুত্র হিসেবে।[২৬] একদিকে যুদ্ধে জয়লাভ, অন্যদিকে গুরুপুত্রকে পেয়ে মানসিংহ খুশী হন, এবং নিষ্কর এক জমিদারীর সন্ধান দেবার জন্য বলেন:

২১ অরুণ কুমার মজুমদার, প্রাচীন জনপদের ইতিকথা, পৃ ৯১।

২২ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃ. ১২৬, ২৬৪।

২৩ প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত, পৃ ১৭৯।

২৪ কালীক্ষেত্র দীপিকা, পৃ. ৭৮।

২৫ প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত, পৃ ১৭৪।

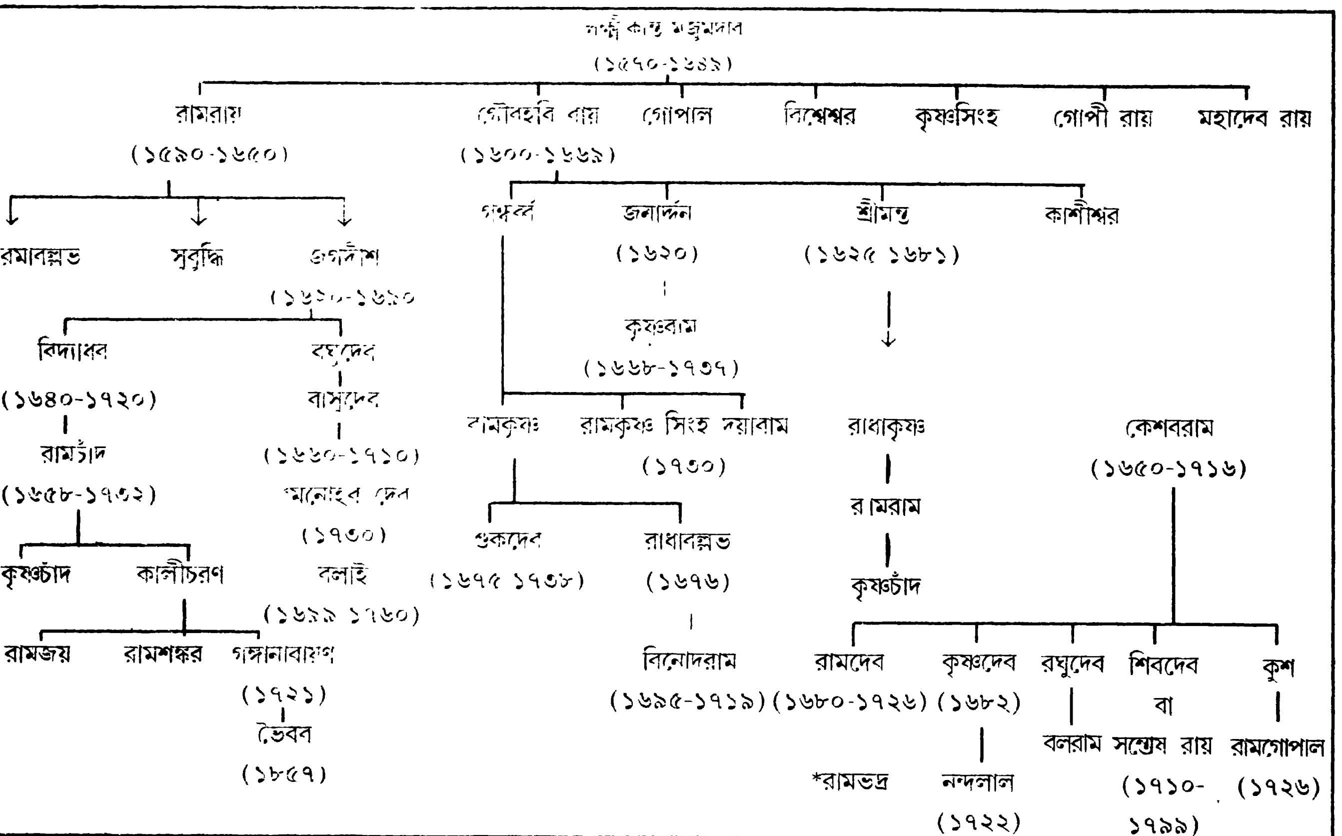
২৬ অর্ক, দমদম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৭৫ পৃ. ১৫।

তারপর রাজা, গুরুপুত্র-দরশন।
করিয়া, হইল, অতি আনন্দিত মন।।
শূদ্রমণি মহাশয়, করজোড় করি।
দেখেন, রাজার মনে আনন্দ-লহরী।।
*   *   *
তারপর রাজা কহে বালকের জন্য।
দেখ এক জমিদারী যাব কর শূন্য।।
বড়িশা আদি নানা পর্গণা স্থির হ'ল।
শিবশক্তির অদূরে, বড়িশায় বসিল।।

মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে লক্ষ্মীকান্তকে জমিদারী দেননি, দিয়েছিলেন গুরুর অনুরোধে। কাশীধামে মানসিংহ জিযোকে বলেন : গুরুদেব !... আমি সম্প্রতি রাজকার্য্যে বঙ্গদেশে গমন করিতেছি। সেখানে আপনার পুত্রের অনুসন্ধান করিয়া তাহার জীবিকার্থ একটী জমিদারী প্রদান করিয়া সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব।[২৭] সত্যচরণ শাস্ত্রীও জানিয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত পিতার অনুরোধে জমিদারী পান : মানসিংহ কামদেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মীকান্তের যে সকল সম্পত্তি ছিল তাহা সাম্রাজ্যন্তর্গত না করিয়া তাঁহাকেই প্রদান করেন।[২৮] সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই মতের সমর্থন করেন : মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোহরের প্রতাপাদিত্য উচ্ছেদ হইলে কামদেবের অনুবোধক্রমে রাজা মানসিংহ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারকে মাগুরা, খাসপুর কলিকাতা, পৈকান ও আনোয়ারপুর এই পাঁচটি পরগণা ও হেতে পরগণার কিয়দংশের জায়গীর সনন্দ আনাইয়া দেন। (দ্র. কালীক্ষেত্র দীপিকা, পৃ. ৭৮; বর্তমান সংস্করণ, পৃ. ৬২।)

যিনি লক্ষ্মীকান্তকে বিশ্বাসঘাতক বলে প্রচণ্ড সমালোচনা করেছিলেন, সেই প্রমথনাথ মল্লিকও স্বীকার করেছেন যে, জমিদারী পিতাই লক্ষ্মীকান্তকে পাইয়ে দেন : ব্রহ্মচারীকে কাশী হইতে কলিকাতা আনাইয়া পিতা পুত্রের পরিচয় ও সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে কালী ও কলিকাতা পরগণা লাভ করাইয়া দিল।[২৯] তা সত্ত্বেও লক্ষ্মীকান্তকে বিশ্বাসঘাতক বলা হয় কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে তা বোধগম্য নয়। প্রতাপাদিত্যের বন্ধু ও সেনাপতি শঙ্করের বংশধর সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রতাপাদিত্যের যে জীবনী লিখেছেন তাতে লক্ষ্মীকান্ত সম্পর্কে লিখেছেন : এই মহাপুরুষই বঁড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের আদিপুরুষ।[৩০]

২৭ কালীঘাট-ইতিবৃত্ত পৃ. ৪৮।
২৮. প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত. পৃ. ১৭৯।
২৯. কলিকাতার কথা আদি কাণ্ড, পৃ. ১৫।
৩০. প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত, পৃ. ১৭৯।


লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার
রামরায়
(১৫৯০-১৬৫০)
গৌরহরি রায়
(১৬০০-১৬৬৯)
গোপাল
বিশ্বেশ্বর
কৃষ্ণসিংহ
গোপী রায়
মহাদেব রায়
রমাবল্লভ
সুবুদ্ধি
জগদীশ
বিদ্যাধর
(১৬৪০-১৭২০)
রামচাঁদ
(১৬৫৮-১৭৩২)
কৃষ্ণচাঁদ
কালীচরণ
রামজয়
রামশঙ্কর
গঙ্গানারায়ণ
(১৭২১)
ভৈরব
(১৮৫৭)
রঘুদেব
বাসুদেব
(১৬৬০-১৭১০)
মনোহর দেব
(১৭৩০)
বলাই
(১৬৯৯ ১৭৬০)
গন্ধর্ব
জনার্দন
(১৬২০)
কৃষ্ণরাম
(১৬৬৮-১৭৩৭)
শ্রীমন্ত
(১৬২৫ ১৬৮১)
কাশীশ্বর
রামকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ সিংহ
দয়ারাম
(১৭৩০)
শুকদেব
(১৬৭৫ ১৭৩৮)
রাধাবল্লভ
(১৬৭৬)
বিনোদরাম
(১৬৯৫-১৭১৯)
রাধাকৃষ্ণ
রামরাম
কৃষ্ণচাঁদ
কেশবরাম
(১৬৫০-১৭১৬)
রামদেব
(১৬৮০-১৭২৬)
কৃষ্ণদেব
(১৬৮২)
রঘুদেব
শিবদেব
বা
কুশ
*রামভদ্র
নন্দলাল
(১৭২২)
বলরাম
সন্তোষ রায়
(১৭১০-
১৭৯৯)
রামগোপাল
(১৭২৬)

নদীয়ার জমিদারী কলকাতায়

শোনা যায়, নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জমিদারী ছিল কলকাতায়। 'নদীয়া কাহিনী'র লেখক জানিয়েছেন "মারহাট্টারা আসিয়া বার বার পশ্চিমবঙ্গ লুট পাট করিতে থাকে। এই ঘটনার নাম বর্গীর হাঙ্গামা। ... বর্গীর বিভ্রাটে নদীয়ার ভাগীরথী কুল যেমন ধ্বংস হইয়া ছিল তেমনি নবাবের রাজস্ব আদায়ের অযথা অত্যাচারে সমগ্র নদীয়ার প্রজাকুল উদ্বাস্তু হইতে বসিয়াছিল.... নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র পৈত্রিক ঋণ দশ লক্ষ মুদ্রা নিজ নজরানা না দিতে পারায় তৎকাল প্রচলিত নিয়মে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ থাকিতে বাধ্য হন। এখান হইতে তিনি সে সময়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু শীঘ্রই স্বীয় দক্ষ দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের কর্ম্ম কুশলতায় নজরানার টাকা পরিশোধ করিয়া মুক্ত হন। মারহাট্টা বিভ্রাট শেষ হইলে পুনরায় রাজস্ব বাকী দায়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। এবার নবাব আলিবর্দী স্বচক্ষে তাঁহার জমিদারীর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন। কথিত আছে চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে জলবিহারী নবাবকে নদীয়ার জলমগ্ন ভূভাগ সকল বিশেষতঃ নবদ্বীপের বংশাচ্ছাদিত জলাভূমির ও কলিকাতা সন্নিহিত বাদার জলময় স্থান সকলের দুরবস্থা দেখাইয়া সে যাত্রা অব্যাহতি লাভ করেন।"

ঘটনাটি কোন সময়ে ঘটেছিল? অন্নদামঙ্গল কাব্যে সেই সময়ের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"শাকে আগে মাতৃকা যোগিণীগণ শেষে।
বর্গীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥
আলিবর্দ্দী কৃষ্ণচন্দ্রে ধরে লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥
বন্ধ করি রাখিবেক মুরসিদাবাদে।
মোর স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥"

'শাকে আগে...' হেয়ালীর অর্থে ১৬৬৪ শক পাওয়া যায়, এর ৭৮ যোগ করলে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে ঘটনাটি ঘটে ছিল। নদীয়া কাহিনির লেখক ঠিক লিখেছেন 'কলিকাতা সন্নিহিত বাদা' অঞ্চলে জমিদারী ছিল। কলকাতার পার্শ্ববর্তী ৩৮টি গ্রামের মধ্যে কাঁকুড়গাছি অঞ্চলের বড় অংশ নদীয়া পরগণায় এবং বিজী অঞ্চলে একটা ছোট অংশ নদীয়া পরগনায় ছিল। ১৭১৭ খ্রি. সুতানুটি-গোবিন্দপুরে কলকাতা বাদে যে নাম, তারও পরগণার নাম এবং কোন পরগনায় কত রাজস্ব ছিল তার তার তালিকাটি দেখলে নদীয়া পরগনার সঠিক অবস্থানটি ধরা যাবে।

	গ্রামের নাম	পরগনার নাম	রাজস্ব		
			টাকা	আনা	পাই
	হাওড়ার দিকে				
১.	সালকিয়া	বোরো	৬১	১১	০
		পাইকান	২১৬	৩	৩

	গ্রামের নাম	পরগনার নাম	রাজস্ব		
			টাকা	আনা	পাই
২.	হাওড়া	বোরো	২৩৭	৫	৪
		পাইকান	১৪৫	১৩	৫
৩.	কাসুন্দিয়া	বোরো	১২৯	৪	- ৪
		পাইকান	০	৮	৭
৪.	রামকৃষ্ণপুর	বোরো	৮৯	৩	৮
		পাইকান	৮০	১১	০
৫.	বেতোর	বোরো	৩৫১	১৩	০
		পাইকান	২২৯	১	৯
	কলকাতার দিকে				
৬.	দক্ষিণ পাইকপাড়া	আমীরাবাদ	১৪৫	২	২
৭.	বেলগাছিয়া	কলকাতা	৩০৪	৬	৯
		পাইকান	০	১৩	১০
৮.	দক্ষিণ দাঁড়ী	কলকাতা	৩৭	৮	৯
		পাইকন	১২	০	৩
		আমীরাবাদ	৩৭৬	০	০
৯	হোগলকুড়িয়া	পাইকান	১৩৭	১১	৩
১০.	উল্টাডিঙ্গি	কলকাতা	১৯৪	১	৬
		পাইকান	১২০	১২	৯
১১.	সিমলা	মানপুর	৮১	১৫	৫
১২.	মাকন্ড	মানপুর	১১৮	১২	৮
১৩.	কামারপাড়া	কলকাতা	৬৩	১০	৯
১৪.	কাঁকুড়গাছি	পাইকান	৩৭	৭	০
		নদীয়া	১৭০	১৫	৮
১৫.	বাগমারি	কলকাতা	৪৯	৭	৮
১৬.	আরকুলি	মানপুর	২২	১১	৯
১৭.	মীর্জাপুর	কলকাতা	৫৭	১৫	৯
		পাইকান	১১৫	১৩	৯
১৮.	শিয়ালদহ	কলকাতা	১১৮	৯	১০

	গ্রামের নাম	পরগনার নাম	রাজস্ব		
			টাকা	আনা	পাই
১৯.	কুলিয়া	কলকাতা	১২৭	৬	৮
		পাইকান	৪৪৫	৩	৯
২০.	ট্যাংরা	কলকাতা	৬২	১১	৬
		পাইকান	১৬৬	১	৯
২১.	শুঁড়া	কলকাতা	৬২	০	৪
		পাইকান	৫৮৬	১১	৮
২২.	বাহির শুঁড়া	কলকাতা	৪০	৮	০
২৩.	শেখপাড়া	কলকাতা	৪১	৬	৬
২৪.	দলন্দ	কলকাতা	১১১	৬	৮
		পাইকান	১৯৫	১	০
২৫.	বির্জী	কলকাতা	২২	৬	২
		পাইকান	২১৩	১০	১
		নদীয়া	১	১৪	০
২৬.	তিলজলা	কলকাতা	৩১	১১	০
		পাইকান	১৭৫	৩	৫
২৭.	তপসিয়া	কলকাতা	৭৩	৮	০
		পাইকান	২১৭	২	৯
২৮.	সাপগাছি	কলকাতা	২১১	৩	০
২৯.	চৌবাঘা	কলকাতা	৩৭	৪	০
৩০.	চৌরঙ্গী	কলকাতা	৭৪	১৩	৫
		পাইকান	৭৪	১৪	০
৩১.	কলিঙ্গা	কলকাতা	২৭০	৩	৩
		পাইকান	১১৩	৪	১০
৩২.	গোচরা	পাইকান	১০০	১	৬
৩৩.	বাহির দক্ষিণদ্বারী	পাইকান	১২৫	৮	৪
৩৪.	শ্রীরামপুর	কলকাতা	১১	৭	৩
		পাইকান	৯৫	৩	৭
		আমীরাবাদ	২০	৮	০

গ্রামের নাম		পরগনার নাম	রাজস্ব		
			টাকা	আনা	পাই
৩৫.	জলা কলিঙ্গা	কলকাতা	১১৪	৩	৮
৩৬.	গোন্দলপাড়া	কলকাতা	৩১	৯	২
		পাইকান	৭০	৪	৪
৩৭.	এন্টালী	কলকাতা	৬১	৯	১০
		পাইকান	১৬৭	৮	৮
৩৮.	চিৎপুর	আমীরাবাদ	২৫২	৮	০

এই ৩৮টি গ্রামের মধ্যে কোন কোন গ্রামে একটি, কোন গ্রামে দুটি, আবার কোন গ্রাম রয়েছে তিনটি পরগনার মধ্যে। নীচে আটত্রিশটি গ্রামের ক্রমিক নম্বর সাজিয়ে কোন কোন পরগণায় এই গ্রামগুলি রয়েছে দেখে নেওয়া যাক—

আমীরাবাদ	বোরো পাইকান	কলকাতা পাইকান	নদীয়া পাইকান	নদীয়া পাইকান কলকাতা	আমীরাবাদ পাইকান কলকাতা	কলকাতা	পাইকান	মানপুর
	১	৭,১০	১৪	২৫	৮	১৩	৯	১১
	২	১৭,১৯			৩৮	১৫	৩২	১২
	৩	২০,২১				১৮	৩৩	১৬
৬	৪	২৪,২৬				২২		
৩৮	৫	২৭,৩০				২৩		
		৩১,৩৬				২৮		
		৩৭				২৯		
						৩৫		
মোট ২	৫	১৩	১	১	২	৮	৩	৩

উপরের তালিকা অনুযায়ী কাঁকুড়াগাছি এবং বির্জী এই দুটি অঞ্চল নদীয়া রাজার অধীন ছিল বলে জানা যায়। অন্য একটি সূত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে সিক্কা এক টাকা বিঘা হারে খাজনা দিয়ে নবদ্বীপাধিপতি প্রভৃতি ভূমধ্যাধিকারীগণের কাছ থেকে ইংরেজরা বেনিয়াপুকুর, পাগলাডাঙ্গা, ট্যাংরা ও ধলন্ডা এই কয়েকটি স্থান বন্দোবস্ত করে নেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জনৈক গোমস্তা ঐ সব স্থানের অন্তঃপাতি ৪২ বিঘা জমির জন্য কোম্পানির কাছে বার্ষিক সেলামী চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু হলওয়েল সাহেব গভর্নর ড্রেক সাহেবকে লেখেন, এমনভাবে সেলামী দিলে কোম্পানীর অপমানের পরিসীমা থাকবে না, তাই না দেওয়াই কর্তব্য।[১]

এই অঞ্চলের অনেক জমিই যে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের অধীন ছিল তা জোর দিয়েই বলা যায়। ভাল আয়ের এই জমিদারীটি ঘুরে গেলে। শেষে শ্রদ্ধেয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য

১। কলিকাতা কল্পলতা' পৃ ৯৬-৯৭ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

করেছেন এই বলে যে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ভৃত্যগণ কোম্পানীর কাছে সেলামী প্রার্থনা করিত, বলাই কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতিকে সেলাম প্রদান করেও লোকের উপাসনা এই অঞ্চলের অনেক জমিই যে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজের জমিদারী মধ্যে ছিল তা জোর দিয়েই বলা যায়। এই ভাল আয়ের জমিদারী অঞ্চলটি ধ্বংস হয়ে যায় ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভয়ঙ্কর ঝড় ও ভূমিকম্পে। বিদ্যাধরী নদীর এই ধারা ঐ সময় থেকেই মোটামুটি নালায় পরিণত হয়। সেকারণেই ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলিবর্দী খাঁকে এই বাণিজ্য কেন্দ্রের দুরবস্থা দেখিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১২ লক্ষ টাকার খাজনা মকুব করিয়ে নিয়েছিলেন। এখানে বসে সেকালের বর্ধিষ্ণু এই বাণিজ্য কেন্দ্রটি কেমন ছিল তা বোঝা যাবে না, তবে রাজস্বের হিসেব থেকে উত্তর কলকাতার সঙ্গে পূর্ব কলকাতার অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রথমে কলকাতার বাইরে ৩৮টি গ্রামের মধ্যে আজকের পূর্ব কলকাতার কিছু জায়গার রাজস্বের তালিকার উপর আর একবার চোখ বোলাতে অনুরোধ করছি—

নাম	সেকালের বানান	পরগণা	রাজস্ব		
			টাকা	আনা	বই
উল্টাডিঙ্গি	Ultadany	কলকাতা/পাইকান	৩১৪	১৩	১৫
দক্ষিণদ্বারী	Dackneydand	ঐ ঐ	৪২৫	৮	১২
বাহির দক্ষিণদ্বারি	Badokneydand	পাইকান	১২৫	৮	৪
কাঁকুড়গাছী	Caneerigasorah	নদীয়া/পাইকান	২০৮	৬	৮
কুলিয়া	Coolnah	কলকাতা/পাইকান	৫৭১	৯	১৭০
শুঁড়া	Shunrah	ঐ ঐ	৬৪৮	১১	১২
বাহির শুঁড়া	Bad Sundah	ঐ ঐ	৪০	৮	×
শিয়ালদা	Sealda	কলিকাতা	১১৮	৯	১

এবার দেখা যাক কলকাতার দিকের রাজস্ব। সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার পরগণা ও রাজস্ব ছিল নিম্নরূপ—

নাম	পরগণা	রাজস্ব		
		টাকা	আনা	পাই
সুতানুটি—	পাইকান/আমিরাবাদ	৫০১	১৫	৬
গোবিন্দপুর-	পাইকান	১২৩	১৫	৩
গোবিন্দপুর-	কলকাতা	১০০	৫	১১
ডিহি কলকাতা-ক	লকাতা	৪৬৮	৯	৯

কলকাতার মধ্যবর্তী এবং দক্ষিণদাড়ি-উল্টোডাঙ্গা থেকে বেলেঘাটা শিয়ালদহ পর্যন্ত অঞ্চলের রাজস্বের তালিকা মেলালে অবাক হতে হয় এই কারণে, যে অঞ্চলকে বাদা জঙ্গল বলে সকলে মত দিয়ে এসেছেন সেই জঙ্গলের রাজস্ব এতে হয় কি করে? এই রাজস্বের উৎসের সম্পর্ক রয়েছে কুচিনান-বেলেঘাটা অঞ্চলের বাণিজ্যের সঙ্গে। বিবেকানন্দের ভাই শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত ঠিকই জানিয়েছেন—"হাটখোলা (সুতানুটি) অঞ্চলটা আগে এত কারবারী ছিল না। কলিকাতার বন্দর ছিল বেলেঘাটা। কথায় ছিল, 'ই যার নৌকো পুঁজিপাটা সে থাক্‌গে বেলেঘাটা'। তাহার পর হাটখোলা গুলজার হইল। বাঁশকে দু ভাগে ভাগ করে চিরে বেড়া দিয়ে গোলাঘর হইল এবং তাহাতেই মালপত্র থাকিত।"

ইংরেজ শাসনের বাইরে বেলেঘাটা বন্দর

১৭২২ খ্রি. মুর্শীদকুলী খাঁন নিয়ম করে দিয়েছিলেন, জমিদারী মালিকানা প্রতিবছর পুনঃনবিকরণ করতে হবে। আর কেউ ইংরেজদের কাছে জমি বিক্রি করতে পারবে না। ইংরেজরা এই অবস্থায় বেনামে জমি কেনা শুরু করলো। নিয়মে আরো বলা হলো, কোন তালুকদার যদি ইংরেজদের তালুক হস্তান্তর করে তবে ইংরেজদের কাছ থেকে হুগলীর নবাবী প্রশাসন কোন রাজস্ব গ্রহণ করবে না—তালুকদারকেই চাপ দিয়ে তাকেই মালিক বলে, বকেয়া খাজনা তার কাছ থেকে আদায় করে নেবে। পুরনো জমিদারদের চাপে রেখেও রাজস্ব আদায়ে নবাব ব্যর্থ হলেন। জমিদারীগুলি এই ভাবেই হস্তান্তরিত হয়ে গেল।

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ইংরেজ কলেকটর হলওয়েল সাহেব তিন রকম জমির বর্ণনা করেছেন, এক, লোক বসতিপূর্ণ স্থান যা বিঘা প্রতি ৩ টাকা আদায় দিয়ে মানুষ বসবাস করত (৫৪৭২ বিঘা)। **দুই**, কর ছাড়া জমি কোম্পানির নিজস্ব গীর্জা, মসজিদ, মন্দির দেবোত্তর, পুকুর ইত্যাদি (৭৩৩ বিঘা)। **তিন**, নবাবের কাছ থেকে পাওয়া জমি ইংরেজদের মালিকানা স্বীকার করে নেয় নি (৩০৫০ বিঘা)।

১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে হলওয়েল সাহেব নওয়াজী মালিক ও রসিদ মালিক নামে দুই ব্যক্তির কাছ থেকে ২,২৮১ টাকা দিয়ে সিমলার পাট্টা পেয়ে তা দখল নেয়, ১৮৫৪ খ্রি. পর্যন্ত (একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে) চেষ্টা করেও জমিদারকে দিয়ে মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারেননি।

সিমলা এবং বেলেঘাটার এই জমির মালিক ছিলেন কলকাতার সাবর্ণ জমিদার লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার বংশের নন্দলাল। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে যখন ইংরেজরা ৩৮ গ্রাম কেনে তখনও বেলেঘাটা কিনতে চেয়েছিল কিন্তু 'নন্দলাল' তা বিক্রি করেন নি। ১৭৪৭ খ্রিঃ সিমলা ও বেলেঘাটা মিথ্যা দলিল করে দুটোই বেনামীতে ইংরেজরা কিনেছিলেন। ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে নন্দলাল (মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যে নওয়াজী মালিক ও রসিদ মালিক নামে জনৈক ব্যক্তি সিমলা মৌজার মালিকানার মিথ্যা দাবীতে দখল করেছেন। আর বেলেঘাটা মৌজাটি রাসবিহারী শেঠ নামে এক ব্যক্তিও মিথ্যা মালিকানা দাবী করে দখল করে বসে আছেন। বেলেঘাটা সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করা চিঠির সারাংশ Holwell's Trusts গ্রন্থ থেকে নিচে দেওয়া হল—

"বাদশা মুহম্মদ শাহ গাজী, জয়ী, সাল ১১৫৫ হিজরী, বিনীত সেবক সৈঈদ মুহম্মদ খান বাহাদুর।

হুগলী চাকলার অন্তর্গত খাসপুর প্রভৃতির মালিক নন্দলালের পক্ষে উকীল রামরামের আবেদন।

মানিকলাল শেঠের তালুক বলে বেলিয়াঘাটা মৌজা হতে যৎসামান্য খাজনা আদায়

হচ্ছে, কিন্তু দেওয়ান মুলীচাঁদ আবেদনকারীর প্রতি কুৎসিৎ ভাষা প্রয়োগ করায়, আবেদনকারী পূর্ণ রাজস্ব উসুল দিয়েছেন। কিন্তু এই বিনীত সেবক দরবার কর্তৃক নির্দ্ধারিত রাজস্ব আদায় করে সরকারে বরাবর জমা দিয়ে আসছেন। মানিকলালের পুত্র রাসবিহারী শেঠ গত সনে (১৭৪৬ খ্রিঃ) ভজন সিংহের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে একটা সনদ লাভ করে বেলিয়াঘাটা গ্রামের ঘাটটি দখল করে। (যার উপর তালুকদার হিসেবে তার কোনরূপ হক নাই)। হালসনে ঘাটটি আমার মক্কেল নন্দলালের অধিকারে আগের মতো আছে। কিন্তু এখন রাসবিহারী নিম্নশ্রেণীর বহু ব্যক্তিকে ঐ ঘাটে সমবেত করেছে এবং খুব সম্ভবত আমার মক্কেলের উপর আক্রমণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত ঃ, কলকাতার নওয়াজী মালিক কোন কারণ ছাড়াই সিমলা মৌজাটি দখল করেছে এবং জাল সনন্দ সংগ্রহ করেছে, যদিও আমি নির্দ্ধারিত সময়ে নির্দ্ধারিত পরিমাণ খাজনা সব সময়ই দিয়ে থাকি।

আবেদনকারী নবাব সরকারের কাছে এই অনুগ্রহের নিমিত্ত বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছেন যে, মুহম্মদ ইয়ার বেগ খানের উপর এই অভিযোগগুলি তদন্ত করবার এবং বিরোধ নিষ্পত্তি করার আজ্ঞা হয়।"

এই চিঠির উপরে নির্দেশ দেওয়া হয়—"মুহম্মদ ইয়ার বেগ খানের উপর মহামান্য সৈঈদ আহমদ খান বাহাদুরের হুকুম হইল যে, তিনি উক্ত বিরোধ তদন্ত ও নিষ্পত্তি করে অত্যাচারের অবসান ঘটাবেন।"

তারিখ ১৬ই শওয়াল, অধিরোহণের ২৬তম বৎসর।

তদন্তের আদেশ হলেও কোন কাজ হয়নি। তদন্ত হয়েছিল এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, তদন্ত হয়ে থাকলেও তার কোন ফল হয়নি। ১৭৫৪ খ্রি. হলওয়েল বেনামীতে এই মৌজা কিনেছেন জানা জানি হয়ে গেলে নন্দলালকেই জমিদার বলে ঘোষণা করা হল। ঘোষণায় বলা হয়েছে—

সাল ১৪৬২ হিজরী আহমদ শাহ বাহদুর গাজী সাল পহেলা গজী মুহম্মদ ইয়ার বেগ খান।

.... ইহা ঘোষিত হইতেছে যে, বয়ঃজ্যেষ্ঠ মালিক নন্দলাল চৌধুরীর নিকট হতে উক্ত বকেয়া রাজস্ব আদায় লয়ে নিম্নে পঞ্জীকৃত বিবরণ অনুযায়ী উক্ত নন্দলাল চৌধুরীর খাস মালিকানায় হস্তান্তরিত হল এবং উক্ত চৌধুরী নির্দ্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে উক্ত সম্পত্তির মালিকানায় বহাল থাকবে।

সর্দার, রাইয়ত ও কৃষকগণ উক্ত চৌধুরীকে স্বাধীন তালুকদার রূপে মেনে নেবে, তারা অপর কোন ব্যক্তিকে তার সমকক্ষ বা হিস্সাদার হিসাবে স্বীকার করবে না। এই হুকুম তারা সকলে বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করতে বাধ্য থাকবে।

১৪ই রজব, মহান অধিরোহণের ৭ম বৎসর।

বাস্তবক্ষেত্রে ঘোষণাটি অকার্যকরী হয়ে গেল, ঘোষণাটি কেউই মেনে নিল না। স্থানীয় রাজস্ব অধীকারীগণ জমিদারকে তাঁর সম্পত্তিতে দখল দানে অক্ষম হলেন।

১৭৫৭ খ্রি. সুবাদার জাফর আলি খাঁনের সঙ্গে চুক্তি করে তাঁর মারাঠা খালের বাইরে ৬০০ গজ পর্যন্ত এলকা অধিকার করলেন। এইভাবে মারাঠা খালের পূর্ব দিকের উপকণ্ঠ এলাকা দানরূপে গণ্য হলো। সাবর্ণ জমিদার বংশের অতুলকৃষ্ণ রায় জানিয়েছেন (পৃ. ৬৬) "কলিকাতা ও সংলগ্ন মৌজাসমূহ ইংরেজগণ অধিকার করায়, সাবর্ণ পরিবার নিপীড়িত হয়েছিল বলে শোনা যায়। ১৭৮৩ খ্রি নন্দলালকে এবং তাঁর বংশধরকে ১৭৯৩-৯৪ পর্যন্ত কলিকাতার জমিদাররূপে গ্রহণ করা হয়।"

কলকাতার কবি কৃষ্ণরাম দাস

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্টকে কলকাতার জন্মদিন ধরা হয়েছিল, বহুল প্রচারিত এই দাবিকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য জব চার্নকের পূর্বে 'কলকাতা' নাম ছিল কি না তার তথ্য খোঁজা হয়েছিল। কলকাতার কবি কৃষ্ণরাম দাস জব চার্নকের ১৪ বছর আগে 'কলকাতার' কথা লিখে রেখে গেছেন। কবি কৃষ্ণরাম দাসকে কলকাতার কবি বলেছি কারণ সেকালে রাজদরবারে তিনি রাজ কবি ছিলেন, রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ সভা কবিকাব্য রচনা করাতেন। কলকাতার জমিদারি পেয়েছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। যে পাঁচটি পরগনা জমিদারি পেয়েছিলনে সেই পাঁচটি পরগণা হল মাগুরা, খাসপুর, পাইকান, আনোয়ারপুর, কলকাতা এবং হাতিয়াগড় পরগনার কিছু অংশ। এই পরগনাগুলি অবস্থিত ছিল—

১. **মাগুরা**—আলিপুরের অধীন। প্রধান জায়গা আলিপুর, গার্ডেনরীচ, খিদিরপুর, চেতলা প্রভৃতি।

২. **খাসপুর**—ডায়মন্ডহারবারের অধীন। প্রধান জায়গা বড়িযা, রসা প্রভৃতি।

৩ **কলকাতা**—কলকাতা পরগনার উত্তর দিকের অংশ, প্রধান প্রধান স্থান চাণক (ব্যারাকপুর), দমদম, নিমতা, বরানগর, আগড়পাড়া, খড়দহ, বেলঘড়িয়া ইত্যাদি।

৪. **পাইকান**—গঙ্গার পশ্চিমতীরে। প্রধান জায়গা সালখে শ্রীরামপুর ইত্যাদি।

৫ **আনোয়ারপুর**—সঠিক স্থান জানা যায় নি।

৬. **হাতিয়াগড়**—ডায়মন্ডহারবারের মধ্যে। প্রধান জায়গা মথুরাপুর, রামনগর, বেলেপুকুরিয়া, বাঁশতলা ইত্যাদি।

কলকাতার সাবর্ণ জমিদারদের জমিদারি ছিল, মোটামুটি ব্যারাকপুর থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত। এই বংশের গৌরহরি মজুমদার (১৬০০ খ্রিঃ - ১৬৬৯ খ্রিঃ) বর্তমান বেলঘড়িয়া নিমতা গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। জমিদারি দেখাশোনা, রাজস্ব আদায় সবই নিমতা দমদম অঞ্চল থেকেই করতেন।

কলকাতার জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় নিমতার কবি কৃষ্ণরাম দাস পাঁচ খানা কাব্য লিখেছেন ১: কালিকামঙ্গল (১৬৭৬ খ্রিঃ), ২। ষষ্ঠী মঙ্গল (১৬৭৯ খ্রি.) ৩। রায়মঙ্গল (১৬৮৬ খ্রিঃ) ৪। শীতলা মঙ্গল এবং ৫) কমলামঙ্গল কাব্য। কাব্যরচনায় কবি শ্রদ্ধার সঙ্গে সাবর্ণ জমিদার গৌরহরির পুত্র গন্ধর্ব, জনার্দ্দন (১৬২০ খ্রি.), শ্রীমন্ত (১৬২৫ খ্রি. - ১৬৮১ খ্রি.) এবং কাশীশ্বরের প্রশংসা করেছেন—

বসতি করয়ে তথি   সদাচারী শুদ্ধমতি
ধীর ধরাদেবগণ সুখে।
হেন দেখি মনে লয়   নারদ আদি মুনিয়ে

১ ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১১ সন পৃ. ৩৫১-৫২

অবতার কৈল কলিযুগে।। ৫০

চৌধুরী গন্ধর্ব্বারি বলে নাহি অধিকারী

অধিকার অনেক ধরণী।

দহিতে অহিতবন ছিল দারাহুতাশন

ভার ভরে প্রতাপে তরণী।। ৫১

সাবর্ণ্য চৌধুরী সব একমুখে কিবা নিব

অশেষ মহিমা অতি স্থির।

শ্রীশ্রীমন্তরায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়

ধার্ম্মিক যেমন যুধিষ্ঠির।। ৫২

বিদ্বান উত্তম দাতা জিনিয়া কল্পলতা

জনার্দ্দন রায় মহাশয়।

উপমা কোথায় এতো কি কহিব গুণ যত

সহস্র বচন মোর নয়।। ৫৩

প্রতাপে তিমির হর যশের যামিনী কর

শুদ্ধমতি কাশীশ্বর রায়।

পুণ্যের অবধি নাই দেখি ইন্দ্র ভয় পাই

কলিকালে এমন কোথায়।। ৫৪

সেই গ্রামের মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস

কায়েস্থ কুলেতে উৎপতি।

তাহার তনয় হই নিজ পরিচয় কই

বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি।। ৫৫

কুড়ি বছর বয়সী ভগবতী দাসের পুত্র কৃষ্ণরাম দাস সাবর্ণ জমিদারদের রাজধানী নিমতা গ্রামকে 'ধরণীর নাহিক তুল' বলে মন্তব্য করেছেন। 'কালিকামঙ্গল' কাব্য রচনা কালে অর্থাৎ ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ছোট্ট গ্রাম নয়, গ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে 'কলকাতা' তখন পরগনার সম্মান আদায় করে নিয়েছে। 'কলকাতা' পরগনা তখন ছিল সরকার সপ্তগ্রামের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে কথাগুলি কবি কৃষ্ণরামের লেখায় ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে এই ভাবে—

অতি পুণ্য [ময়] ধাম সরকার সপ্তগ্রাম

কলিকাতা পরগনা তার।

ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্ব্বকূল

নিমিতা নামেতে গ্রাম যার।। ৪৯

'রায়মঙ্গল' কাব্যে কবি পরগনা কলকাতার কথা নয়, স্থান কলকাতার কথা বলেছেন।

'ক্ষিতিতলে কলিকাতা জাহ্নবীর কূলে।

ক্ষীণ কৃষ্ণরাম বলে রায়পদতলে।। ৬৬৫

এবার আর শুধু 'কলিকাতা' নয়, কবি 'ডিহি কলকাতা'র কথা শুনিয়েছেন—

'বরাহনগর বালি পিছে কতদূর।

সর্ব্বমঙ্গলা পূজে চিতপুর।। ১৭৮

পশ্চাত করিল বেগে ডিহি কলকাতা।

কালীঘাটে পূজিল কালী ত্রিজগতমাতা।। ১৭৯

'ডিহি কলকাতা'—'ডিহি' শব্দের অর্থ কী? শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন 'ডিহি' অর্থে 'শাসন কর্তার সরকারি বাসভবন বা দুর্গ বলে জানিয়েছেন।'[১] শ্রদ্ধেয় প্রভাত রঞ্জন সরকার 'ডিহি' এবং 'ডিহা' দুটো শব্দকে অষ্ট্রিক শব্দ বলেছেন। তাঁর মতে 'যদি চারিপাশে শুকনো মাঠের মাঝখানে ছোট্ট গ্রাম থাকে তা'হলে তাকে বলে 'ডিহি'... আর বড় গ্রাম থাকে তবে তাকে বলে 'ডিহা'। ... লক্ষণীয় এই যে ডিহি/ডিহা নামাঙ্কিত গ্রাম/শহরগুলি (অল্প দু'একটি ব্যতিক্রম বাদে) বৃষ্টিবহুল বাংলায় নেই। সবগুলিই পশ্চিম রাঢ়ে অবস্থিত, কারণ পশ্চিম রাঢ় শুকনো মাটির দেশ। পূর্ব কলিকাতায় 'ডিহি' নামক পল্লীতে সম্ভবত সেকালে সুন্দরবন কেটে রাঢ়ের মানুষেরাই বসবাস শুরু করেছিলেন ও 'ডিহি' নামটি ব্যবহার করেছিলেন।'[২]

সুপ্রাচীন অষ্ট্রিক শব্দ 'ডিহি'কে আগে রেখে কলকাতা কতদিন থেকে 'ডিহি কলকাতা' হয়েছেন জানা না গেলেও, জব চার্নকের আসার আগে থেকেই যে 'ডিহি' কলকাতা' ছিল তার প্রমাণ কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্য। 'কলিকাতা', 'ডিহি' কলকাতা, 'কলিকাতা পরগনা' সবগুলির কথাই শুনিয়েছেন। এই সমগ্র কলকাতার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীর বংশধরগণ যখন নিমতাকে কলকাতা জমিদারির রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র করলো, তখন নিমতা-দমদম অঞ্চলকে এই রাজ্যের রাজধানীর সম্মান দেওয়া যেতে পারে। এই সাবর্ণ রাজারা দমদম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছিল 'হাট' যা 'রাজারহাট' নাম পেয়েছিল। সেই রাজধানীর সম্মান পেতে পারে যে নিমতা গ্রাম সেই গ্রাম সম্পর্কে কবি কৃষ্ণরাম দাস লিখেছেন—

'গ্রাম নিমিতা গঙ্গার পূর্বকূল।

সাবর্ণ চৌধুরী সব যাহাতে অতুল।। ১২৯৪

গোমহিষ পশুপক্ষ বৃক্ষ পর টাট।

১ *কলিকাতার কাহিনী পৃ ২৮*

২ *প্রভাতরঞ্জনের ব্যাকরণ বিজ্ঞান ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২৬।*

রম্য সরোরবতীর সানবান্ধা ঘাট।। ১২৯৫

নগর রাজার হাট দেখিতে সুন্দর।

কৈলাস শিখরে যেন দেব পুরন্দর।।১২৯৬

ভগবতী দাস নাম তথায় বসতি।

কৃষ্ণরাম বিরচিল তাহার সন্ততি।। ১২৯৭

নিমতা গ্রামকে কবি বৈকুণ্ঠের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন—

'নিমিতা নামেতে গ্রাম বৈকুণ্ঠ সমান ধাম,

স্বপনে যেমন কহিলা তেমন।। ২১৯

কবি 'অপরূপ কলিকাতা'র সঙ্গে বন্দনা করেছেন নিমতা গ্রামকে—

'ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীর অপরূপ নাম।

কলিকাতা বন্দিনু নিমিতা জন্মস্থান।।

কবি কৃষ্ণরাম বলে পরম ভকতি।

হরি হরি বল ভাই যাহাতে মুকতি।।৪৭—৪৮

কবির লেখা থেকে পাচ্ছি কালীঘাট, বরাহনগর, বালি, কোতরঙ্গ—

'বিজয় পবনে বায় শীতলার কৃপায়

তীরের গমনে যায় তরী।

কালীঘাটে পূজে কালী বরাহনগর বালি

কোতোরঙ্গ আদি পাছে করি।।" ৩৭৫

সাবর্ণ জমিদারগণ নিমতা থেকে রাজস্ব বিভাগ বড়িযায় নিয়ে যান ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে। তখন কলকাতা সুতানুটি গোবিন্দপুর তিনটি গ্রামই হাতছাড়া, ইংরেজরা কিনে নিয়েছেন। সম্ভবত সাবর্ণ জমিদারদের কাছারি এর আগে বড়িযাতে বসবাস করতেন। কবি কৃষ্ণরাম দাস 'রায়মঙ্গল' কাব্যে বড়িযাকে খাসপুর পরগনার মধ্যে 'মনোহর' স্থান বলে উল্লেখ করেছেন।

'শুনহ সকল বীর অপূর্ব্ব কথন।

যেমতে রচিল এই কবিতা বচন।।১২

খাসপুর পরগনা নামে মনোহর।

বড়িযা তাহার এক গ্রাম বিশ্বম্ভর।। ১৩

তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।

নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোয়ালঘরে।।১৪

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।

বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন।। ১৫

করে ধনুঃশ্বর চারু সেই মহাকায়।

পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায়।।১৬

কৃষ্ণরাম দাসকে সাবর্ণ রাজাদের কবি বলে 'রাজ-কবি' হিসেবে আমরা উল্লেখ করেছি। এই উল্লেখের কারণ আমরা আগে দেখিয়েছি, কবি সাবর্ণ জমিদারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। সাবর্ণ জমিদারগণ ছিলেন সরকার সাতগাঁ-এর নবাব 'সায়িস্তা খা'-এর অধীন, আর নবাব ছিলেন আবার দিল্লীর ঔরঙ্গজেবের অধীন। তাই কবি সকলেরই প্রশংসা করেছেন তাঁর কাব্যে

'অরংসাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল

রাম রাজা সর্ব্বজনে বলে।

নবাব সারিস্তা খাঁ আদি করি সাতগাঁ

বহু সরকার করতলে।।'৬৬

রাজ-কবি বলেই তাঁর এই শাসক সুখ্যাতি। শ্রদ্ধেয় সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্যও চেষ্টা করেছেন মূল সূত্রটি ধরতে।[১] তিনি লিখেছেন —'সম্রাট' ঔরঙ্গজেবের এতখানি সুখ্যাতি করার মূলে দুটি কারণ থাকতে পারে—এক, বাংলা দেশের মোগল যুগের ইতিহাসে নবাব শায়েস্তা খাঁর শাসনকালে সুশাসনের জন্য অতিশয় সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লোকের ঘরে যেমন অন্নের অভাব ছিল না, আর্থিক সচ্ছলতার জন্য মনেও শান্তি ছিল প্রচুর। যে নবাব এতখানি সুখ সমৃদ্ধির সৃষ্টি করতে পারেন তাঁর মনিব বাদশা না জানি আরও কত বেশি মঙ্গল সাধনে সক্ষম—এমনি একটা ধারণা হতে মনে হয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কবির কণ্ঠে ঔরঙ্গজেবের প্রশংসা ধ্বনিত হয়েছে। দুই, কবি অথবা তাঁর পোষ্টা হয়তো সুবেদার সরকারের কর্মচারী ছিলেন।

তা ছাড়া গ্রামের শাসনকর্তা ছোট ছোট জমিদারগণের সুব্যবস্থাপনায় গ্রামেও সুখ শান্তি বিরাজ করতো। আত্মবিবরণী অংশে কবি তাঁর সংগ্রামের চৌধুরীবংশীয় জমিদারগণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। তাঁদের কেহ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্মিক, কেহ বা দানে কল্পলতার ন্যায়, কারো মহিমার জ্যোতি সূর্যকিরণের ন্যায় ভাস্কর। জমিদারগণের এবংবিধ বর্ণনায় অতিশয়োক্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়, তথাপি স্বগ্রামের সমৃদ্ধির যে বর্ণনা তাঁর কাব্যে পাই এবং অকুণ্ঠ চিত্তে নবাব-বাদশাহের যে প্রশংসা তাঁর কণ্ঠে শুনি তাতে মনে হয় এই বর্ণনার অনেকাংশই সত্য।'

সম্ভবত শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্য জানতে পারেননি কবি কৃষ্ণরাম দাসের বর্ণনার সাবর্ণ জমিদারগণ কলকাতার জমিদার, এই কারণেই সোজাসুজি কবিকে 'রাজ-কবি' বলতে দ্বিধা করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে কবি কৃষ্ণরাম দাস পাঁচটি কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'মঙ্গলকাব্যে'র পুথিগুলি যেখানে রয়েছে তার তালিকা হলো—

১ কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী পৃ. ভূমিকা ১।

কালিকা মঙ্গল (১৬৭৬ খ্রি.) ৪টি পুথি রয়েছে।

❑ এসিয়াটিক সোসাইটিতে রয়েছে। পুথি সংখ্যা গ ৩৭২৮। পুথির মাপ ১১.৫"×৪"।

❑ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রয়েছে পুথি সংখ্যা-২৩৭৬। পুথির মাপ ১৫"×৫"।

❑ এসিয়াটিক সোসাইটিতে রয়েছে। পুথি সংখ্যা গ ৫৬৭৩। পুঁথির মাপ ১৩"×৪½"।

❑ শান্তিনিকেতন পুঁথিশালায় রয়েছে। পুথি সংখ্যা-২৫৮। পুথির মাপ ১৩.৫"×৫" ইঞ্চি।

ষষ্ঠী মঙ্গল (১৬৭৯ খ্রিঃ)

❑ এসিয়াটিক সোসাইটিতে রয়েছে। পুথি সংখ্যা-গ ৫৬৭৪। পুথির মাপ-

রায়মঙ্গল

বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। পুথি সংখ্যা-১৭৯৮। পুথির মাপ-১৪"×৫" ইঞ্চি।

শীতলা মঙ্গল

❑ এসিয়াটিক সোসাইটিতে রয়েছে। পুথি সংখ্যা-গ ৫৬৭৫। পুথির মাপ ১৩"×৪½" ইঞ্চি।

কমলা মঙ্গল

❑ বর্ধমান সাহিত্য সভায় রক্ষিত আছে। পুথির মাপ ১৪"×৫"।

'কালিকামঙ্গল' কাব্যে হেঁয়ালিতে গ্রন্থ রচনার সময় দেওয়া রয়েছে—

'সারসাসানের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ সকল বিচারিয়া সভে।।৬৭
বলে কৃষ্ণরাম কবি ভকতবৎসলা দেবী
ধরাধর রাজার নন্দিনী।
ভবসিন্ধু ঘোর অতি তোমা বিনে, নাই গতি
পার কর পতিত পাবনী।।৬৮

ভীম মহাদেবের একটি নাম। তাঁর তিন অক্ষি অর্থাৎ চোখ। মিত্র অর্থাৎ দ্বাদশ সূর্য হতে তিন বাদ গেলে 'নয়'। সারসাসান অর্থাৎ ব্রহ্মার নেত্র সংখ্যা 'আট'। ঋষির অর্থাৎ সাত হতে পক্ষ অর্থাৎ দুই ত্যাগ করলে অবশিষ্ট থাকে পাঁচ। বিধু অর্থাৎ এক। সুতরাং রাশিগুলি হলো ৮৯৫১। 'অঙ্কস্য বামা গতি' রীতি অনুসারে শশাঙ্ক হয় ১৫৮৯। এর সঙ্গে ৭৮ করলে ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। সুতরাং 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল হল ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

এক মনে কবি 'কালিকাগীত' বা 'কালিকামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন—

নিমতা গ্রামেতে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়েস্থ কুলেতে উৎপত্তি।

হইয়া যে একচিত   রচিত কালিকাগীত
কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি।।৪৩৫

কবির 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের একটি পুথি ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সুতানুটিতে ব্রজবল্লভ বাবুজীর জন্য তৈরি করা হয়েছিল। পুষ্পিকায় লিপিকর 'ইতি সমাপ্ত।।' লিখে পরে জানিয়েছেন—

"এই পুস্তক শ্রীযুত ব্রজবল্লভ বাবুজির ইহা জানিবা। স্বাক্ষর শ্রীআত্মারাম ঘোষ কায়েস্থ সাং কলিকাতা, সুতানুটি চড়কডাঙ্গার পশ্চিম। ইতি সন ১১৫৯ সাল মহা শ্রাবণ ২৭ রোজ শুক্রবার দিবসে সাঙ্গ হইল। ইহার দক্ষিণা এক জোড় কাপড় তার দুই তঙ্কা আড়কাট।।"

'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যের রচনায় হেয়ালিতে কবি বলেছেন—

কবি কৃষ্ণরাম বলে ষষ্ঠীর মঙ্গল।
মহীশূন্য ঋতুচন্দ্র শক সাংবৎসর।।

অর্থাৎ ১৬০১ শকাব্দ বা ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে।

'রায়মঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল—

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র সাকের বৎসর।। ৪২

অর্থাৎ ১৬০৮ শকাব্দ বা ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

'কালিকামঙ্গল' কাব্যে কবি 'বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি' বলে উল্লেখ করেছেন, ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে কবির বয়স কুড়ি, সুতরাং তাঁর জন্মসন ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ। ৩৬ বছর বয়সে তিনি 'রায়মঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন।

কবির সবগুলি কাব্যই জনপ্রিয় হয়েছিল বলে মনে করা যায়, কারণ 'ষষ্ঠীমঙ্গল' রচনা কালে কবি লিখেছেন—

'কবি কৃষ্ণরাম বলে পাঁচালি সরস।
নাএকের সংপদ বাড়ায় আর যশ।।৫৯'

কবির 'সরস' পাঁচালি নায়েকের সম্পদ এবং যশ দুই-ই বাড়িয়েছিল এই গ্রন্থটি।

'রায়মঙ্গল' কাব্যও 'নায়েকের মনোনীত' পালা—

'কবি কৃষ্ণরাম গায়   ঠাকুর দক্ষিণরায়
নায়েকের মনোনীত পালো।।২২৬

সুতরাং এটা মনে করা যেতে পারে, নায়েকের ইচ্ছানুসারে সাধারণ মানুষের জন্য লৌকিক এমন সব দেবদেবীকে নিয়ে কাব্য লেখা হল, যাদের নিয়ে এর আগে আর কোনো মঙ্গলকাব্য লেখা হয়নি। কবি তাঁর রচনায় কোনো কাব্যকে বলেছেন 'গীত'—

কবি কৃষ্ণরাম বলে শুন গো শীতলা।
রচিলো তোমার গীত যে মতে কহিলা॥৯৭

কোনো কাব্যকে বলেছেন 'মঙ্গল'—

রায়ের মঙ্গল কবি কৃষ্ণরাম গায়।
কেবা কি করিতে পারে শীতলা সহায়॥২৯২

আবার কোনো কাব্যকে বলেছেন 'পাঁচালি'—

সাধু বলে অপরূপ কথা শুন বলি।
কৃষ্ণরাম বিরচিল মধুর পাচালি॥৪৪৮

কলকাতার কবি কৃষ্ণরাম দাস ইংরেজ আগমনের অনেক আগেই কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথা তাঁর কাব্যে প্রকাশ করে সময়কে ধরে রেখেছেন। তাঁর জন্য আমরা পেয়েছি ইংরেজ আগমনের পূর্বেকার নিমতা, কলকাতা, ডিহি কলকাতা এবং কলকাতা পরগনাকে। সাবর্ণ জমিদারদের প্রতি কবির যে শ্রদ্ধা তা আমরা পেয়েছি, আবার ইংরেজরা শঠতায় কলকাতাকে কেনার এবং সাবর্ণ জমিদারদের প্রতি ব্যবহারও আমরা পেয়েছি। কলকাতার নব মূল্যায়নের ইতিহাসে কবি কৃষ্ণরাম দাসের রচনা নতুন পথ দেখাবে।

পুরানো তথ্যে পূর্ব কলকাতা

বন্দর কুচিনান-বেলেঘাটার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গঙ্গা-বিদ্যাধরীর মিলিত স্রোত ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে জলের নীচে মাটির স্তর উপরের দিকে উঠে যাওয়ায় স্রোত-প্রবাহ ধীর গতি হয়ে পড়ে। নদী পথে নৌকো যাতায়াতের সহজ পথ হারিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় বহু দিনের বাণিজ্য কেন্দ্রটি। পরে নতুন খাল কেটে, পুরনো খাল সংস্কার করে পুরনো জলপথকে সচল করার চেষ্টা হয়েছে বারবার। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে খাল সংক্রান্ত কয়েকটি সংবাদ এখানে সংকলন করে দেওয়া হলো—

নূতন খাল

অনেক কালাবধি কলিকাতায় যে খালকাটনের কল্পনা হইয়াছিল এক্ষণে তাহার আরম্ভ হইয়াছে সেই খাল চিতপুরের উত্তর ভাগহইতে বালিয়াঘাটার খালপর্য্যন্ত যাইবে তাহা আটার হস্ত গভীর ও আশী হাত চৌড়া এবং তাহার উভয়দিগে চল্লিশ হাত চৌড়া রাস্তা হইবে রাজা রামলোচনের রাস্তার নিকটে দুই তিন হাজার লোক সে খাল কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং অনুমান হয় যে এ বৎসরে তাহার অর্দ্ধেক কাটা যাইবে এবং তাহার উপরে দুই অথবা তিন লৌহের সাঁকো বসান যাইবে ইহাতে সেই অঞ্চলের অতিশয় উপকার হইবে তাহাতে মৃত্যুজনক যে ক্ষুদ্র বন ও বৃক্ষ আছে তাহা একেবারে পরিষ্কৃত হইবে ও ঐ স্থান হইতে সকল মাল একেবারে নদীতে পঁহুছিতে পারিবে।

এই খাল কাটনের কল্প ইহার পূর্ব্বে তেরিটি সাহেবকর্তৃক হইয়াছিল তিনি সেই কর্ম্মের পরামর্শ শ্রীযুত লার্ড উএল্লেসলি সাহেবকে দিয়াছিলেন কিন্তু সে সময়ে তাহা সিদ্ধ হইল না তাহার পর মেজর সক সাহেব ঐ খালেব এক নক্সা করেন কিন্তু তিনি সেই কর্ম্ম সিদ্ধ না করিতে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে একটা গোলার দ্বারা মারা পড়িলেন। ঐ মেজর সক সাহেব এই সকল বিষয়ে যেমন বিজ্ঞ ছিলেন তত্তুল্য অন্য কোন সাহেব নাই কলিকাতা শহরের যে নক্সা এখন কলিকাতায় সকল লোকের ঘরে দেখা যায় তাহা মেজর সক সাহেব করেন তিনি কলিকাতা নগরের উপকারকরণে অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সাঙ্গকরণের পূর্ব্বে অকালে তিনি লোকান্তর গত হইলেন।

আমরা আরো শুনিতেছি যে ইটালি ও শিয়ালদহ ও বালিগঞ্জের নিকটে অনেক বড় ২ পুষ্করিণী কাটাইয়া মৃত্যুজনক অনেক ক্ষুদ্র ২ ডোবা পূর্ণ করিতে শ্রীযুত লার্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেব নিশ্চয় করিয়াছেন এবং সেই কর্ম্মের নিমিত্তে নিকটস্থ জিলাহইতে বন্দুয়ানেরদিগকে আনিতে হুকুম করিয়াছেন সেই অঞ্চল যেমথ সাঙ্ঘাতিক তেমন কলিকাতার অন্য কোন অঞ্চল নয় বিশেষতঃ ওলাউঠা কলিকাতার মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই স্থানে অবিস্থিতি করে। ১৮২৫ সালে অধিক লোক আপনারদের পরিজন লইয়া সেখানে আইল এবং সেখানে আপনারদের কুটীর তুলিল কিন্তু সেখানে এমত ওলাউঠার প্রাবল্য হইল যে মৃত ব্যক্তিবাহক গাড়ি সেখানে গিয়া পূর্ণ হইয়া প্রতিদিন ফিরিয়া আসিত এই সকল উপকারের উদ্যোগ যখন সিদ্ধ হইবে

তখন সকলেই অনুমান করিবেন যে সেই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যতা নিবৃত্ত হইয়াছে যেহেতুক অতিনিবিড় বন ও পাতাপচা জল প্রভৃতিতে লোকেরদের পীড়া জন্মে কিন্তু এইমত সাঙ্ঘাতিক স্থান যদি একবার খোলাসা হয় তবে তাহাতে পীড়ার নামও থাকে না।

— সমাচার দর্পণ

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮২৯/১১ ফাল্গুন ১২৩৫

নতুন খাল

সংপ্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের রাজপথের শোভা করিবার জন্য মোকাম পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া পুরাতন বেল্যাঘাটা পর্য্যন্ত যাইয়া মিলিবে শুনিতে পাই যে ঐ খাল নূতন বেল্যাঘাটা দিয়া অনায়াসে যাইতে পারিবেক যাহা হউক বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকেরদের অনেক উপকার জন্মিতে পারিবেক যেহেতুক অতিশীঘ্র এক স্থানহইতে অন্য স্থানে পঁহুছিবে এবং পূর্ব্ব অঞ্চলে নৌকারোহণে অতিসুখে যাতায়াত করিতে পারিবেক কিন্তু কোন ২ স্থানে ইহার আড্ডা হইবেক এ বিষয় নিশ্চয় হয় নাই কেবল খাল প্রস্তুত হইয়া এক্ষণে দুই পার্শ্বে রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে।

— সমাচার দর্পণ

৩০মে ১৮২৯/১৮ জ্যেষ্ঠ ১২৩৫

নতুন খাল

আমরা অতিসন্তোষপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে কলিকাতার পূর্ব্বদিগে যে সকল উপকারক কর্ম্ম হইতেছিল তাহা অনেক প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ ঐ খাল ভাগীরথী নদী অবধি **সরকিউলার রোড** ঘুরিয়া লোণা জলের যে স্থানে নৌকার গমনাগমন হইতে পারে সেই স্থানে মিলিবে। গত বৎসরের এমন সময়ে তাহার কিছু অনুষ্ঠানও হয় নাই কিন্তু এখন তাহা প্রায় **ইটালি পর্য্যন্ত** কাটা হইয়াছে এবং দুই সাঁকো প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে ও তাহার লৌহের কিঞ্চিৎ ভাগ গাঁথা গিয়াছে লোণাজলের অন্তরে খালের ১৫ ক্রোশপর্য্যন্ত পরিষ্কার করা গিয়াছে এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও পরোপকারক সরকারী কর্ম্মকারক মৃত মেজর সক সাহেব এই যে সকল কর্ম্মের নক্সা করিয়াছিলেন তাহা সমাপ্তকরণের অত্যল্প বাকী আছে। এই খাল কাটনের তাৎপর্য্য এই যে উত্তরপ্রদেশেজাত দ্রব্যাদি পূর্ব্ববৎ ঘুরিয়া না আসিয়া সহজ ও সুগম পথ দিয়া কলিকাতায় আইসে প্রাচীন পথ দিয়া আগমনে অনেক সঙ্কট ছিল এবং অনেক ক্ষতি হইত। এই খাল পূর্ব্বদিকে **হাসিনাবাদের** অভিমুখে যাইতেছে এবং সেই স্থানপর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। উত্তরকালে জলপথগন্তারা বক্র ও পীড়াজনক সুন্দরবন দিয়া কএক দিবসপর্য্যন্ত গমন না করিয়া উত্তম কৃষিযুক্ত দেশ দিয়া আগমন করিতে পারিবেন।

— সমাচার দর্পণ

২ জানুয়ারি, ১৮৩০/২০ পৌষ ১২৩৬

করস্থাপন

কলিকাতা এবং তৎউত্তরোত্তরাঞ্চলহইতে জলপথে **তমলক ক্ষীরপাই ঘাটাল রাধানগর** এবং **মেদিনীপুর** প্রভৃতি স্থানসকলে যাইতে হইলে **উলুবেড়িয়ার** বাসপাতির খাল অথবা **তেমোয়ানি** প্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়া যাইতে হইত কিন্তু বাসপাতির খালে বর্ষা ভিন্ন অন্য কএক মাস বারির সমূহ অপ্রতুল হইত সুতরাং অগ্রহায়ণাবধি প্রায় আষাঢ়পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পথ হইয়া যাইবার ঘটনা হইত কিন্তু তৎঘটনায় লোকসকলে অত্যন্ত ভীত হইতেন যেহেতুক তাহাতে বিষম সাহসাপেক্ষা করে তদ্ভিন্ন বিলম্বেরও সম্ভাবনা এই সকল অনুসারে নিবারণকরণে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর **উলুবেড়েহইতে** মহেশডাঙ্গাপর্য্যন্ত এক খাল খনন করিয়াছেন প্রায় বৎসরাবধি নৌকাদি তাহাতে গমনাগমন করিতেছে সংপ্রতি রাজকর্ম্ম সম্পাদককর্তৃক এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছে যে সেই খাল হইয়া নৌকাদি গমনাগমন করিলে নৌকাতে দাঁড় থাকিবেক প্রত্যক দণ্ডে দুইআনা পরিমাণে কর লইবেন এই কর্ম্মনির্ব্বাহ জন্য তথায় কএকজন আমলা নিযুক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে করগ্রহণ করিতেছে।

— *সমাচার দর্পণ*
২ জানুয়ারি ১৮৩০/২০ পৌষ ১২৩৬

এতন্নগরের শোভা

এতন্নগর শোভাকরণহেতুক রাজকীয় লোকেরা নানা প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন বিশেষতঃ শুনা গেল যে এই কলিকাতার পূর্ব্বদিকে এক খাল **চিতপুরের** উত্তরদিগ-দিয়া **বেলিয়াঘাটার** খালের সহিত মিলিত হইবেক ইহার গহেরা ২৭ফুট এবং চৌড়া ১২০ ফুট হইবেক এই খালের দুই ধারে ৬০ ফুট চৌড়া রাস্তা হইবেক রাজা রামলোচনের পথের নিকট ক'এক হাজার লোক এই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং আর শুনা গেল যে অর্দ্ধেক খাল ও দুই তিনটা লোহার সেতু অর্থাৎ সাঁকো এই বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইবেক এবং নিকটবর্ত্তি আগাছা সকল ছেদন করা যাইবেক এবং ঐ খালের মৃত্তিকা সকলেতে খানা খন্দকপ্রভৃতি নানা নামাল জায়গা উচ্চ করা যাইবেক এবং ঐ খাল এমত গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইবেক যে তাহার দ্বারা জুয়ার ভাটা খেলিবে শুনা গিয়াছে যে লার্ড ওএলিসলির আমলে এইরূপ ব্যাপার হইবার উদ্যোগের কল্পনা হইয়াছিল কিন্তু শেষ হয় নাই তদনন্তর আরো শুনা গেল মোং **ইটালি** ও **শিয়ালদহ** ও বালিগঞ্জের মধ্যে অনেক পুষ্করিণী ও চৌড়া রাস্তা সকল প্রস্তুত করিতে গবরনরমেণ্টের মনস্থ হইয়াছে এবং পথের ধারে ও নরদমার উপরে যে সকল বৃক্ষ পড়িয়াছে তাহা ছেদন করিতে আরম্ভ হইয়াছে।

—*সমাচার দর্পণ*
১৪ মার্চ ১৮২৯/২ চৈত্র ১২৩৫

শুড়া লিথোগ্রেফিক প্রেষ। অর্থাৎ শুড়ায় পাতুরিয়া ছাপাখানা।

এই পাষাণযন্ত্রের অধ্যক্ষ তাহাতে নানাবিধ গ্রন্থ ও নানাপ্রকার প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ ছবি ছাপা করিবেন সম্প্রতি তিন কর্ম্মারম্ভ হইয়াছে।

অপূর্ব্ব এক যন্ত্র স্থির করিয়া লিখিয়াছেন যাহাতে ইঙ্গরেজী ১৬০০ সাল অবধি ১৯৯৯ সন পর্যন্ত ৩৯৯ বৎসরের দিবস স্থির হইতে পারিবেক এই অপূর্ব এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ২ টাকা মাত্র স্থির করিয়াছেন।

অপর চিত্রবিদ্যাবিষয়ক যাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য বিশেষতঃ এতদ্দেশে শ্রীশ্রী৺প্রতিমার প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিতে ও গৃহে রাখিতে সকলেরি অভিলাষ হয় কিন্তু চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন উপায় এদেশে না থাকাতে অনেকের তাহাতে মনোযোগ নাই এবং পটুয়া আদি যাহারা জানে তাহারাও উত্তমরূপে পারে না এপ্রযুক্ত চিত্রবিদ্যা সর্ব্বজন শিক্ষার নিমিত্ত ইঙ্গরেজি উত্তম চিত্রাভিজ্ঞ সকলের মত গৌড়ীয় ভাষায় সঙ্কলন করিয়া ও চিত্র আদর্শ নিমিত্ত মনুষ্য ও পশ্বাদির ছবি ১৫ খান পরিমাণ বিশেষ করিয়া এক গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে ঐ গ্রন্থ শুড়া পাষাণযন্ত্রে মুদ্রিত হইবেক তাহার মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির করিয়াছেন।

এ দেশে অক্ষর লিখিবার তাহার কোন গ্রন্থ নাই এজন্য শুড়া পাষাণযন্ত্রণাধ্যক্ষ অতিসুন্দর বড় অক্ষরে স্বর ও ব্যঞ্জন এবং যুক্তাক্ষর এবং বর্ণসকলের উচ্চারণের স্থান বিশেষ করিয়া অক্ষর লেখা শিক্ষাকরণোপযোগী এক গ্রন্থ পাষাণযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।—সং চং।

—*সমাচার দর্পণ*

২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯/১৩ পৌষ ১২৩৬

কাঠুরিয়া ধর্মঘট ও বেলেঘাটা

গোটা কলকাতার রান্নার কাট একসময় জোগান দেওয়া হতো বেলেঘাটা থেকে। দক্ষিণের সুন্দরবন থেকে সুন্দরী কাঠ নৌকো বোঝাই করে বেলেঘাটার বন্দরে আসতো, আরো দুটি জ্বালানী সুন্দরী কাঠের বাজার বা আড়ত ছিল—তার একটি খিদিরপুরে অন্যটি শালকিয়াতে। জ্বালানী হিসেবে সুন্দরী কাঠেরই প্রচলন ছিল, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে গ্যাসের প্রচলন শুরু হলে রান্নার কাজে পাইপলাইনের গ্যাস ব্যবহার হতো তবে তা শুধুমাত্র নববাবুদের জন্য —যাঁদের ট্যাকে জোর ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রান্নাঘরের নূতন যুগ কয়লার যুগ। এই কয়লার কথায় শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন—"ইংরেজী ১৮৭৫ বা ৭৬ সালে গ্যাস ঘরে পাথুরে কয়লার চলন হলো এবং লোকের বাড়িতে গাড়ি করে বিনামূল্যে দিতো। কিন্তু উনোন কেমন করে জ্বালানো হবে তা জানা ছিল না। অনেক কষ্ট, কল্পনা করে লোহার সিক দিয়ে উনোন হলো। ক্রমে কয়লার এক আনা করে মন হলো এবং সাধারণে প্রচলন হলো, কিন্তু এখন জ্বালাবার সুঁদুরীকাঠ (ইন্ধন) প্রায় লোপ পেয়ে গেছে।"[১]

এহলো রান্নাঘরের কয়লা যুগ। কিন্তু কাঠের যুগে বেলেঘাটায় কেমন জ্বালানী কাঠের ব্যবসা হতো, এখন তা উপলব্ধি করা কঠিন। কাঠের যুগে কাঠ চেরার দুটি পর্ব ছিল। সেকথা শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকেই শোনা যাক—"আমাদের ছেলেবেলায় বাড়িতে কাঠের জ্বালে রান্না হতো। [বেলেঘাটা] খালধার থেকে গাড়ি করে সুঁদুরীকাঠ আসতো এবং তিনজন উড়ে কাঠুরিয়া এসে বড় বড় কুড়ুল দিয়ে চেলা করে দিতো। সেই চেলাকাঠগুলি চৌকো করে মাঝখানে ফাঁক চেরী করতো। এই ভাবে কাঠ শুকিয়ে গেলে তুলে রাখা হতো। সকালে রাঁধার সময় চাকররা সেই সব কাঠ সরু চেলা করে দিত এবং তাতে উনোন ধরানো হতো।"[১]

সেই সময় ঘাড়ে করে কুড়োল নিয়ে 'কাঠ কাটাবে' বলে আওয়াজ বা ডাক দিয়ে যেতো। এই কাজে উড়িয্যার লোকই বেশী যুক্ত ছিল। মজুরী কত পেত? এর উল্লেখ পাই ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ৩০ ডিসেম্বর তারিখে 'সমাজ ভাস্কর' পত্রিকায়—"কলিকাতা নগরে প্রায় সকল বাড়িতেই সুন্দরীকাষ্ঠের কুন্দা সকল আসিয়া থাকে, উড়িয্যার দেশীয় মজুর লোক যাহারা বড়ং কুড়াল ঘাড়ে করিয়া বেড়ায় তাহারাই সুন্দরী কুন্দা চিরিয়া দিয়া যায়, পূর্ব্বে এক গো গাড়িতে ২০ মোন সুন্দরী কুন্দা আসিত, ঐ সকল মজুরের ছয় আনা বেতনে ঐ বিশ মোন কাঠ চিরিয়া দিয়া যাইত।"

১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় পালকি ধর্মঘট দিয়ে ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের শুরু। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, বেলেঘাটা, খিদিরপুর ও শালখিয়ার সুন্দরী কাঠ চেরাইয়ের কাঠুরিয়াগণ একত্রে মিলিত হয়ে এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয় যে, ছয় আনা নয়—এক গাড়ির জন্য তাদের দাবী বার আনা। পাঁচ দিনের ধর্মঘটে কি অবস্থা হয়েছিল, 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সাংবাদিকের লেখনী থেকেই তা জানা যাক—"কলিকাতা, বালিয়াঘাটা, খিদিরপুর শালিখাদি স্থানীয় কাষ্ঠ চেরা উড়ো সকল এক সভা করিয়া ছিল, তাহাতে প্রতিজ্ঞা করিল ছয় আনা পয়সায় এক গাড়ী কাষ্ঠ চেরে এইক্ষণে ছয় আনা স্থানে বারো আনা না পাইলে পূর্ব্বহারে কাষ্ঠ চিরিবেক না, এই সভার পর পাঁচ দিবস কলিকাতায় কাষ্ঠ চেরে নাই তাহাতে কাষ্ঠাভাবে সর্ব্ব সাধারণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল এইক্ষণে নগর বাসীরা ছয় আনা স্থানে নয় আনা দিয়া

---

১ কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা পৃ. ৩ ২ সম্বাদ ভাস্কর ৩০ ডিসেম্বর ১৮৫৬

এক ২ গাড়ী কাষ্ঠ চেরাইতেছেন, নয় আনাতেও সকলে স্বীকার করে না, অনেকে ছয় আনা স্থানে বারো আনাও লইতছে অতএব ঐক্য বাক্যের কি গুণ এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকেরা বিবেচনা করুন"[১]

কাঠুরিয়া-ধর্মঘটে বেলেঘাটার কাঠুরিয়াগণ যোগদান করেছিল। আজ ভাবতে অবাক লাগে, সেকালে কোন রাজনৈতিক দল শ্রমিকদের সংগঠিত করে নি, তাহলে কোন মন্ত্রে, কি ভাবে এতগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষকে একত্রিত করে কাজ বন্ধ করলো। এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে 'ধর্মঘট' শব্দের মধ্যেই। ধর্মঘট শব্দের অর্থ হলো ধর্মকে সাক্ষী রেখে স্থাপিত জলভরা ঘট। গোষ্ঠীবদ্ধ জাতি সম্প্রদায়ের (যেমন স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়) প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিজের জাতির প্রতিনিধিদের ডেকে নির্দিষ্ট দেবস্থানে সভা করে জাতিগত বা ব্যক্তিগত অভিযোগ ব্যক্ত করতেন। এই সভায় ধর্মের নামে একটি জলপূর্ণ ঘট আম্রপল্লব দিয়ে, ঘটের গায়ে তেল সিঁদুরে আঁকা চক্র স্থাপন করে পুরোহিত দিয়ে ধর্মরাজকে আবাহন ও পূজো করে সকলকে প্রসাদ খাইয়ে ঘটের সামনে রাখা পান-সুপারি-কাঁচা হলুদ খণ্ড হাতে নিয়ে ঘট স্পর্শ করে শপথ করাতেন। শপথ বাক্যে বলতেন—'আমি অদ্যকার 'ঘোঁট' অনুসারে, মাতব্বরদের মত এবং সকলের মতে আমিও অমুক ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আমরা আমাদের শিল্প-জাত সামগ্রী যোগাব না বা তার বা তাদের জন্য কোন কাজ করবো না। আজ ধর্মরাজের পান-সুপারি গ্রহণ করলাম, আদেশ, নির্দেশ কোনটাই অমান্য করবো না, এবং আমার গ্রামের সকলকে হুকুম মতো কাজ করতে বাধ্য করবো।' এই শপথ বাক্যেই কাজ বন্ধ হয়ে গেল—এই ধর্মঘটই সকলকে সাহস এবং ভরসা জুগিয়ে ছিল সকলকে একতাবদ্ধ হতে প্রতিবাদী হতে। সেই ধর্মঘটেই বেলেঘাটার কাঠুরিয়ারা আদায় করে নিয়ে ছিল তাদের ন্যায্য পাওনা।

এর আগে একবার গরুর গাড়ির চালকেরা ধর্মঘট করে নারকেলডাঙ্গা সহ পূর্বকলকাতার বাণিজকেন্দ্রকে অচল করে দিয়ে গোটা কলকাতার সুন্দরী কাঠ যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন তারিখের 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকায় ঐ সংবাদ জানিয়ে লেখা হয়েছিল—

"বিধি নির্ব্বন্ধ হইয়াছে কলিকাতা নগরীয়র গাড়িঘোড়া প্রভৃতির হইবে, ইহাতে গোশকট বাহকেরা ঐক্যবাক্য হইয়া গত সোমবারাবধি তাহাদিগের গাড়ি চলায়ন বন্ধ করিয়াছে তাহাতে নগরবাসিদিগের বিশেষতঃ, বণিকগণের অনেক ক্ষতি হইতেছে বণিকেরা দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী করিতে পারে না, এবং আমরা গত বৃহস্পতিবারে নারিকেলডাঙ্গার গোলা হইতে সুন্দরী কাষ্ঠ আনয়নার্থ লোক পাঠাইয়া ছিলাম আমার দিগের লোকেরা গোশকটাভাবে কাষ্ঠ আনয়ন করিতে পারে নাই এবং মুটেরাও গাড়য়ানদিগের সহিত যোগ দিয়াছে, গাড়ওয়ান ও মুটে পাঁচ ছয় সহস্র লোক একত্রিত হইয়া ডেপুটি গবর্নর বাহাদুরেব নিকট প্রার্থনা করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি টাক্স ক্ষমা হয় কিন্তু উক্ত মহাশয় সাহেব তাহারদিগকে উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, উড়ে বেহারা, রোমানি বেহারা, গরু গাড়োয়ান ইত্যাদি নীচ লোকেরা ঐক্য বাক্য আছে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহা দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা লজ্জা জ্ঞান করেন না, আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া কি গাড়ি ঘোড়া পরিত্যাগ করিতে পারি না, এদেশে যখন গাড়ি ঘোড়া ছিল না, তখন কি যানবাহন দ্বারা মান্য লোকদিগের কর্ম্ম চলে নাই, সম্ভ্রান্ত লোকেরা গাড়ি ঘোড়ার কর নিবারণ করিতে পারিলেন না এইক্ষণে গাড়য়ানদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

---

১ ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাস পৃ. ৫-৬ বাসুদেব মোশেল

সামাজিক আন্দোলনে শুঁড়া

হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর ছাত্ররা একদিন সমাজ-বন্ধন শিথিল করার আন্দোলনে নেমে ছিলেন। এই আন্দোলনে পূর্ব কলকাতা বেলেঘাটা শুঁড়া গ্রামের একটি ছেলে সেকালের সংবাদপত্রের শিরোনামে এসেছিলেন—'জ্ঞাত হওয়া গেল যে হিন্দু কালেজের একজন ছাত্র মুসলমান রুটিওয়ালার দোকানের নিকট দিয়া গমন করত ঐ দোকান ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক এক বিস্কুট ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন।'—এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়। সংবাদটি পড়ে আজকের মানুষের মনে তেমন কোনো সাড়া জাগবে না। কিন্তু পৌনে দুশ বছর আগে এই ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গোটা হিন্দু সমাজে এক বিরাট আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই সমাজের উপরতলার মানুষ সেদিন উদারপন্থী ডিরোজিওর মন্ত্রশিষ্যদের নিষিদ্ধ খাবার খাওয়াকে ভাল চোখে দেখেননি। সে সময় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ঐ ঘটনার কথা প্রথম তীব্র ভাষায় প্রকাশ করা হয়। 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকা আবার ঐ সংবাদের প্রতিবাদ ছাপেন। বাদ-প্রতিবাদের ভাষা শিষ্টাচার ছাড়িয়ে গেলে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন, 'চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় প্রথমে এই বিষয় সকল লোকের কর্ণের অতিথি করান এবং কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সুতরাং তদ্বিষয়ের বিরুদ্ধে কল্পাবলম্বী হইলে যে কাব্যরত্ন ঐ রত্নাকর হইতে উত্থিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ করণ ফলাবহ নহে।' (১৩ মার্চ ১৮৩০)।

'সমাচার চন্দ্রিকা' বা 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার ঐ সময়ের কোনো ফাইল পাওয়া যায়নি বলে নিষিদ্ধ খাবার খাওয়ার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে রাজনারায়ণ বসু তাঁর বিখ্যাত 'সেকাল আর একাল' বইতে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবকশিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য্য।.....একবার তাঁহাদের মন্ত্রণা হইল, মুসলমানের দোকানের বিস্কুট খেতে হবে। কয়েকদিন মন্ত্রণাই হয়, কাজে কেহ অগ্রসর হইতে পারেন না। একদিন, অদ্য এই কার্য্য সমাধা করিতেই হইবে, এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মুসলমানদের দোকানের সম্মুখে আইলেন, কিন্তু তাহার ভিতর প্রবেশ না করিয়া পথের উপরে সকলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এগিয়ে গিয়ে বিস্কুট কিনিয়া লইয়া আইসেন, তাহা কাহারও সাহস হয় না। শেষে একজন অপেক্ষাকৃত অধিক সাহসী পুরুষ এগুলেন। কিন্তু তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল। আস্তে আস্তে দোকানের ভিতরে গিয়া বিস্কুট নিয়ে যেমন তিনি বেরুলেন, অমনি তাঁহার সঙ্গিগণ তিন বার গগণভেদী স্বরে Hip! Hip! Hurrah! বলিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ঐ কাজকে কুসংস্কারের উপর অসামান্য জয় মনে করিয়া এইরূপ করিয়াছিলেন।'

যে সাহসী যুবক যবন-রুটি কিনে এনে খেয়েছিলেন তাঁর নাম পাওয়া যায় না, তবে তাঁর বাড়ি শুঁড়া অঞ্চলে ছিল, কারণ 'সমাচার চন্দ্রিকা'র লেখক এমন দাবিই করেছিলেন। 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রে 'কস্যচিৎ শুড়া নিবাসিনঃ' জানিয়েছেন, 'কএক দিবস হইল চন্দ্রিকাপত্রে কোন হিন্দুকালেজের ছাত্রের জবন নির্ম্মিত রুটী খাওনের বিষয় যাহা প্রকাশ হইয়াছিল তাহার

যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিখিতেছি যে বালকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রিকাকার লিখিয়াছিলেন তেঁহ অস্মদাদির আত্মীয় হয়েন।'

যবন-রুটি ভক্ষণে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সমাজপতিরা ছেলেদের দোষ ধরলেও, উদারপন্থী কেউ-কেউ তাঁদের স্বাধীন মত সংবাদপত্রে প্রকাশ করে যবন-রুটি ভক্ষণ দোষের নয় বলে জানিয়েছেন। সেকালের মিশনারি পরিচালিত বিখ্যাত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাও ছেলেদের দোষ ধরেননি। সংবাদের অভাবেই চন্দ্রিকা ও কৌমুদী ক্ষুদ্র ঘটনা নিয়ে ঝগড়া শুরু করেছেন বলে 'দর্পণ' মন্তব্য করেন, 'আবশ্যক সম্বাদের অভাবে যে এক ক্ষুদ্র ঘটনাতে চন্দিকাকার ও কৌমুদীকারের মধ্যে বৃহদঘটনাঘটিত দুই কাব্য উত্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম।'

'সমাচার দর্পণে' যে কিঞ্চিৎ ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল আমরা তা দিয়েই এই লেখা শুরু করেছি। একবাক্যে তখন অনেকেই একে ক্ষুদ্র ঘটনা বলে মন্তব্য করলেও ঐ ঘটনা থেকেই সত্যিকারের সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু তাই ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেছেন, 'উপরে বর্ণিত আচরণ দ্বারা ডিরোজিওর ছাত্রেরা জাতির বন্ধন শিথিল করেন।' তিনি অন্যত্র একই কথা বলেছেন, 'হিন্দুকালেজের প্রথম ছাত্রদিগের মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া জাতির বন্ধন শিথিল করিয়া ঐ বিষয়ে বর্তমান সামাজিক পরিবর্তন অনেক পরিমাণে প্রবর্তিত করিয়াছে।'

যে ছেলেটি নিষিদ্ধ খাবার খেয়েছিলেন, সমাজপতিরা তাঁকে কি শাস্তি দিয়েছিলেন জানা যায় না। তবে শুঁড়া নিবাসী পত্রে অনুমান করেছেন, 'যদি কেহ ধর্ম্মসভায় চাঁদার স্বাক্ষর কিম্বা তৎবিষয়ের সহকারকরণ হেতুশুচি হয় তবে অভিপ্রায় করি এক্ষণে লোকে যত রুটি ভক্ষণ করুক কিন্তু চাঁদার এক টাকা স্বাক্ষর করিলেই রতা ঠাকুরের সন্তানের ন্যায় মান্য হইবেক।'

সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে ধর্মসভায় চাঁদা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করুক বা না করুক, সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে এই ঘটনার গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘটনাটি পূর্ব কলকাতায় ঘটলেও, গোটা হিন্দু সমাজের গোড়া ধরে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মুচিবাজারের মুচিবাবু

মুচিবাজার, যে বাজারে মুচিরা কেনাবেচা করে অর্থাৎ চামড়া জাতীয় দ্রব্যাদি, উল্টোডাঙ্গার 'মুচিবাজার'—বিখ্যাত বাজার। এই বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সকলের মনে হয়—এটা তো মুচিদের বাজর নয়, তাহলে কোন মুচি কি এই বাজার প্রতিষ্ঠা করেছে? কে এই মুচি, যিনি বাজারটি প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কখনো মনে হয়েছে, এই বাজারের সামনে হয়তো কোন মুচি কাজ করতো—সকলের প্রিয় মুচি মানুষটির জন্যই হয়তো বাজারটি মুচিবাজার নাম পেয়েছে। পরে জানলাম, এই বাজারটি আসল নাম 'রাধাগোবিন্দ জীউর নূতন বাজার।'

এই বাজারটি যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর নাম দীননাথ দাস, প্রতিষ্ঠা সন ১৩২২ সন বা ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ। বাজারটি তৈরি করে তার উন্নতির জন্য দীননাথকে খুব কষ্ট করতে হয়েছিল। বাজার তৈরি হলেও বাজারের কিন্তু লোক এল না। বাজারটিকে জনপ্রিয় করতে দীননাথ বাজারে বারোয়ারী পূজা শুরু করেছিলেন। বারোয়ারি পূজা সম্পর্কে সকলেই জানেন এটা বারো ইয়ারের বা বারো জন বন্ধুর পুজা। এক সময় এই পুজা অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বারোয়ারি পূজো প্রসঙ্গে হুতোম প্যাঁচার নকশায় কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন—'বার জন একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মড়ক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি 'মা' ভক্তিতে শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার, দোকানদার হেটোরাই বারোইয়ারি পূজার প্রধান উদ্যোগী। সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রি ও চালান হয় মন পিছু এক কড়া, দু-কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে। ক্রমে দুই এক বৎসরে দস্তুরি বারোইয়ারী কাতে জমলে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ার গোচের সৌখিন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়, তিনি বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ হন'।

উল্টোডাঙ্গার এই বাজারটিতে দীননাথ দাস জনপ্রিয় বারোয়ারী পূজো শুরু করেন, কিন্তু খরচ সম্পূর্ণটাই করেন দীননাথবাবু নিজে। এই পূজো উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৈষ্ণব গোস্বামী বিদায়েরও ব্যবস্থা করেছিলেন। কলকাতার বহু প্রসিদ্ধ গোস্বামী প্রভুদের সঙ্গে দীননাথের শুধু পরিচয় নয়, অনেকে তাঁর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন উল্টোডাঙ্গা বাজারে বারোয়ারী পূজোর বৈষ্ণব বিদায়ের ব্যবস্থা করা হলো—সেখানে কোন গোস্বামী প্রভুই এলেন না। এই ঘটনায় ভীষণভাবে মনে আঘাত পেলেন দীননাথ দাস।

একটি বাজার হল—সাধারণ মানুষ বাজারে এল না, নিমন্ত্রণ রাখলেন কিন্তু গোস্বামী প্রভুরা কেউ এলেন না,—কেন এমন হলো? কারণ একটাই, দীননাথ দাস একজন নিম্নবর্ণের মানুষ, জাতিতে সে মুচি। মহাপ্রভু বলেছিলেন, একজন চণ্ডাল যদি কৃষ্ণভক্ত হয়, আর মুখে হরিনাম করে তবে সে ব্রাহ্মণের চেয়েও বড় হতে পারে। মহাপ্রভুর পথে গোস্বামী প্রভুরা সকল জাতিকেই শিষ্য করেন, এমনকি বারাঙ্গনাদেরও দীক্ষা দিতে অস্বীকার করেন না, কিন্তু রুইদাসদের তারা দীক্ষা দিতে রাজী হল না। রহিদাসরা 'অধিকারী' বৈষ্ণবদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেও, তাদের গুরুর নাম প্রকাশ করা বারণ ছিল। যাঁর কাছ থেকে দীক্ষা



মুচী বাজারের প্রতিষ্ঠাতা - মুচী দীননাথ দাস

নিয়েছে সে কথা রাষ্ট্র হয়ে গেলে বৈষ্ণব-সমাজে গুরুদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে বলে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। মানুষ মুচিদের এত নীচু ভাবে দেখে বলেই, তাঁর পিতা একদিন একটি মন্দির তৈরী করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। গোস্বামী প্রভুদের এই ব্যবহারে দীননাথের মনে তাঁর কথা মনে পড়ে গেল।

যেমন ভাবা তেমন কাজ, চেষ্টা শুরু হলো, নানান বাধাবিপত্তির মধ্যে ১৩১৫ সনে (১৯০৮ খ্রিঃ) মানিকতলায় ৬৩নং সিমলা রোডে একখন্ড জমি কিনে একটি মন্দির তৈরী করা হলো। মন্দির তৈরী শেষ কিন্তু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা গেল না, কারণ এবার অন্য। মন্দিরের কাছেই একটি মসজিদ। মন্দিরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দিরে শুরু হবে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি, অন্যদিকে মসজিদে শুরু হবে নামাজ পাঠ। তাই নিয়ে হাঙ্গামার আশঙ্কা তৈরী হলো—মন্দির সম্পূর্ণ করা সত্ত্বেও মসজিদের কারণে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা গেল না। দীননাথ হৃদয়ে আবার ব্যথা পেলেন, কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না। যে বাসনাস্রোত একবার হৃদয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে তাকে নামাবে কে? নূতন করে আবার মন্দিরের জন্য জমি দেখা শুরু হলো। খুঁজতে খুঁজতে রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে মন্দিরের জন্য নূতন জমি পাওয়া গেল।

জমি কিনে মন্দিরের কাজ শুরু হলো, একটা কথা আছে শুভ কাজে শতেক বাধা। এই নূতন মন্দিরের শুরুতেই, ১৩২১ সনে দীননাথ আবার ধাক্কা খেলেন, তাঁর মধ্যম পুত্র অদ্বৈতচরণের অকাল মৃত্যু হলো। তিনি পুত্রশোকে কাতর না হয়ে শুধু ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবানের কাছে চোখের জল ফেলে বললেন, 'হে প্রভু, এই দাসানুদাসের সংকল্প সিদ্ধ করে দাও।' অবশেষে মন্দিরের কাজ শেষ হলো। ১৩২২ সনের বৈশাখ মাসে। মন্দির হলো, কিন্তু শ্রীবিগ্রহ! বর্ধমান জেলার দাঁইহাটা গ্রামে শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জীউর শ্রীবিগ্রহ ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত সেখানে মূর্তি তৈরি করতে দেওয়া হলো।

মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ দুই-ই প্রস্তুত, কিন্তু প্রতিষ্ঠা! দীননাথ দাস ভাবলেন প্রতিষ্ঠা করা যাবে তো? এই প্রশ্ন সামনে এসে উপস্থিত হলো—ভয়ে তাঁর বুক কাঁপতে লাগলো। উল্টোডাঙ্গা বাজারের বারোয়ারি পূজোয় গোস্বামী প্রভুদের ব্যবহার তাঁর ভাল লাগেনি। ভয়ের কারণ, সে রুইদাস বংশে জন্মেছে।

বাংলা ১২৪৯সনে (ইং ১৮৪২ খ্রিঃ) বীরভূম জেলার খুজুটীপাড়ার ছাতিম গ্রামে দরিদ্র রুইদাস বংশে দীননাথের জন্ম। তাঁর পিতার রাম মাধবচন্দ্র দাস। ছোটবেলায় গ্রামের ধর্মরাজতলার গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশুনা শুরু করেছিলেন। খুব অল্প বয়স থেকেই দীননাথের হৃদয়ে ভক্তিভাব ছিল, ব্রাহ্মণ দেখলেই হাত জোড় করে প্রণাম করে বলতেন, 'ঠাকুর! আমি ছোট (জাতের) ছেলে, আমার প্রণাম কি গ্রহণ করবেন না? একথা শুনে ব্রাহ্মণরা তাকে আশীর্বাদ করতেন।

বীরভূম জেলায় দীননাথের জন্ম হলেও পৈত্রিক বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার বামন-আড়ার রতনপুর গ্রামে। দীননাথের পিতামহ কৃষ্ণমোহন দাস যানবাহনের অভাবে কাজের জন্য হেঁটে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কলকাতায় সিমলা-কাঁসারিপাড়ায় কাঁসা পিতলের বাসনপত্র

তৈরি করতে চামড়ার জাঁতা বা হাঁপরের প্রয়োজন হতো, কৃষ্ণমোহন এখানে চামড়ার জাঁতা তৈরির ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা মোটামুটি চলছে, হঠাৎ কৃষ্ণমোহনের অকাল মৃত্যু হলে- তাঁর স্ত্রী নিরুপায় হয়ে চার ছেলে, নবকুমার, মাধবচন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর ও হংসেশ্বরকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি রতনপুর ছেড়ে পিত্রালয়ে চলে আসেন। মামাদের সহযোগিতায় চার জনই ছোটখাট কাজকর্ম শুরু করেন, কিন্তু গ্রামে থেকে কিছু হবে না বুঝে চার ভাই যুক্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়—তাঁরা সকলে কলকাতায় চলে আসবে। ১২৬৩ সনে (১৮৫৬ খ্রিঃ) বীরভূম থেকে সকলে পায়ে হেঁটে কলকাতায় চলে আসেন। মাধবচন্দ্রের পুত্র দীননাথ তখন ১৪ বছরের বালক। কলকাতার গোয়াবাগানে তখন রুইদাস সম্প্রদায়ের বাস ছিল। তাঁরা সকলে এসে গোয়াবাগানেই বসবাস শুরু করেন।

সময় কারো হাত ধরে বসে থাকে না, ১২৭২ সনের আশ্বিন মাস, চারিদিকে আগমনীর আনন্দবার্তা ছড়িয়ে পড়েছে—হঠাৎ শুরু হলো বিধ্বংসী ঝড়, সে ঝড় ইতিহাসে 'আশ্বিনের ঝড়' নামে পরিচিত হয়ে আছে। ঐ ঝড়ে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। এই ঝড়ে কলকাতার গঙ্গায় এক চামড়া বোঝাই জাহাজ ডুবে যায়। দীননাথ তাঁর পিতা মাধবচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে জলে ডোবা চামড়া খুব কমদামে কিনে নেয়, পরে ঐ চামড়া বিক্রি করে দীননাথ বহু টাকা লাভ করে। তাঁর ভাগ্য পরিবর্তনের রাস্তা খুলে যায়। এই লাভের টাকার বড় মূলধন নিয়ে দীননাথ আরো বড় ব্যবসায় নামেন এবং ভাল রকমের উন্নতি করেন। নতুন ব্যবসায় যে টাকা লাভ হতো সেই টাকা দিয়ে কৃষ্ণবাগান, উল্টোডাঙ্গা, ধর্মতলা, চোপদার বাগান প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর জমিজমা সম্পত্তি কিনে রাখেন।

উচ্চ শিক্ষা না পেয়েও দীননাথ শুধুমাত্র সৎপথে থেকে ব্যবসায়িক চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ব্যবসায় উন্নতি করার চেষ্টা করতেন। দীননাথ দেখেছেন, এদেশে তখন চামড়ার ট্যানিং বা পরিষ্কার করার কোনও ব্যবস্থা ছিল না, ফলে বিদেশ থেকে আনা ট্যান-করা বা পরিষ্কার চামড়া কিনে জিনিষপত্র তৈরি করতে হতো, ফলে লাভ হতো কম। তাই তিনি প্রথমে মানিকতলার লালাবাগানে চামড়ার ট্যানিংয়ের কারখানা করেন, পরে উল্টোডাঙ্গার দুর্গাপুরে আর একটি কারখানা করেছিলেন। এই সময় ইন্ডিয়া গবর্নমেন্টের প্রিন্টিং স্টেশনারী ও স্ট্যাম্প অফিসে বই বাঁধাইয়ের জন্য চামড়ার দরকার হত। দীননাথ নিজের কারখানায় ঐ প্রয়োজনের চামড়া তৈরি করে ঐ অফিসে ৬০ বছর ধরে সরবরাহ করেছিলেন।

নিজের ব্যবসা-বিষয়টিকে নানা দিকে ছড়িয়ে কাজের পরিধি বাড়িয়ে নিতে চেয়েছিলেন দীননাথ দাস। তখন কলকাতার গঙ্গার জলে গরু মহিষ ও অন্যান্য পশুর মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হতো। এই মরা দেহগুলি নদী থেকে তুলে গঙ্গা পরিষ্কার রাখার জন্য সরকারের কাছ থেকে ইজারা নেন দীননাথ। এই মরা পশুর চামড়া ছাড়িয়ে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য ঐ কাজে বেশ কিছু হিন্দুস্থানী চর্মকার নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই ইজারা দীননাথ একচেটিয়া করে রেখেছিলেন। এইভাবে তিনি বহু অর্থ উপার্জনের সুযোগ তৈরি করে নিয়েছিলেন।

দীননাথের বুদ্ধিতে ব্যবসা চলত সব ছিল একান্নবর্তী সংসারে। ব্যবসায়ে উন্নতির সঙ্গে

সঙ্গে দীননাথ, সংসারে সকল ভাইয়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন। ১২৭৪ সনে বিডন স্ট্রীট রাস্তাটি নতুন তৈরি হচ্ছে, দীননাথ সেখানে একখণ্ড জমি কিনে সেখানে পাকা বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। ১২৯৩ সনের ৯ শ্রাবণ পিতা মাধবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর দীননাথ দেখলেন ছোটভাই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন শুরু করেছে। প্রচুর টাকা পয়সা নষ্ট করেছে। ব্যবসার কাজকর্ম না দেখে বেপরোয়া জীবন-যাপন করতে গিয়ে নারায়ণ দাস অল্প সময়ের মধ্যে ৫০/৬০ হাজার টাকা উড়িয়ে দেন। বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও নারায়ণ দাস নিজেকে সংশোধন না করলে, শুধু মাত্র ব্যবসা ও সম্পত্তি বাঁচাতে দীননাথ সম্পত্তি বন্টন করে নেন, এটা ১২৯৬ সনের কথা। এই সময় ১৩৬ নং মানিকতলা রোডের বাড়িটি কিনে ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ১২৯৭ সনে দীননাথ এই বাড়িতে উঠে আসেন। সম্পত্তি ভাগ করা হয়েছিল লটারীর মাধ্যমে।

দীননাথের নানা ব্যবসার মধ্যে উল্টোডাঙ্গা অঞ্চলে বাজার একটি। তিনি মুচির ঘরে জন্মেছিলেন বলেই বাজারটি 'মুচিবাজার' নাম পেয়েছিল এবং সে কারণেই বাজারে সাধারণ মানুষ আসত না। এক দিকে গোস্বামী প্রভুদের আচরণ, অন্যদিকে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত কিন্তু মন্দিরে কি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যাবে? দীননাথ চিন্তা করে ঠিক করলেন পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও মানিকচাঁদ গোস্বামীর পরামর্শ নেবেন। তাঁদের শরণাপন্ন হলে, দুজনে সিমুলিয়ার প্রখ্যাত এটর্নী শ্রদ্ধেয় পান্নালাল দে মহাশয়ের বাড়িতে গোস্বামী প্রভুদের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বটতলার গোবিন্দচাঁদ গোস্বামী। দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হয় মুচির নামে মন্দির উৎসর্গ করা বা তার নামে সংকল্প করা যাবে না। তাহলে কি করতে হবে? নিত্যানন্দ বংশীয় শরৎচন্দর গোস্বামীর পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামীর নামে সংকল্প করে শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে এবং অতুলচন্দ্র গোস্বামী, মানিকচাঁদ গোস্বামী ও রাইচাঁদ গোস্বামী নিজেদের পরিচিত ব্রাহ্মণ, পূজারী প্রভৃতি নিযুক্তকরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, ভোগরাগের ব্যবস্থা ও দেবসেবার ব্যবস্থা করে দেবেন। আর খড়দহের শ্রীশ্রী শ্যামসুন্দর জীউর নাটমন্দির সংস্কার করার জন্য দীননাথকে দু-হাজার টাকা দান করতে হবে এবং মন্দিরেব সেবাকার্য পরিচালনার জন্য উল্টোডাঙ্গার বাজার রাধাগোবিন্দের নামে উৎসর্গ করে দিতে হবে। দীননাথ আনন্দের সঙ্গে এই প্রস্তাব মেনে নিলেন।

সভায় বলা হলো, এটা হলেই শ্রীপাট খড়দহ ও কলকাতার সমস্ত গোস্বামী প্রভুরা এই মন্দিরে সেবা গ্রহণ করবেন। ১৩২২ সনের ১৬ই আষাঢ়ের সভার নির্দেশ অনুসারে ৩০ আষাঢ় তারিখে গোস্বামী সেবার দিন ধার্য হয়। সভায় সব ঠিক হলেও, পরে হঠাৎ ক্ষীরোদচন্দ্র গোস্বামী দীননাথের কাছে খবর পাঠান যে, দীননাথ যেন বৈষ্ণব 'ভেক' গ্রহণ করে সেবা করার অধিকারী হন। ভেকের অর্থ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী হওয়া, তিনি গৃহী হয়ে কি করে সন্ন্যাস নেবেন ভেবে না পেয়ে, আবার ছুটলেন গোস্বামীর কাছে এই বিষয় নিয়ে গোস্বামীগণের মধ্যে দুটো ভাগ হলো। মন্দির উদ্‌বোধন হয়ে গেল কিন্তু গোস্বামী সেবা গণ্ডগোলের জন্য পিছিয়ে গেল। বৈষ্ণব সেবা শেষ পর্যন্ত হল মন্দির উদ্‌বোধনের তিন মাস পরে।

বৈষ্ণব ভোজন সমাপ্তির পরও গণ্ডগোল সমানে চলল। বিরুদ্ধবাদীরা সভা-সমিতি করে নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ করেছিল। এই নিয়ে 'বাগবাজার সামাজিক সভা' নাম দিয়ে দুটো

—৭

অধিবেশন এবং ২রা আশ্বিন তারিখে বাগবাজার নন্দলাল বসুর বাড়িতে 'বাগবাজার সামাজিক দ্বিতীয় অধিবেশন মীমাংসা' নাম দিয়ে সভা আহ্বান করা হল। এই সভায় সভাপতির ভাষণে শ্রদ্ধেয় যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন—'কুলীন ব্রাহ্মণগণের আহুত দুটি সামাজিক সভায় সভাপতিত্ব করেছিলাম বলে এই তৃতীয় সভায় সভাপতির কাজ করায় অসম্মত ছিলাম। কিন্তু সেই দুটি সভায় কোন যুক্তি বা শাস্ত্রসম্মত বিচারপদ্ধতি না হয়ে শুধু ক্রোধ ও বিদ্বেষমূলক কথা হয়েছিল বলে সেই দুটি সভার সিদ্ধান্ত মূল্যহীন বলে আমার ধারণা হয়েছিল। তাই আমার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও যখন তৃতীয়বার কুলীন সন্তানগণ আবার আমায় আহ্বান করেন, তখন প্রকৃত বিবরণ জানার জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। এখন রেজিস্ট্রি করা একবার দলিলে দেখা গেল, দীননাথ শাস্ত্রবিধি অনুসারে এবং আইনসঙ্গতভাবে তাঁর দেবালয় দেবত্র করে রামচন্দ্র গোস্বামীর দ্বারা তাঁর নামে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়ে গোস্বামীদের সেখানে সেবা গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। নিশ্চয়ই একথা বলতে হবে যে, বেশ্যালয় থেকে এই দেবালয় পবিত্র স্থান এবং সেখানে গোস্বামী প্রভুরা সেবা গ্রহণ করে কোনও নিন্দনীয় বা দোষের কাজ করেননি। তবে এত আন্দোলন কেন? তার উত্তর ভ্রান্তি ও বিদ্বেষ। গোস্বামী প্রভুগণ মুচির বাড়িতে সেবা গ্রহণ করেছেন—এই রটনা সম্পূর্ণ অলীক।

দীননাথ দাসের একমাত্র অপরাধ সে মুচির ঘরে জন্মেছে—তাই এই বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তি। বহু জনহিতকর কাজ করে কর্মবীর দীননাথ দাস ১৩৩৭ (১৯৩০ খ্রিঃ) সনের ৫ ফাল্গুন মঙ্গলবার রাত ১টায় সময় কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। ব্যবসায়ে কৃতী বাঙ্গালী বলে তাঁর মৃত্যুতে আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন—'দীননাথ শতছিন্ন মলিনবসনে সুদূর পল্লীগ্রাম হতে কলকাতায় এসে এবং স্বাধীন ব্যবসায়ের পত্তন করে তিনি এমন প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন যে, দেশের মঙ্গলের জন্য নানা সদনুষ্ঠানে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে গেছেন। দীননাথ ধনী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলে তিনি সাহেব পাড়ায় গিয়ে বসতবাটী তৈরী করেননি, অথবা পূর্বপুরুষরা যেভাবে হাঁটুর উপর কাপড় পরতেন তিনিও সেভাবে হাঁটুর উপর কাপড় পরার অভ্যাস ত্যাগ করেননি অর্থাৎ আড়ম্বর বা জাঁকজমকের লেশমাত্র তাতে ছিল না। টাকা হলেই মানুষ ভোগবিলাসী হয়। আড়ম্বরপ্রিয় হয়, দীননাথ একেবারে নিরাড়ম্বর ছিলেন। তিনি নীরবকর্মী ছিলেন, ঢাক পিটিয়ে দান খয়রাত করতেন না. নাম-বাজানো তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি ব্যবসাসূত্রে কলকাতায় থাকতেন বটে, তিনি তাঁর জন্মভূমি সেই পল্লীর গ্রামটিকে ভোলেননি। তিনি পরোপকার বা লোকহিত করতেন গোপনে, কিন্তু তা কেউ জানতে পারলে তিনি লজ্জিত হতেন।'

দীননাথ দাস-এই মানুষটি মুচি বংশে জন্মেছিলেন এক সময় মানুষ তাঁকে হেয় করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু দেশ সেবা ভক্তি, বিনয়, সর্বোপরি তাঁর কর্মকাণ্ড কালের কষ্ঠিপাথরে খাঁটি বলে মেনে নিয়েছি। আমরা ঐতিহ্য-বিস্মৃত জাতি বলে দীননাথের বাজার আজ মুচিবাজারের নামেই জনপ্রিয় হল—দেবতার নামে ঐ বাজার প্রতিষ্ঠা পেল না, এই দুঃখ শুধু দীননাথের নয়, এ দুঃখ সমাজের, এ লজ্জা সকলের।

কলকাতার নাম কেমন করে হল

১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্লের 'অসল্-ই-জমা-তুমর' বা মাশুলের তালিকায় এবং বাদসাহের সচিব ও প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজল-অল্লামির 'আইন-ই-আকবরি'-তে (১৫৯৬ খ্রিঃ) ফারসি ভাষায় Kalkatah শব্দটি রয়েছে।

১৬৯৮ খিষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর কলকাতা বায়নামায় ফারসিতে Kalkatah বানান লেখা রয়েছে। ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ২২ জুন তারিখে Calcutta-বানানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মোট ছবার Calcutta-র উল্লেখ রয়েছে।

বাংলায় কলিকাতা। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে কোলকাতা, কোলকেতা, কোলকেত্তা, কোলকাত্তা। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে কোইলকাতা, কোইলকাত্তা। ওড়িয়া উচ্চারণে 'কলিকেতা'। হিন্দিভাষীদের উচ্চারণে কলকাত্তা, কলকতা। জার্মানরা বলেন কালকুত্তা (Kalkutta)। ওলন্দাজদের মুখে Collecatte। ফরাসিরা Calecutta।[১]

নানান ভাষায়, নানান উচ্চারণ ধরে 'কলকাতা' নামকরণের ইতিহাসে কিংবদন্তীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ঐতিহাসিক তথ্য কম, গল্পকথা বেশি। একটি শহরকে কেন্দ্র করে নামকরণের এত বৈচিত্র্যময় ইতিহাস পৃথিবীতে আর কোনো শহরকে নিয়ে হয়েছে বলে জানা যায় না। আমরা কলকাতা নামকরণের ইতিহাসের নূতন কোনো তথ্য দিলাম না, শুধু তথ্যগুলি একত্রে সাজিয়ে দেওয়ায় আশা করছি সকলের ভালো লাগবে।

কাল-কাটানো থেকে ক্যালকাটা

মহাতীর্থ কালীঘাট, নিগমকল্পের পীঠমালায় বলা হয়েছে—

'দক্ষিণেশ্বর মারভ্য যাবচ্চবহুলা পুরী।
ধনুরাকার ক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয় সাংখ্যকং॥
তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারঃ ক্রোশমাত্রং ব্যবস্থিতঃ।
ত্রিকোণে ত্রিগুণাকার ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাত্মকং।
মধ্যে চ কালিকা দেবী মহাকালী প্রকীর্ত্তিতা॥

—দক্ষিণেশ্বর থেকে বহুলা (বর্তমান বেহালা) পর্যন্ত দুই যোজন ধনুকাকার স্থান কালীক্ষেত্র। এর মধ্যে এক ক্রোশ ত্রিকোণাকার স্থানের তিন কোণে ত্রিগুণাকাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং মধ্যস্থলে কালিকাদেবী বিরাজ করেন।

এমন পুণ্যস্থান সম্পর্কে 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থে লেখা হয়েছে—

চলিল দক্ষিণ দেশে বালি ছাড়া অবশেষে
উপনীত যথা কালীঘাট।

১. কলকাতার সৃষ্টি ও জবচার্নক—পি. টি নায়ার পৃ. ৩৫

দেখেন অপূর্ব্ব স্থান পূজা হোম বলিদান
দ্বিজগণে করে চণ্ডীপাঠ॥

এই 'অপূর্ব' স্থানে মানুষ জীবনের শেষ কালটা কাটাতে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের কাছাকাছি স্থানে বসবাস শুরু করল। শেষ 'কাল-কাটা'তে বহু মানুষের বসবাস হল যে জায়গায়, তার নাম হয়ে গেল 'কাল-কাটা', এর থেকেই নাম হল কালকাটা বা ক্যালকাটা।

'কাল-কাটা' থেকে কলকাতা

নদী থেকে পাড়ে উঠে এক সাহেব গ্রামের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখেন একটি গাছের নীচে কয়েকজন মানুষ বসে কথা বলছে। সাহেব আঙুল দিয়ে মাঠের দিকে দেখিয়ে, জায়গার নাম জিজ্ঞেস করলেন। দেশীয় মানুষেরা ইংরেজি জানে না, তারা সাহেবের দিকে তাকিয়ে—আঙুল কোন দিকে দেখে নিল। সাহেব যে দিকে আঙুল দেখিয়েছে, সেদিকে একটি বড় গাছ কেটে মাটিতে শুইয়ে রাখা ছিল। ওরা ভাবল, সাহেব হয়তো জানতে চাইছে এই গাছটি কবে কাটা। ওরা সাহেবকে বলল 'কাল কাটা' অর্থাৎ গাছটি গতকাল কেটেছি। সাহেব বুঝল, জায়গার নাম 'কালকাটা'। ব্যাস! 'কাল-কাটা' থেকেই জায়গার নাম হয়ে গেল ক্যালকাটা, ক্যালকাটা থেকে পরে কলকাতা।

বিষয় একই, তবে অন্য একটি লেখাতে গাছের জায়গায় ধানগাছ এবং লোকগুলি হল চাষি। ধানগাছ 'কাল-কাটা' থেকে 'ক্যালকাটা' হয়েছে।

'কালীকর্তা' থেকে কলকাতা

মহাতীর্থ কালীঘাটে সতীঅঙ্গ পড়েছিল। 'কলিকাতা বর্ণন'-এ রূপচাঁদ পক্ষী লিখেছেন—

'সতীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলী
কলিকাতাতে আছেন কালী, মাকালী,
কলকাতাওয়ালী সর্ব্বমঙ্গলী,
শ্যামা মায়ের কি বৈভব।'

কালী এখানে 'কলকাতাওয়ালী' অর্থাৎ কালীই এখানকার কর্তা। 'রিয়াস-উস-সালাতিন' নামে একটি বইতে[১] জানানো হয়েছে, আগে কলকাতা একটা সামান্য পল্লীমাত্র ছিল, সেখানে কালীমায়ের মূর্তি স্থাপিত ছিল। বাংলা ভাষায় 'কর্তা' মানে প্রভু। যেহেতু মা এখানকার কর্তা তাই তাঁর পূজাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য ঐ জায়গার আয় নির্ধারিত ছিল। কালী এখানকার কর্তা ছিলেন বলে জায়গাটিকে কালীকর্তা বলা হত। পরে উচ্চারণে কালীকর্তা কলিকাতায় পরিণত হয়।

'কালিকা-থা' থেকে কলিকাতা

হিন্দিতে 'থা' মানে ছিলেন, কে ছিলেন? কালিকা দেবী ছিলেন। কোথায় ছিলেন?

১ রিয়াস-উস-সালাতিন (উদ্যান-তোরণ, তৃতীয় বিভাগ, পৃ ২৪) অনুবাদ—রামপ্রাণ গুপ্ত

কালীঘাটের মা কালী নাকি আগে কালীঘাটে ছিলেন না, ছিলেন বর্তমান পানপোস্তার উত্তরে। সেখানে দেবীর পাকা মন্দির ও ঘাট ছিল। ঘাটটি সাধারণ ঘাট নয়, মায়ের জন্য পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাট ছিল—তাই এই ঘাটের নাম মায়ের নামে না হয়ে পাথরের নামে 'পাথুরিয়াঘাটা' হয়। ঠিক পানপোস্তার উত্তরে ২০৩ নং দরমাহাটা স্ট্রিটে দেবীর পুরনো মন্দির ছিল। মা থাকলে পাশেই শিব থাকবেন, তাই ২৩৫ নং দরমাহাটায় শিবমন্দিরটি রয়েছে। কাপালিকরা দেবী কালিকাকে একদিন এই স্থান হতে তুলে বর্তমান কালাঘাটে নিয়ে যান। ব্যবসার কারণে কাপালিকদের সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং তারা চাইল নির্জন স্থান। নরবলি দেওয়া এই ভয়ঙ্কর সাধুদের সকলে ভয় করত, তাই মাকে নিয়ে যাওয়ার কথায় কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। শুধু বড়বাজারের ব্যবসায়ীরা দুঃখ করে বলতেন, এখানে 'কালিকা-থা'—এটাই মানুষের মুখে মুখে কালিকাথা থেকে কলিকাতা হয়ে যায়।[১]

'কলকে-টা' থেকে কলকাতা

গঙ্গাপাড়ে বাঁশের খুঁটি দিয়ে চালাঘর তৈরি হয়েছে। গুলিখোরদের তীর্থস্থান। উত্তাপে আফিম গলিয়ে তার সঙ্গে শুকনো খোলায় কুচি করা পেয়ারাপাতা আফিমের সঙ্গে মিশিয়ে ছোট ছোট গুলি পাকানো হয়। নদীতীরের ঐ ঘরে ধুঁয়োর উৎসবে নেশার মৌতাত যখন জমে ওঠে তখন গুলিখোরেরা চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে যায়। কেউ জোড়ে কথা বললে সকলে বিরক্ত হন। গোলমালে নেশা নষ্ট হয়ে যায়। একদিন এক সাহেবের নৌকো ভিড়ল এই ঘাটে, নৌকো থেকে জায়গার নাম জিজ্ঞেস করলেন, কারো মুখে কথা নেই। শীর্ণ, শিরাবহুল, বিস্ফারিত চোখে নৌকোর দিকে তাকিয়ে এক গুলিখোর বন্ধুকে বললেন—দে 'কলকে-টা'। 'কলকে-টা' শুনে প্রশ্নকর্তা ভাবলেন জায়গাটির নাম 'কলকেটা' যা পরে কলকেতা বা কলিকাতা নাম পায়।

'কালীকোটা' থেকে কলিকাতা

আকবরের সময় বর্তমান কলকাতার সমস্ত জায়গা ছিল বাদা ও জঙ্গলে ভর্তি। জায়গার কোনো নাম ছিল না, সকলের কাছে 'কালীঘাট' নামটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিল। এই কালীঘাট থেকেই কলিকাতা নামটি এসেছে। কীভাবে এসেছে? বলা হয়েছে আইন-ই-আকবরির লেখক আবুল ফজল বাংলা ভাষাটায় তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি 'কালীঘাট' শব্দটি ফারসিতে লিখতে গিয়ে 'ঘ'-এর জায়গায় 'গায়েন' না লিখে 'ক্কাফ' লিখে ফেলেন, ফলে কালীঘাট ফারসিতে হয়ে গেল 'কালীকোটা'। রাঢ় অঞ্চলে সাধারণ মানুষ কালীঘাটকে 'কালীঘাটা' বলে। ইউরোপীয়দের মুখে আবুল ফজলের 'কালীকোটা' শব্দের ঈ-কারের লোপ হয়ে 'কালকোটা', ক্রমে 'কালকট্টা' হয়েছে। দেশীয় ব্যবসায়ীরা ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে 'কালীকোটা'র জায়গায় 'কালকট্টা' 'কালীকাতা' বা 'কলিকাতা' হয়েছে। এই সূত্রে কালীদেবীর নাম থেকে কলকাতা, কালীঘাট ও ভবানীপুর এই তিনটি নামকরণ হয়েছে।[২]

---

১. কলিকাতার কথা (আদিকাণ্ড) প্রমথনাথ মল্লিক, ১

২ কালীক্ষেত্র দীপিকা—সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা হরিপদ ভৌমিক পৃ. ৩৮-৩৯।

'কালী-কাটা' থেকে ক্যালকাটা

কালী মায়ের কাছে মহাপূজার অর্থ বলিদান। কালীর কাছে কাটা বা বলি না হলে মা নাকি তুষ্ট হতেন না। পাদরি ওয়ার্ড সাহেব জানিয়েছেন— 'এই দেবীর নিকট প্রতিদিন আট দশটি ছাগ বলি হয়। ...প্রধান প্রধান উৎসব দিবসে ৪০ হতে ৫০টি মহিষ ও ন্যূনাধিক এক সহস্র ছাগ বলি দেওয়া হয়।'[১] কালীর কাছে কাটা থেকে এক সময় 'কালী-কাটা' নাম হয়ে গেল। এই কালীকাটা থেকেই ক্যালকাটা হয়। ইংরেজিতে Kali Kata থেকে Kalkatta হয়।

কালীকোটা থেকে ক্যালকাটা

কালী মা স্থায়ী হয়ে বসে আছেন কালীঘাটে। এ যেন মায়ের দুর্গ, তাই এই জায়গাকে বলা হয়েছে কালী কোটা (দুর্গ)। 'কোটা' শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে। কালীকোটা শব্দটি লোকের মুখে মুখে কালকোটা শেষে ক্যালকাটা হয়।

কলিকোট্টা থেকে কলিকাতা

দ্রাবিড় ভাষায় 'কালি' শব্দের অর্থ হল খেলা, আর কোট্টা বা কোঠা হল মাঠ। খেলার শহর কলকাতার 'কলিকাতা' নামটি নাকি 'কলিকোট্টা' বা খেলার মাঠ থেকে হয়েছে ।

'কালিকট' থেকে কালিকাটা

ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ মালাবার উপকূলের কালিকটে এসে ভিড়েছিল ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। কালিকট থেকে কাপড় পৌঁছে গেল ইউরোপে, জনপ্রিয়তা পেতে সময় লাগল না। পোর্তুগিজরা কালিকটে কাপড় বোনার কেন্দ্র গড়ে তোলে, ইংরেজরা এই সুনামটাকে কাজে লাগাতে চাইল। তারা সুতানুটির শেঠ-বসাকদের তৈরি কাপড়কে কালিকটের কাপড় বলে চালাল। Calicut—ছাপের জন্য সুতানুটির পাশে বস্ত্র বয়নের জায়গা Calicuta নাম পেয়ে যায়। এই কালিকাটা-ই লোকমুখে কলিকাটা হয়ে কলিকাতা।

'কালীঘাটা' থেকে কলিকাতা

তন্ত্র মতে কালীমাতার এই স্থানের নাম 'কালীঘট্ট'। এই কালীঘট্ট বাংলায় হয়ে যায় কালীঘাট বা কালীঘাটা। কালীঘাটা থেকে কালীকাটা হয়ে কলিকাতা হয়।

কালীক্ষেত্র থেকে ক্যালকাটা

কালীঘাটের প্রাচীন নাম 'কালীক্ষেত্র'। সংস্কৃত গ্রন্থে কালীক্ষেত্র, ইংরেজি বানানে 'Kali-Khetra' হয়। লোকমুখে Kali-Kehtra সামান্য বদলে Kali-Kheta হয়ে যায়। না, উচ্চারণে Kali-Kheta রইল না, হয়ে গেল Kali-Khota বা Kalikota. এই কালীকোটা থেকে ক্যালকাটা হয়।

---

১ কলিকাতার ইতিহাস—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর। সুবল চন্দ্র মিত্র অনূদিত পৃ. ৯৮

'কলি-কাতা' থেকে কলিকাতা

'কলি' হল কলহ, 'কাতা' হল ঘর। কলিকাতা—কলহের ঘর, ঝগড়ার জায়গা। ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ, জমি সব মিলিয়ে মানুষের শুধু চাই আর চাই। এই চাওয়ার লোভ থেকেই 'ঠক, জোচ্চরি, মিথ্যাকথা—তিন নিয়ে কলকাতা' হল। সবকিছু নিয়েই এখানে শুধু কলহ আর কলহ, তাই এই জায়গা নাম পেল কলি + কাতা = কলিকাতা।

'কালীক্ষেত্র' থেকে কলকাতা

কালীঘাটের প্রাচীন নাম কালীক্ষেত্র। কালী—দেবী কালিকা আর ক্ষেত্র হল জমি, কালীক্ষেত্র—কালীদেবীর জমি। এই কালীক্ষেত্র (Kali-khetra) কালী-ক্ষেতা (Kali-kheta) এবং পরে Kalikota হয়ে Kalkota বা কলকাতা হয়।

'কালিকা হাটা'ও থেকে কলিকাটা ঃ

'কালিকা হাটা' শব্দটি এসেছে কালী দেবীকে হাটাও থেকে। ময়দানে নাকি আগে কালিকা দেবীর মন্দির ছিল, সাধারণ মানুষের কাছে এই মন্দির ভয়ের কারণ ছিল। তান্ত্রিকেরা লোকালয় থেকে মানুষ ধরে নিয়ে এসে এখানে নরবলি দিত, সুতরাং সাধারণে ভয় এবং ক্ষোভ থেকে দাবী ওঠে কালিকা-হাটাও। সকলের বিশ্বাস ছিল কালিকা দেবীকে হটালে তান্ত্রিকদের অত্যাচার বন্ধ হবে। কালিকা-হাটাও থেকে কালিকাটাও এবং শেষে কালিকাটা বা ক্যালকাটা নাম হয়।

'কালীকুট্টা' থেকে ক্যালকাটা

বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্র মতে কালীঘাটে শাক্তগণ শুধু তন্ত্র সাধনাই করতেন না, কাপালিকদের নরবলি আদি অত্যাচারে কালীঘাট জঙ্গলে পরিণত হয়। মাকালী-সর্বনাশী কালী নামে পরিচিত হয়, কালীর এই সর্বনাশী রূপকে 'কুট্টা' নামে অভিহিত করলে দেবী 'কালীকুট্টা' নাম পায়। এই কালীকুট্টা (Kali-Kutta)-ই ক্যালকট্টা হয়, পরে ক্যালকাটা নাম পায়।

'কালিকা-উঠ' থেকে ক্যালকাটা ঃ

কালিকা—কালীদেবী, উঠ—ওঠা বা নড়া। রেভারেন্ড ওয়ার্ড (Rev. Ward) সাহেব 'কালিকা-থা'— কালীদেবী ছিলেনের মতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরের জন্য দেবীকে জড়িয়ে ঐ তথ্যটি দেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাচীন কাগজপত্রে কালীঘাটের বানান লেখা হয়েছে—Collighaut, Collegot, এই বানান থেকেই Colligha-ut বা কালিকা-উঠ শব্দের জন্ম। Kalika-ut থেকে Kalikat এবং Kalikat–ই ক্যালকাট, পরে ক্যালকাটা হয়।

'গোলগাথা' থেকে কোলকাতা

১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে Le Sieur Luillier সাহেব কলকাতা ভ্রমণে এসে 'Golgotha' শব্দে

কলকাতা অঞ্চলের নাম লিখেছেন। Sonnerat সাহেবও বানান লিখেছেন 'Golgata'। ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে ইতালীর মিশনারী Abbate D. Matteo Ripa কলকাতার পোর্তুগিজ গির্জা দেখতে আসেন। তিনি 'Some English Officials living at Golicatan' বলেন। Father H. Hosten পরে এই 'Golicatan' সম্পর্কে টীকায় বলেছেন—'Golicatan is Calcutta'।

কলকাতায় ১৭৩৭ সালের ১১ এবং ১২ অক্টোবর যে ভয়ঙ্কর ঝড় ও ভূমিকম্প হয়েছিল, সেই সংবাদ পরে অর্থাৎ ১৭৩৮-৩৯ সনের Gentleman's Magazine-এ প্রকাশিত হয়। কলকাতা স্থানের নাম 'Golgota' এবং 'Golecotte' বানান দেখা যায়।

আসল 'Golgotah'—জায়গাটি হল জেরুশালেমের যেখানে যিশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। Golgatha শব্দটি ইহুদি ভাষায় 'মাথার খুলি' অর্থে Gulgoleth শব্দের গ্রিক রূপ। ইউরোপীয়দের পক্ষে পুরনো কলকাতার আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তাই সেকালের কলকাতাকে সাহেবরা বলতে চেয়েছেন 'Golgotha'। এই Golgotha-র 'G'-টি 'C' হয়ে Colcotha হয়ে কোলকোতা হয়। কোলকোথা-ই শেষে কোলকাতা নাম পায়।

'কালিকা-হাট' থেকে কলকাতা

আদি গঙ্গার তীরে কালী মায়ের মন্দিরের পাশে সপ্তাহে একদিন হাট বসত। যে ঘাটে নাবিকরা নেমে মায়ের মন্দিরে ও হাটে যেত, সেই ঘাটের নাম হল কালীঘাট, আর মায়ের মন্দিরের কাছের হাট পরিচিত হল 'কালিকা-হাট' নামে। 'কালিকাহাট' লোকমুখে হয়ে গেল 'কালিকাট' বা কালকিটা, এই থেকে ক্যালকাটা।

'কলি'-'কাতা' থেকে কলিকাতা

জাতীয় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে[১]—'কলিকাতা—একটি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ। ইহার অর্থ 'কলি' বা কলিচুনের জন্য 'কাতা' বা শামুকপোড়া। ...কলির বা চুনের ও কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত এবং চুনের কারখানা হইতে 'কলি-কাতা' নাম। পাথুরিয়া চুন দক্ষিণ বঙ্গে হয় না, এ অঞ্চলে শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়াই চুন প্রস্তুত হয়। এই চুন দেওয়ালে চুনকাম করিবার বা কলি ফিরাইবার জন্যই প্রশস্ত। সেই জন্য ইহাকে কলিচুন বলে। ...'কলি' শব্দ বাঙ্গলায় সুপরিচিত। 'কাতা' শব্দ চুন অর্থে কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীনদের মুখে শুনিয়াছি। ...কলিকাতা গ্রামে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চুন প্রস্তুত হইত, তাহার নিদর্শন আছে।' 'জোঙ্গড়া চুন, শামুক পোড়া কলিচুনের ও অন্য চুনের কাজের জন্য 'কলি-কাতা' বা কলিচুন এবং কাতা-চুনের বা শামুক-পোড়া কাতার আড়ত হিসাবে, এখন হইতে সাড়ে চারিশত পাঁচ শত বৎসর পূর্বে দ্রব্যের নাম হইতে স্থানের নামস্বরূপ এই নাম গৃহীত হইয়া যাইতে কোনো বাধা নাই।

---

১. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৪৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা/'দেশ' পত্রিকা ৯ মার্চ ১৯৬৮ পুনর্মুদ্রণ।

'কোল-কা-হাতা' থেকে কোলকাতা

'কোল' জাতির মানুষরা নাকি এই জায়গার প্রাচীন বাসিন্দা, এই 'কোল' জাতির 'হাতা' বা বসতি থেকে এই 'কোল-কা-হাতা' বা কোলকাতা হয়েছে। ইংরেজি বানানে Kol-ka-hata বানানটি ভেঙে Kol-ka-ta হয়েছে। অন্য মতে কোলদের প্রতিষ্ঠিত হাটকে লোকে বলত 'কোল-কা-হাটা'। এই 'কোল-কা-হাটা', লোকমুখে 'কোল-কা-টা' নাম পেয়েছে।

'কলি-হাতা' থেকে কলিকাতা

মহারাষ্ট্রে অধিবাসী 'কলি'দের বস্তি বা 'হাতা' থেকে কলিকাতা হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। মুম্বাইতে 'কলি'রা জাতব্যবসা সমুদ্রে মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে। প্রাচীন কলকাতায় 'কলি' দের 'হাতা' থেকে 'কলি-হাতা' মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণে 'কলিকাতা' বোঝা যেত, সেই ভাবেই নাম পেয়েছে কলিকাতা।

'কাল্লী-ঘাট্টা' থেকে কলিকাতা

কালীঘাট ইংরেজি বানানে 'Kallee Ghattah' রয়েছে। এই Kallee—উচ্চারণে 'কল্লি' এবং Ghattah—উচ্চারণে ব্যঞ্জন বর্ণ (মহাপ্রাণ বর্ণ) 'ঘা' লোকমুখে নরম হয়ে অল্পপ্রাণ 'বর্ণ'তে পরিণত হয়ে ঘাট্টা—কাট্টা হয়ে 'কল্লিকাটা' হয়। এই কল্লিকাটা থেকেই শেষে ক্যালকাটা নাম পেয়েছে।

কোলে-কাঁথা থেকে কোলকাতা

গ্রামের মানুষ বাড়ি করার সময় খনার বচন মেনে ঘর করতে,

'পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ।
উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা॥
দক্ষিণ ছেড়ে, উত্তর বেড়ে।
ঘর কর গে পোতা জুড়ে॥'

পূবে হাঁস অর্থাৎ পূর্ব দিকে কাটবে পুকুর, পশ্চিম দিকে বাঁশ বন, উত্তর দিকে কলাগাছ, দক্ষিণ দিক খোলা। প্রবাদেও আছে 'ঘর করবে গুটি গুটি, পুকুর দেবে একটি।' সমস্যা হল এখানেই। অনেকগুলো ঘর, পুকুর একটা। ছেলে-মেয়ের রাতের কাঁথা ধোবে কোথায়? নদী-পাড়ে বাড়ি হলে সোজা নদীর ঘাটে। পরপুরুষ আবার না দেখে তাই নদীর ঘাটে যেতে হয় খুব ভোরে। একদিন কোলে করে বেশ কিছু কাঁথা নিয়ে এক মহিলা যাচ্ছেন নদীর ঘাটে। এক সাহেব নৌকো থেকে কোনো লোকজন না দেখে, ঐ মহিলার উদ্দেশ্যেই বললেন, 'জায়গাটির নাম কী?' মহিলা পরপুরুষ দেখে বড় করে ঘোমটা টেনে মুখ ঘুরে দাঁড়ালেন। মহিলার কোলে যে 'কাঁথা' তা নৌকোর দিকে হয়ে গেল, মাঝি মনে করেছে সাহেব ঐ মহিলার কোলে কী তা জানতে চেয়েছেন! মাঝি বললেন 'কোলে-কাঁথা'—সাহেব কাগজে লিখে নিলেন কোলে কাথা (Kole Katha)। ব্যাস, সাহেবের লেখা Kole Katha থেকেই কোলকাথা বা কোলকাতা হয়ে গেল।

'কলকে-পোতা' থেকে কলকাতা

নদী বা পুকুরের পাড়ে, উঁচু করে বাড়ির পোতা তৈরি করে, পাশে ফুলগাছ লাগানো প্রাচীন রীতি। পুরনো কলকাতায় গঙ্গাতীরে এমনই একটি পোতা বাড়ির মধ্যে কলকে ফুল ফুটে রয়েছে, নদীর পাড়ে তো আর জায়গার নামের সাইনবোর্ড লাগানো থাকে না, নৌকো থেকেই সাহেব জিজ্ঞেস করল জায়গার নাম কী? হাত জোড় করে পাড়ে দাঁড়ানো গৃহস্বামী বললেন, আজ্ঞে এটা কলকে, ওটা পোতা। অর্থাৎ এটা কলকে ফুলের গাছ আর ওটি বাড়ি। কালা আদমীর বাংলা 'কলকে [পো]তা' সাহেব শুনলেন 'কলকেতা'।

খাল-কাটা' থেকে কলকাতা

দক্ষিণবঙ্গে খাল, বিল, নদী, নালার অন্ত নেই। বসতির স্বার্থে সাধারণ মানুষজনও খাল কেটে নিজেদের প্রয়োজন মেটাত। ফারসিতে লেখা বায়নামায় কলকাতাকে 'খালকাটা' (Khalkhattah) রূপে দেখানো হয়েছে। 'খালখাট্টা' (Khal-Khatta) শব্দটিই পরে 'কাল-কাট্টা'য় পরিণত হয়। ১৬৬০ খ্রিঃ ভন-ডেন-ব্রুক-এর ম্যাপে খাল বা খাড়ি চিহ্নিত করে নদীকে **'Calcutta R[iver]** এবং শহরকে 'COLICOTTA' বলেছেন।

বর্গীর হাঙ্গামার হাত থেকে কলকাতাকে বাঁচাতে ইংরেজগণ বাগবাজার থেকে একটি খাল খনন করা শুরু করেন। এই খালটি 'মারাঠা ডিচ' নামে খ্যাত হয়। পরে এই মারাঠা ডিচকেই কলকাতার পূর্বসীমা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই মারাঠা খালকে কেন্দ্র করেই সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর তিনটি গ্রাম একত্রে কলকাতা নামে পরিচিত হয়।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে 'কলিকাতার বৃত্তান্ত' নামে একটি লেখা ১০ আগস্ট তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই লেখাতেও খালকাটা থেকেই কলকাতা হয়েছে বলে দাবী করা হয়, তবে খালের অর্থ অন্য করা হয়েছে, সংবাদে লেখা হয়েছে— "এই মহানগর কলিকাতা পূর্বে এক খালেতে বেষ্টিত ছিল তাহাতে এই শহরকে খালকাটা বলিত আরো শুনা গিয়াছে যে ইংরাজেরা যখন এদেশে প্রথম আগমন করিলেন তখন তাঁহারা হিন্দুস্থানের বাদশাহ ঔরংজেব হইতে একখানি খাল অর্থাৎ চামড়ার মাপের জমি উপঢৌকন অর্থাৎ সওগাত পাইয়াছিলেন সেই মাপের জমি এই স্থানে লওয়াতে ইহার নাম খালকাটা হইল।" এই খালকাটা থেকেই ক্যালকাটা হলো।

'কলি-কর্তা' থেকে কলিকাতা

কলির চক্রান্তে 'কলকাতা'র নামকরণ হয়েছে বলে বীরভূমের বহড়ান গ্রামের নারায়ণ চট্টরাজ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'কলিকুতূহল' নামে লিখেছেন । নারায়ণবাবু জানিয়েছেন, ক্রোধের ঔরসে হিংসার গর্ভে কলির জন্ম। পৃথিবীতে সত্য. ত্রেতা, দ্বাপরের পর চতুর্থ যুগ কলির রাজত্ব শুরু! তাঁর রাজত্বে 'দ্যূত মদ্য পরদারা হিংসা এই চারি' আনতে কলি হিমালয়ে মহাদেবের স্তব শুরু করেন। স্তবে মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন কলির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

পৃথিবীতে আগম প্রকাশ হল, শ্যামাশক্তির আরাধনা শুরু হল পঞ্চ 'ম' কারে—'তত্ত্ব প্রিয়া হন তারা, পরতত্ত্ব সমকারা, তত্ত্ব সেবা করহ যতনে। মদ্য মাংস মৎস্য আর মুদ্রা ও মৈথুন তার, অঙ্গ কহে তারাপ্রিয় জনে॥'

কলি অনুতাপ ও অধর্মের সঙ্গে মন্ত্রণা করে ঠিক করেছেন বঙ্গদেশে কলির প্রভাব বিস্তার করতে হলে প্রথমে কৌলিন্য প্রথা স্থাপন করতে হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। কবি বলেছেন—

'শিব আজ্ঞা আছে মোর যাব বঙ্গ দেশে।
কৌলীন্য মর্য্যাদা আগে স্থাপিব বিশেষে॥
যাহে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সেই প্রজাগণ।
করিতে না পারে কুলপথ উলঙ্ঘন॥
তাহে বহুকালে স্ত্রীর না হবে বিবাহ।
জার ভজি তারা কাম করিবে নির্ব্বাহ॥
পুরুষে করিবে বহুতর পরিণয়।
কুলীনের কুল রক্ষা না করিলে নয়॥
একজন হৈতে বহু কামিনীর কাম।
কদাচ না পারিবেক হইতে বিরাম॥
তাতে সে রমণীগণ তেজি লাজ ভয়।
পর পুরুষেতে রত হইবে নিশ্চয়॥
যদি পুন তাহে বহু ভার্য্যা পতি মরে।
তবে ত হইবে সব বেশ্যা ঘরে ২॥
অকুলীন পুরুষের বিবাহ না হবে।
সে সবার দ্বারে সতী ধর্ম্ম নাহি রবে॥
অথ লোভে কেহ কন্যা করিতে বিক্রয়।
প্রৌঢ়া করি রাখিবেক তেজি লোকভয়॥
তাহাতে সহিতে নারি যৌবনের জ্বালা।
স্বেচ্ছায় ভজিবে যারে-তারে কুলবালা॥
এইসব মনোবৃত্তি করিতে সাধন।
বঙ্গরাজ্যে এবে আমি করিব গমন॥
আদিসুর রাজা আছে বিক্রমনগরে।

নিজাংশে জন্মিব তার মহিষী উদরে॥
বল্লাল নামেতে খ্যাতি হইবেক তথা।
সেই দ্বারের নিজ মত সাধিব সর্ব্বথা॥'

'কলি' বল্লাল সেন রূপে আবির্ভূত হয়ে কুলমর্যাদা স্থাপন করলে বঙ্গদেশে কি অবস্থা হয়েছিল সে সম্পর্কে নারায়ণ চট্টরাজ বলেছেন—

'যে জন সকৃত ভঙ্গ, ভূমিতে না পড়ে অঙ্গ,
শতেক দুশত যার নারী।
যেখানে সেখানে যায়, জামাই আদরে খায়,
মুদ্রা লইবারে বাঢ়ে পারি॥
নারীর শয্যায় বস্যে, আগে তারে ধরে কস্যে,
দেহ কিবা রাখিয়াছ মান।
টাকা পেলে হন খুশি, নতুবা মারেন ঘুষি,
তৎক্ষণাৎ উঠি চলি যান॥
নারী বলে একি ভাব, আমার অবস্থা ভাব,
কোথা পাব তুমি নাহি দিলে।
স্বামী কহে থাক ২, সাত পাঁচ তুলে রাখ,
সোজা বল মিলে কি না মিলে॥
যেতে হবে বহু ঠাঁই, চালে মম খড় নাই,
টাকার হয়েছে প্রয়োজন।
নতুবা এ দূর দেশে কোন জন বল এসে,
ঘরে নাহি হৈলে অনাটন॥
দু চারি বৎসর পরে, পতি যদি যায় ঘরে,
তাহে হয় একরূপ ঘটন।
টাকা দেহ এই বুলি, প্রায় হয় চুলাচুলি
দ্বন্দ্বে হয় রজনী বঞ্চন॥
ইথে কি সতীত্ব থাকে, জাতিকুল কেবা রাখে,
বিবাহ সে সংস্কার মাত্র।
যার যাতে মনঃ মজে, সে জন তাহারে ভজে,
ছোট বড় নাহি পাত্রাপাত্র॥

স্বভাবের গুণ যাহা, অরণ্যে জন্মায় তাহা,
কেহ রাখে কেহ করে পাত।
জাতি পাছে হয় বাঁকা, কোনমতে দেয় ঢাকা;
ফেলে সারে জামাইর পাত॥
এইরূপে ধরাতলে, বর্ণসঙ্করের দলে
ক্রমে ২ অনেক ব্যাপিল।
যজ্ঞসূত্র গলে ধরি, বেদ উচ্চারণ করি,
বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইল॥'

কলির মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। 'ঘোর কলি' প্রতিষ্ঠার জন্য কলি দ্বেষ ও দম্ভকে সঙ্গে দিয়ে ক্রোধকে দিগ্বিজয়ে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে নতুন রাজধানী তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইংরেজরা সুতনুটিতে যে ভাবী শহরের বীজ রোপণ করেছিলেন, কলি দেখলেন সেই স্থানকে সাজিয়ে নিলেই আশা পূর্ণ হবে। কিন্তু এ কাজ করতে হলে তো তাঁকে নবরূপে আবির্ভূত হতে হবে। জব চার্নক নন, কলি ক্লাইভ রূপে আবির্ভূত হয়ে নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন,

'এইরূপে কলিরাজ, দ্বেষে মগ্ন এ সমাজ,
দেখি অতি আনন্দিত চিতে।
কোথা রাজধানী করি, এই ভাবিত ভিতরি,
মনোমাঝে লাগিল চিন্তিতে॥
নিষেধিল পশুপতি, আর্য্যাবর্তে নিবসতি,
করিতে আমারে কিছুকাল।
তাঁর আজ্ঞা উলংঘিলে, সুবিপদ তিমিঙ্গিলে,
গ্রাসে পাছে হইয়া করাল॥
অতএব গৌড়দেশে, গিয়া এসে সুবিশেষে,
নিজনামে স্থাপিব নগর।
মায়ামোহ অনুচরে রাজ্য দিয়া তার করে,
মন আশা পুরাব বিস্তর॥
এত ভাবি সেই কলি, নিজ কার্য্যে সুকৌশলী,
ক্লাইভ সাহেব বেশ ধরি।
বাণিজ্য করা কপটে, সুরধুনী পূর্ব্বতটে,
বিরচিল অপূর্ব্ব নগরী॥'

এই অপূর্ব নগরীকে কলি মায়া, মোহ ও লোভের হাতে ছেড়ে দিলেন। ইংরেজরূপে এরা সকলকে পরিচালনা করব, এরা 'লইতে প্রজার ধন নাহি করে বল। অথচ সবস্ব লয় করিয়া কৌশল।' আর 'যে দেশে যতেক হয় লোভের সঞ্চার। সে দেশে ততই দুঃখ বাড়য়ে সবার।' সুতরাং নূতন রাজধানী হল লোভের শহর। লোভ হলেই তার সঙ্গে যুক্ত হয় মদ, এই 'হেন মদ্য রাজা [ইংরেজ] নিজে করিতে বিক্রয়। স্থানে ২ করেছেন মদিরা আলয়॥' মদ থাকবে অথচ নারী থাকবে না, তা হতে পারে না, ফলে 'বেশ্যাসঙ্গ হয় নানা কুকর্ম্মের মূল। সেই বেশ্যাবৃত্তি প্রতি রাজা অনুকূল॥' কলির শহর কলকাতাতে তাই—

'অধর্ম্মের বাড়ে জোব, ধর্ম্মের বিপদ ঘোর,
এক পদে কাঁপে সর্ব্বক্ষণ॥
যার যাহা মনে ধরে, সেইজন তাহা করে,
নিবারণ করিতে কে পারে।
এমন সময়ে কলি, হয়ে অতি কুতূহলী
লোভ প্রতি কহে বারে ২॥'

কলির শহর বলেই প্রাধান্য পেল চৌর্য, দস্যুবৃত্তি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবাদ। প্রবাদ হয়ে গেল, 'জাল জুয়াচুরি মিথ্যা কথা এই তিন নিয়ে কলকাতা।' হ্যাঁ, কলির নূতন রাজধানীর নাম কলিকাতা। কলি এর কর্তা বলে নাম দেওয়া হয়েছিল কলিকর্তা, তা থেকেই কলিকাতা। নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি বলেছেন, 'এইরূপ মনোহর নির্মাণ করি নগর, কলিকর্ত্তা বলি রাখে নাম। গুণনিধি কহে সার, কলি তব এইবার, পরিপূর্ণ হবে মনস্কাম॥' অনেকে মনে করেন কলির ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করেছে এই শহর থেকে, তাই 'কলি'র 'কাতা' অর্থাৎ দড়ি বা ফাঁদ থেকে নাম হয়েছে কলিকাতা।

কলকাতা ঃ অঞ্চলের নাম

কলকাতা অঞ্চলে ডিহি/ডি/ডিহা দিয়ে অনেক গুলি নামকরণ হয়েছে। চাষেরজমি সহ যে কোন মৌজাকে বোঝাতে 'ডি' ব্যবহার করা হত। একই ব্যক্তির মালিকাধীন একাধিক লাগোয়া গ্রামকে 'ডিহি' বা 'ডিহা' শব্দে বোঝাতে ব্যবহার করা হতো। 'ডি' ওব্দে সাঁওতালী মানে হলো পল্লী বা ছোট গ্রাম। কেউ কেউ মনে করেন, সাঁওতালী 'ডি' শব্দটি মোগলযুগে 'ডিহি'তে পরিণত হয়েছে। ফার্সী 'দেহ' থেকে 'ডিহি' হয়েছে বলে মনে করা হয়। এর অর্থ জমিদারের প্রধান গ্রাম। অষ্ট্রিক ভাষায় 'ডিহি' হলো চারপাশে শুকনো মাঠের মাঝে ছোট গ্রাম। আর 'ডিহা' হলো বড় গ্রাম।

অন্ত শব্দে 'দা' দিয়ে অনেক নামকরণ হয়েছে যেমন শিয়ালদা। দা এবং দহ শব্দের একই অর্থ, অষ্ট্রিক ভাষায় 'দা' শব্দের অর্থ হলো 'জল'।

কলকাতার মধ্যে এবং লাগোয়া গ্রামগুলিতে কলকাতা ছাড়া অনেকগুলি পরগনার নাম পাচ্ছি, যেমন—পাইকর, পাইকান, মানপুর, আমিরাবাদ নামকরণে কিছু শব্দ পেয়েছি কিসমৎ, খাস, টোলা, টুলি।

'পাইকান' শব্দটি এসেছে 'পাইক'-এর কাজ কারার সতে ভরণপোষণের জন্য 'ছাড়' দেওয়া জমি থেকে, আর 'পাইকর' শব্দটির 'পাই' মানে শাখানদী, 'কর' অর্থে নদীতীর। নদী তীরবর্তী প্রস্তরময় স্থান হলো 'পাইকর'।

❑ **আলিপুর** — ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলে, প্রাণভয়ে এবং নবাব সেনা লুট করে নেবে এই ভাবনায় ইংরেজরা কলকাতা ছেড়ে ফলতায় পালিয়ে যায়। নবাব কলকাতা জয় করে দাদু আলিবর্দী খাঁর নামকে স্মরণীয় করে রাখতে কলকাতার নামকরণ করলেন 'আলিপুর'।

প্রায় সকলেই এই মতে বিশ্বাসী। এক আধ জন বলেছেন, মীর জাফর 'আলী' খাঁ, নবাব হবার পর নিজের নামে 'আলীপুর' নামকরণ করেন। মতটি তেমন জোরালো নয়।

আলিবর্দীর নামে 'আলিপুর' নামকরণের ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন ওঠানো যেতে পারে, বাংলার নবাবের প্রিয় দাদুর নামে যখন আলিপুর তখন কলকাতার প্রাণকেন্দ্রের নাম আলিপুর নাম পেল না কেন? কেন কলকাতার একটি অঞ্চলে ছোট্ট একটি জায়গার নাম আলিপুর হল? কেউ প্রশ্ন তোলেন, অন্য কেউ তুলতোও না—যদি বীরভূমের এক বীরের নাম এর সঙ্গে যুক্ত

১. বীরভূম রাজবংশ (পৃ. ১০৬) মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ১৩১৬ সাল।
২. বাংলা স্থান নাম পৃ. ৫৩।
৩. কলিকাতার কাহিনী পৃ. ৪০। ৪. তদেব পৃ ৫১

না হতো। বাদি ওজ্জমান খাঁ বীরভূমের শাসন ক্ষমতা হাতে নেন ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আলিনকি খাঁ প্রচণ্ড সাহসী যুবক ছিলেন। অনেক পরের কথা, একবার রাজকার্যে মুর্শিদাবাদে এসে আহম্মদ ওজ্জমান খাঁ এবং তঁরা ভাই আলিনকি খাঁ নমাজ পড়ছেন, হঠাৎ নবাবের একটি হাতি ওরা যেখানে নমাজ পড়ছিল সেই দিকে ছুটতে থাকে। অবস্থা আয়ত্বের বাইরে দেখে মাহুত চিৎকার করছে, দেখতে দেখতে হাতী আলিনকিকে শুঁড় দিয়ে আঘাত করে। মাটি থেকে উঠে আলিনকি হাতিকে এমন ভাবে আঘাত করলো যে, হাতি প্রচণ্ড চিৎকারে মাটিতে পড়ে গেল। আলিনকির বীরত্বের খবর পৌঁছে গেল নবাব আলিবর্দীর কানে। বীরত্বের পুরস্কার নবাব সরকারে আলিনকি সৈনিকের কাজে ঢুকে পড়েন। বিভিন্ন যুদ্ধে অসামান্য বুদ্ধির কৌশল ও সাহসের পরিচয় পেয়ে, নবাব জায়গীর দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আলিনকি তা নেন নি। শোনা যায়, নবাব আলিবর্দী খাঁ বীরভূমের রাজপুত্র আলিনকিকে তিন দিনের জন্য মুর্শিদাবাদের রাজসিংহাসনে বসার অধিকার দিয়েছিলেন।

নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর সময় আলিনকি খাঁ নবাবের একটি বাহিনীর সোনাপতি ছিলেন। সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করেন তখন, আলিনকি খাঁ, আহম্মদ ওজ্জমান খাঁ, দেওয়ান মানিকচাঁদ, মোহনলাল এবং জাফর আলি খাঁ—পাঁচ দিকে পাঁচটি বাহিনীর প্রধানের পদ দিয়েছিলেন। আলিপুরের দিকে সৈন্য বাহিনী নিয়ে আলিনকি খাঁ কলকাতা অবরোধ করেন। সিরাজ কলকাতা অধিকার করে আলিনকি খাঁকে কলকাতা লুট করার নির্দেশ দেন। নবাবের আদশে অনুসারে আলিনকি কলকাতা লুঠ করে। বহু লুটের জিনিষ নবাব আলিনকিকে দিয়েছিলেন। আলিনকি সেই লুটের কাপড় বীরভূমে দিয়েছিলেন মহরমের অনুষ্ঠানে। বীরত্বের নিদর্শন রূপে কলকাতা 'লুটের কাপড়' মহরমের তাজিয়ার সঙ্গে বের করা হতো। আলিনকির বীরত্বে নবাব সিরাজদ্দৌলা খুশী হয়ে যে দিক থেকে আলিনকি কলকাতা অবরোধ করে ছিল, সেই দিকের স্থান নাম পাল্টে 'আলিনগর'। পরে স্থানটি 'আলিপুর' নামে পরিচিত হয়। নবাব সিরাজদ্দৌলাই আলিনগর নামকরণ করেন, তবে তাঁর দাদুর নামে নয়—সেনাপতির নামে।[১]

❑ **আহিরীটোলা** — ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ম্যাপে আহিরীটোলা ঘাটের নাম পাওযা যাচ্ছে। আহির/ আহীর শব্দটি সংস্কৃত 'গভীর' শব্দ থেকে এসেছে। অর্থ হলো বাথানের মালিক, প্রাচীন কলকাতায় উত্তর ভারত থেকে কিছু বাথানের মালিক বা 'আহীর' এসে এখানে বসবাস শুরু করে। আহিরীদের 'টোলা' বা অস্থায়ী দোকান বাড়ি থেকে আহিরীটোলা নামটি হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন, আহিরীটোলা নামকরণ বিষয়ে অন্য একটি মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে—'আহিরিটোলো (= আর্থিড় +), মানে যারা পাখী ধরে অথবা পশু শিকার করে তা বসে বিক্রি করে, তাদের দোকান সারি।[১] আবার অন্য একটি গ্রন্থে তিনি জানিয়েছেন, 'আহিরী মানে এখানে শিকারী অর্থাৎ জলদস্যু বা চোরাই ব্যবসাদার।'[২]

❑ **ইটালি** — এই অঞ্চল এক সময় সুন্দর বনের মধ্যে ছিল। সমুদ্রের নোনো জলের মাঝ

থেকে জেগে ওঠা দ্বীপে নোনাগাছ জন্মালো সুন্দরী, হেঁতাল, বাইন ইত্যাদি। বড় বড় কাঁটা যুক্ত হিন্তাল বা হেঁতালের জঙ্গল ছিল এক সময়, হরিণের লোভে বাঘ এসে লুকিয়ে থাকতো হিন্তালের জঙ্গলে। এই হিন্তালী, জনবসতির পর ইন্তালী এবং পরে লোকমুখে এন্টালি হয়।

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন অন্য একটি মত দিয়েছেন। তাঁর মতে 'এন্টালি নামটি এসেছে ইটটালি থেকে। অনুমান করি এখানে কলিকাতা শহরের বাড়ি করার জন্য ইট ও টালির আড়ত ছিল।'[৫] এই ইট + টালি থেকেই ইটালি বা ইন্টালি হয়েছে।

❒ **আমড়াগলি** — গ্রাম কলকাতায় বিভিন্ন গাছ থেকে স্থান নাম হয়েছে, আমড়া গাছের তলা থেকে আমড়াতলা, পরে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন রাস্তাও তৈরি হয়েছে। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আমড়াতলায় গলি হয়ে গেছে বলেই নাম হয়েছে 'আমড়া গলি' এখানে একটি থানা হয়েছিল।

❒ **আমিরাবাদ** — একটি পরগনার নাম। গ্রাম নামে অন্তপদে 'বাদ' শব্দে যুক্ত এই নাম। আমির /আমীর শব্দের অর্থ বড়লোক। যে আমীর কোন জমিদারী ভোগ করছিলেন, কোন কারণে তাঁকে ঐ জামিদারী থেকে 'বাদ' দেওয়া হয়—এই অর্থে স্থান নাম 'আমিরাবাদ'।

❒ **কাঁকুড়গাছি** — কাঁকুড় ফল থেকে গাছ অর্থে গাছি শব্দ যুক্ত হয়ে কাঁকুড়গাছি হয়েছে। অন্য আরএকটি মত রয়েছে, মাগধী প্রাকৃত 'গ্রৎস' শব্দ থেকে গাছি বা গাছ শব্দটি এসেছে। এর অর্থ হলো 'যে নড়াচড়া করে না'। কাঁকড় বা কংকর যুক্ত মাটিতে যে গাছ হয় তাকে লোকে কাঁকড়গাছি বা কাঁকুড়গাছিয়া 'গাছিয়া' শব্দটি এভাবেই এসেছে, যেমন বেল গাছিয়া।

❒ **কসাইটোলা** — বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের কাছে 'কসাই' অর্থাৎ মাংস বিক্রেতাদের 'টোলা বা পাড়া কসাই পাড়া

❒ **কাঁসারীপাড়া** — কাংস্য বণিকদের ব্যবসা ও বাস করার পাড়া। এরা কাঁসার জিনিষ তৈরি ও বিক্রি করতো, কাঁসারীদের পাড়া 'কাঁসারীপাড়া'

❒ **কতমা** — 'কতমা' পদবীটি তাঁতিদের, 'কতম' পদবীর তাঁতীদের নিজস্ব গঙ্গার ঘাটের নাম ছিল কতমার ঘাট।

❒ **কলিঙ্গা** — কারো কারো মতে, যেখানে কলিঙ্গের লোক বা উড়িষ্যার মানুষ বসবাস ছিল সেই স্থান কলিঙ্গা; 'কলিঙ্গা'—লোকমুখে 'কলিনগা' হয়েছে। অন্যমতে, কুলিনদের গাঁ থেকে কুলিনগাঁ হয়েছে এবং কুলিনগাঁ বিকৃত হয়ে কলিঙ্গা নাম পেয়েছে। এস কুলিন পরে 'কলিন' নাম পেয়ে কলিন লেন' ও 'কলিন স্ট্রীট' (ওয়ার্ড ৫২, ৬২) নামের মধ্যে বেঁচে রয়েছে।

❒ **কলাবাগান** — কলকাতায় কলাবাগান রয়েছে চারটি। একটি বাগবাজারে, একটি মেছুয়াবাজারে, একটি প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে এবং বেলেঘাটায়। কলাগাছের বাগান থেকে নাম 'কলাবাগান'।

❒ **কলুটোলা** — কলুদের পাড়া বা টোলা থেকে কলুটোলা। কলুটোলা লেনের নামের মধ্যে পুরনো পাড়ার নামটি খুঁজে পাওয়া যায়।

❐ **কুমোর পাড়া** — কুমোরদের পাড়া থেকে এই নাম, অঞ্চলটি ছিল শিয়ালদার কাছে।

❐ **কাঁটাপুকুর** — বাগবাজার অঞ্চলে ছিল। ঐ অঞ্চলের প্রয়োজনে একটি পুকুর কাটানো হয়েছিল বলে 'কাটা-পুকুর' নাম হয়। অন্য মতে, একবার ঐ অঞ্চলে মহামারী দেখা দিলে, পানীয় জলের প্রয়োজনে পুকুরে ছিল রোগীদের কাপড়চোপড় ধোয়া নিষেধ করা হয়, কথা না শুনলে কাঁটা গাছ ফেলে সাময়িক ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে নাম হয় 'কাঁটা পুকুর'। কেউ কেউ বলেন, এই পুকুরের পাড়ে প্রচুর কাঁটা গাছের ঝোপ ছিল বলে নাম হয় 'কাঁটাপুকুর'।

❐ **কাপাসডাঙ্গা** — সিমলা অঞ্চলের একটি অংশ। কাপাস তুলোর ডাঙ্গা থেকে নাম কাপাস-ডাঙ্গা।

❐ **কসবা** — 'কসবা' ফারসী শব্দ, মানে কেনাবেচার জন্য বড় রকমের গ্রাম বা কেন্দ্র।

❐ **কাওড়া পাড়া** — চিৎপুর ব্রিজের ধারে, কাওড়া পদবী ধারী পালকী বেহারাদের পাড়া 'কাওড়া পাড়া'।

❐ **কাজিপাড়া** — তারাতলায় এবং উল্টোডাঙ্গায় 'কাজিপাড়া' রয়েছে। নবাবী আমলে বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কাজি সাহেবের (কাজী-উল-কোজাৎ অর্থাৎ chief Justice) পরিবার, আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে তৈরী পাড়া 'কাজীপাড়া'। উল্টোডাঙ্গার কাজিপাড়া 'কাগজি পাড়া' থেকে হয়েছে বলে জানা যায়। এখানে বাঙ্গালী কাগজ প্রস্তুতকারকদের বাস ছিল।

❐ **কাপালিটোলা** — তুকতাক, জড়িবুটি ওষুধ বিক্রেতা তান্ত্রিক কাপালিদের 'টোলা' বা পাড়া।

❐ **কামারডাঙ্গা** — কামারদের বসতিপূর্ণ ডাঙ্গা, কামারডাঙ্গা পাড়াটি এণ্টালিতে ছিল।

❐ **কালীঘাট** — সতী অঙ্গ পড়ায় ৫১ পীঠের এক পীঠ হলো কালীঘাট। কালীদেবীর মন্দিরের গা ঘেসে তখন গঙ্গা বয়ে যেতো, সমুদ্রযাত্রার বণিকগণ এই মায়ের ঘাটে নেমে পূজো দিয়ে তবে নৌকো ছাড়তেন। মাঝিদের মুখে ময়ের মন্দিরের সামনের ঘাট নাম পায় 'কালীঘাট' রূপে।

❐ **কাশীপুর** — 'কাশ' ধাতু অর্থ চকচক করা। বাণিজ্যের জন্য বরাহনগর তখন বিখ্যাত, বাণিজ্যের কারণে স্বচ্ছল পুর বা চকচক করা 'পুর' হলো কাশীপুর। অন্যমতে, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীজোড়ার দামোদর দাস বর্ম্মার পূর্বপুরুষ কাশীনাথ বর্মার নামানুসারে 'কাশীপুর' নাম হয়েছে।[১]

❐ **কুমোরটুলি** — কুম্ভকার বা কুমোরদের টুলি বা পাড়া কুমোরটুলি।

❐ **কম্বুলেটোলা** — যারা কম্বল তৈরী বা বেচাকেনা করেন তাদের টোলা বা বসতি স্থান

---

১ কলিকাতাস্থ তন্তু-বণিক জাতির ইতিহাস (পৃ. ৩৯) নগেন্দ্রনাথ শেঠ।

কম্বুলেটোলা। এখানে কম্বলিয়া বা কম্বুলে বানানে ও বেচনেওয়ালারা ভেড়ার লোমে মোটা রুক্ষ কম্বল, কম্বলের আসন তৈরী ও বিক্রি করতো। শ্যামবাজার অঞ্চলে এই পাড়াটি ছিল।

❒ **কামরাঙাতলা** — অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জী লেনই হলো পুরনো কামরাঙা তলা। কামরাঙা গাছের তলা থেকে এই নাম।

❒ **চড়কডাঙ্গা** — যে জমিতে বা ডাঙ্গায় চড়কের মেলা হত।

❒ **চাঁপাতলা** — শ্রদ্ধানন্দ পার্কেরকাছে চাঁপাতলা, চাঁপাগাছের তলা থেকে এই নাম।

❒ **চারাবাগান** — বিভিন্ন জায়গায় ফুলের ও ফলের গাছ বিক্রি করার জন্য, যে বাগান থেকে চারা তৈরী করা হয়, সেই বাগান চারা বাগান। বেলাঘাটা অঞ্চলে এই বাগানটি অবস্থিত।

❒ **চালতা বাগান** — চালতা গাছ যে বাগানে বেশী আছে বা শুধু চালতাগাছের বাগান।

❒ **চাষধোপা পাড়া** — চাষা আর ধোপা এক সঙ্গে যে পাড়ায় ছিল, সেই পাড়া।

❒ **চিংড়ি ঘাটা** — বেলেঘাটায় যে ঘাটে শুধু চিংড়ি মাছ নামানো হত বিক্রি করার জন্য। পাশে চিংড়ি মাছের হাট তাই নাম চিংড়ি হাটা।

❒ **ঘুঘুডাঙ্গা** — 'ডাঙ্গা' অর্থে উচ্চভূমি। কোন এক সময় লবন হ্রদের জলা অঞ্চলের পাশেই ছিল যে ডাঙ্গা, সেই ডাঙ্গায় বাস করতো 'ঘুঘু' পদবীর কিছু মানুষ। ছোট ডিঙ্গি নৌকোর নাম হলো ঘুঘু। ঘুঘুরাই এই 'ঘুঘু ডিঙ্গি' তৈরী করতেন। সেই সূত্রেই ঘুঘুডিঙ্গি বা ঘুঘুডাঙ্গা। কেউ কেউ বলেন, এস্ ডাঙ্গাতে 'ঘুঘু' পাখী চইতো বলে ডাঙ্গার নাম হয় 'ঘুঘুডাঙ্গা'। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণপদ গোস্বামী জানিয়েছেন 'ঘুঘুডাঙ্গা শব্দটি অনার্য ভাষা থেকে এসেছে'।

❒ **ঘোষবাগান** — কলকাতার বহু জায়গায় 'ঘোষবাগান' রয়েছে, ঘোষ পদবীধারী মানুষের বাগান।

❒ **চক্রবর্তী পাড়া** — বাগবাজার অঞ্চলে চক্রবর্তী পদবীধারী মানুষের পাড়া চক্রবর্তী পাড়া।

❒ **চক্রবেড়ে** — চক্র-চাকার মতো, বেড়ে বেষ্টন করে রয়েছে। যে জায়গা চক্রের আকারে চারিদিক গাছপালা দিয়ে বেড় বা বেড়া দেওয়া রয়েছে।

❒ **ছুতোর পাড়া** — ছুতোরদের পাড়া। বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের ওখানে এই পাড়াটি ছিল।

❒ **জেলেপাড়া** — জেলেদের পাড়া।

❒ **জোড়াতলাও** — জোড়া পুকুর থেকে হিন্দি উচ্চারণে 'জোড়াতলাও'। 'তলাও' মানে পুকুর বা জলাশয়।

❒ **জোড়াসাঁকো** — পাশাপাশি দুটো সাঁকো থেকে এই নামকরণ।

❒ **ঝামাপুকুর** — ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের কাগজপত্রে জানা যায় এই অঞ্চলের পুকুর গুলি দূষিত

---

১. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৫৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা (পৃ. ২৮২)।

জলে পূর্ণ ছিল। জলের দোষ নিবারণের জন্য পুকুরে ঝামা ইট ফেলা হয়েছিল বলে নাম হয় 'ঝামাপুকুর'।

❐ **ট্যাংরা** — যে জলাশয়ে ট্যাংরা মাছ পাওয়া যেত বেশী—সেই সূত্রে ট্যাংরা।

❐ **টালা** — Mr. Tulloh নামে নিলামওয়ালা সাহেবের নাম হতে স্থানের নাম টালা হয়েছে।

❐ **চোরবাগান** — চোর ডাকাতের জন্য এই অঞ্চল দিয়ে মানুষ যেতে চাইতো না, জায়গাটি নির্দিষ্ট করার জন্যই ঐ নামকরণ।

❐ **হেদুয়া** — হেদো শব্দটি হ্রদ শব্দের অপভ্রংশ থেকে এসেছে।

❐ **হাটখোলা** — শোভাবাজারের পশ্চিমে গঙ্গাতীরে খোলা আকাশের নীচে যে হাট বসতো তার নাম 'হাটখোলা'।

❐ **দমদম** — নামটির অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব বলে মনে করেছেন শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণপদ গোস্বামী।[১]

❐ **হালসি বাগান** — হাল্‌সি সাহেবের নামানুসারে তাঁর বাগান অঞ্চলের নাম হয় 'হালসিবাগান'।

❐ **হোগলকুঁকুড়িয়া** — হাতিবাগানের দক্ষিণ ও পশ্চিমে ছিল বিরাট হোগলার বন। হোগলা বনের পাতা দিয়ে কুড়ে ঘরের ছাউনী ছিল বলে নাম 'হোগল কুঁড়িয়া'। ১৭৫২ খ্রীঃ হলওয়েল সাহেব হোগকুঁড়িয়ার নামের উল্লেখ করেছেন। মারাঠা ডিচ খনন করার সময় এই হোগল বন কেটে পরিষ্কার করে ফেলা হয়। তখন এখানে মুসলমানদের গোরস্থান ছিল।

❐ **সিকদার বাগান** — হোগলকুঁড়িয়ার উত্তরপূর্ব কোনে সিকদার উপাধীধারী কোন পরিবারের বাগান বাড়ি ছিল, তাই ঐ স্থানের নাম হল 'সিকদার বাগান'।

❐ **বালাখানা** — দর্জিপাড়ার উত্তরে 'বালাখানা' নামে ছোট একটি পল্লী ছিল। বালাখানা অর্থে মুসলমান সৈন্যদের দীর্ঘ গৃহশ্রেণী বা ব্যারাক। গ্রে স্ট্রীটকে আগে বালা-খানার রাস্তা বলতো।

❐ **নিকারী পাড়া** — মাৎস বা নাবিক ব্যবসায়ী বাঙ্গালী মুসলমানদের নিকারী বলে। বাগবাজারের উত্তরপূর্ব অংশে একটি পাড়াতে এদের বাস ছিল বলে এই স্থানের নাম নিকারী পাড়া হয়।

❐ **মোহনবাগান** — গোপীমোহন দেবকে লোকে 'মোহন বাবু' বলে ডাকতেন। তাঁর বিরাট সুন্দর বাগান ছিল বলে এই স্থানের নাম 'মোহনবাগান' হয়েছে বলে মনে করা হয়'

❐ **গরাণহাটা** — গরাণ গাছের হাট থেকে এই নামকরণ।

❐ **যোড়াসাঁকো** — পাশাপাশি দুটো সাঁকো ছিল বলে 'জোড়াসাঁকো'।

❐ **পাথুরিয়াঘাটা** — অনেকে মনে করেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পাথর বাঁধান ঘাট থেকে এই নামকরণ।

❑ **হাতিবাগান** —এক মতে, নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করেন তখন আঞ্চলিক কোন জমিদারের বাগানে হাতি রেখেছিলেন, সেই থেকে এই বাগানের নাম হয় হাতিবাগান। অন্য মতে, এক বাবু এখানে একটি বাগান বাড়ি করেন, এই অঞ্চলে তখন খুব হাতিঘাস জন্মাতো। হোগলা হলো এই হাতি জাতীয় ঘাস। হাতিঘাসের জন্য বাবু বাগানে তেমন কোন গাছের যত্ন নিতে পারেননি, তাই লোকে ব্যঙ্গ করে বলতো 'হাতিবাগান'। কেউ কেউ মনে করেন, এখানে হাতি পদবীধারী কোন পরিবারের বাগান ছিল বলে মন হয় হাতিবাগান।

❑ **একডালিয়া** —এক ডেলে। এক ডাল থেকে একডালিয়া হয়েছে।

❑ **নারকেলডাঙ্গা**—সাধারণ অর্থ যে ডাঙ্গায় প্রচুর পরিমাণে নারকেল গাছ জন্মায়। নারকেলের জন্য যে ডাঙ্গা সেটাই নারকেল ডাঙ্গা। অন্য আর একটি মত রয়েছে, 'নার' মানে জল, 'কেল' শব্দের অর্থ বাইরের বাইরে খেলাধুলো করা বা দৌড়ঝাঁপ করা। মনে হয়, নদীর ঘাটে জলে খেলা করা বা নদীর পাড়ে প্রশস্ত ডাঙ্গায় খেলাধুলোর জায়গাটিই 'নারকেল ডাঙ্গা' নামে পরিচিত হয়।

❑ **গোয়াবাগান**—গোয়া অর্থে সুপারী। এই অঞ্চলে প্রচুর সুপারী গাছের বাগান ছিল বলে নাম হয় গোয়াবাগান। কেউ কেউ এখানে গো-বাগান বা গো-হাট থেকে জায়গার নাম গো-বাগান থেকে গোয়াবাগান হয়েছে বলে মনে করেন।

❑ **কলাবাগান**—চোরবাগান অঞ্চলের মধ্যে বসাকদের কলার চাষ ছিল, এই কলাবাগানের মধ্যেই ছিল বসাকদের দিঘি, এই দিঘিটি কলাবাগানের দিঘি নামেই পরিচিত ছিল। এই দিঘি ভরাট করে 'মার্কাস স্কোয়ার' তৈরি করা হয়েছে।

❑ **সুরতি বাগান**—একটি বাগানে জমিয়ে সুরতি খেলা হতো, তা থেকেই নাম 'সুরতিবাগান'।

❑ **বাদুড়বাগান**—প্রচুর বাদুড় ছিল বলে এই বাগানের নাম বাদুরবাগান।

❑ **পাথুরিয়াঘাটা**—পাতর < পত্তর = নগর। লোকমুখে পাতর পাথর হয়েছে। পাথরঘাটা, নদীর যে ঘাট থেকে শহরের শুরু—সেই ঘাট পাথর-ঘাট। শ্রদ্ধেয় রাধারমণ মিত্রের মতে হিন্দি ভাষায় 'পাথুরিয়া' মানে বেশ্যা (অহল্যা পাষাণী থেকে)। সুতরাং পাথুরিয়া ঘাট মানে বেশ্যাপল্লী বা বেশ্যার ঘাট।

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের মতে, 'পাতুর‍্যা ঘাট অর্থাৎ যে ঘাট পাথর দিয়ে বাঁধানো। এখন এ ঘাটের নাম প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাট।'

❑ **মানিকতলা**—মানিকপীরের নাম থেকে মানিকতলা হয়েছে। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন এই তথ্যটি না মেনে, এক মানিকবাবুর তলা থেকে মানিকতলা হয়েছে বলে মনে করেছেন। এই মানিকবাবু কোথায় থাকতেন, কি তার পরিচয় তা তিনি জানাননি শুধু জানিয়েছেন—'মানিকবাবুর ঘাট এখন বিলুপ্ত। এঁর নামেই কি মানিকতলা?'

❑ **বালিগঞ্জ**—'বাল' কথাটি দ্রাবিড়ে জলপ্রবাহ বোঝায়। জলপ্রবাহের তীরে বসা 'গঞ্জ' বালিগঞ্জ। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মনে করেছেন—'গঞ্জ শব্দটি ফারসী' মানে আড়ৎ।.....বালিগঞ্জের

বালি এসেছে ইংরেজী Bailey থেকে। শব্দটির মানে হল দুর্গ বা প্রাসাদের বাহিরের রক্ষী সেনা। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের বাইরের রক্ষীসৈন্যদের এইখানে বাজার ছিল।' 'বালু'+গঞ্জ থেকে বালুগঞ্জ, লোকমুখে বালিগঞ্জ।

সাধারণ অর্থ জলপ্রবাহের বালুকাবেলায় প্রতিষ্ঠিত গঞ্জ, বালু গঞ্জ বা বালিগঞ্জ।

❑ **চোরবাগান**—চোর ডাকাতের জন্য যে অঞ্চল দিয়ে সাধারণ মানুষ যেতে চাইতো না, জায়গাটি নির্দিষ্ট করার জন্য ঐ নামকরণ।

ইংরেজরা চোর বলে, চোর + ইঙ্গরাজ = চোরইঙ্গ থেকে চৌরঙ্গী হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

❑ **চৌরঙ্গী**—তিব্বতের চুরাশি মহাসিদ্ধের ইতিহাসে চৌরঙ্গীনাথ হলেন, পাল বংশের তৃতীয় রাজা দেবপালের (আঃ ৮১০-৮৫০ খ্রিঃ) পুত্র। বার বছর বয়সে তাঁর মা মারা যান।

বিমাতার চক্রান্তে, জল্লাদের হাতে যুবরাজের দুই হাত, দুই পা চারটি অঙ্গই কাটা পরে। চতুরঙ্গ কাটা যুবরাজকে নৌকো করে কালীক্ষেত্রের জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়। মহাযোগী মৎসোন্দ্রনাথ মহাতীর্থ কালীক্ষেত্রে আসার পথে জঙ্গলে চতুরঙ্গ কাটা যুবককে এক রাখাল সেবা করছে দেখতে পান। দুজনকেই মৎস্যোন্দ্রনাথ দীক্ষা দেন। দুজনেই সিদ্ধিলাভ করেন। রাখাল বালক সাধনা করেন প্রাচীন দমদম, বর্তমান বাগুইআটি কপিলনাথের আশ্রমে।চেরা অঙ্গের বা চতুরঙ্গ ছেদন করা ঐ যুবরাজ সিদ্ধি লাভের পর নাম পায় 'চৌরঙ্গীনাথ'। তাঁর নাম থেকেই চৌরঙ্গী নামকরণ হয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন, বিষ্ণুচক্রে সতীর চেরা অঙ্গ পড়ে ছিল বলে নাম হয় 'চেরাঙ্গ' পরে লোকমুখে হয় চৌরঙ্গী বা চেরাঙ্গী।

❑ **মলঙ্গা**—লবণের ব্যবসায়ীদের বাসস্থান। গ্রাম নামে অঙ্গ, অঙ্গী নদী বা জল অর্থে ভোটবর্মন ভাষা থেকে এসেছে। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন বৌবাজার ও জানবাজারের মধ্যবর্তী অঞ্চল 'মলঙ্গা'কে 'মলঙ্গ' বলেছেন। তাঁর মতে 'মলঙ্গ দেশের অর্থাৎ দ্বারভাঙ্গা নেপাল তিব্বত ও ভূটানের অধিবাসী'গণ এখানে বাস করতো বলে এই নাম।

❑ **ফড়েপুকুর**—নানা জায়গা থেকে ফলফলাদি, শাক-সব্জী প্রভৃতি নিয়ে একটি পুকুর পাড়ে ফড়েরা বিক্রিবাটা করতো, এই অস্থায়ী বাজারটি 'ফড়েপুকুর' বা 'ফড়িয়াপুকুর' নাম পেয়েছে।

❑ **পোস্তা**—ফারসী শব্দ। মানে নদীর পাকা বাঁধ অর্থাৎ গঙ্গা তীরবর্তী মাল নামানোর স্থান।

❑ **পাতিপুকুর**—পাঁতি শব্দটি তদ্ভব। মূল সংস্কৃত শব্দটি হলো পংক্তি/পঙক্তি। 'পক্তি' মানে লাইন বা কাতার। লাইন দিয়ে কাটা পুকুর পাতিপুকুর। অন্য মতে, 'পাতি' শব্দের অর্থ প্রভু। প্রভু বা জমিদারের কাটা পুকুর 'পাতিপুকুর'।

'কিসমৎ' শব্দের অর্থ ভাগ্য। জমিজমা বিষয়ে বড় কোন হিস্যা থেকে পৃথক হওয়া ছোট হিস্যাকে বোঝায়। আর 'খাস' জমি হলো নবাব সরকার বা জমিদারের কর্তৃত্বাধীন জমি। অন্তপদে 'তলা' বা 'তলি' শব্দে কোন বড় গাছের নীচের জায়গাকে বোঝায়।

❒ **ঠনঠনিয়া**—শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণপদ গোস্বামী 'ঠনঠনিয়া' শব্দটি অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে বলে মনে করেছেন। ঠনঠনে শব্দে শুকনো ডাঙ্গা ও বসতিহীন জায়গা বুঝেছেন কেউ কেউ। অনেকের মতে 'ঠনঠনে' মানে বাজিকরের স্থান।

❒ **রসা**—অনুর্বর শুষ্ক জমি।

❒ **পোস্তা**—উর্দ্ধ 'মণ্ডী'র খাঁটি বাংলা 'পোস্তা', মার্কেটিং সেন্টার।

❒ **ঢাকুরিয়া**—নিম্নভূমির কারণে যেখানে বর্ষার জলের ঢেউ এসে পৌঁছয়।

❒ **মলঙ্গা**—সুন্দরবনের মজুর।

❒ **গোয়ালটুলি**—কলকাতায় গোয়ালাদের কেন্দ্র করে গোয়ালপাড়া, গোয়ালাপুকুর নামে পাড়াগুলি তৈরি হয়েছিল একসময়।

❒ **গৌড়ীবেড়িয়া**—স্থান নামে বেড়ে/বেড়িয়া/বেড়্যা শব্দগুলি জনবসতির চারিদিকে গাছপালার বেষ্টন বা আধিক্যকে বোঝায়। বেড়িয়ার কথ্যরূপ হলো 'বেড়ে' বা 'বেড়্যা'। 'বাট' সংস্কৃত 'বাটী' অর্থাৎ আবৃত স্থান বা ঘেরা জায়গা, আর 'বাট' হলো প্রাচীর। প্রাচীর বেষ্টিত বাট ও বাটী দুটোই হতে পারে। বাটী থেকে বাড়ি হয়েছে, যেখানে প্রাচীর ঘেরা বাড়ি আছে। সেই জায়গা আবার বাড়িয়া বা বাড়ীয়া নামে, লোকমুখে সম্ভবত বেড়িয়া হয়েছে। গাছপালায় ঘেরা কোন গৌরীর বাড়ি জানা যায় না, তবে গৌরীর বাড়ি থেকেই এই নাম।

❒ **গুড়ের মার পুকুর** —মনে হয়, 'গুড়ের মা' বিকৃত শব্দ। নামটি সম্ভবত গুড়িয়ার মা, গুড়িয়া—হিন্দিতে শিশু সন্তান, শিশু সন্তানের মা—গুড়িয়ার মা, মনে হয় এই মায়ের পুকুরে যারা যেতেন তারা বলতেন 'গুড়িয়া মার পুকুর'। এই গুড়িয়া মা বিকৃত হয়ে গুড়ের মা হয়েছে।

❒ **গুলপাড়া**—ওয়েভারলি লেনে ছিল 'গুল পাডা'। গুল বা মিচ।

❒ **গোয়াবাগান**—সুপারী বাগান থেকে এই নাম।

❒ **গড়িয়া**—যে জায়গায় জল দাঁড়ায় না। জমি গড়ানো থাকায় অর্থাৎ একদিকে ঢালু থাকায় জল গড়িয়ে পড়ে যায় বলে নাম 'গড়িয়া'। কেউ কেউ গড়বন্দি স্থান বলে 'গড়ে' বা গড়িয়া হয়েছে মনে করেন।

'গড়' শব্দে দ্রাবিড় ও হ্যামিটো-সেমিটিকে বৃষ্টি, ছোট নদী বা নদীতীর বোঝায়— এই সূত্রেই গড়িয়া। অন্য মতে, যে স্থান গড়ে অর্থাৎ গড়ানো বা গড়বন্দী বা ডোবার মতো সেই স্থানই গড়িয়া।

❒ **গড়িয়াহাট**—নদীতীরে হাট গড়িয়াহাট।

❒ **গড়পার**—'গড়্' + 'অচ' প্রত্যয় করে গড়। মানে চলার বাধা (যেমন গড় গড়িয়ে চলা)। অন্য অর্থে, মানুষ, চোর, পশুর আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচাতে যে বেড়া দেওয়া হয় তাকে গড় বলে। এই 'গড়' বা বেড়ার পারে বসতিকেই 'গড়পার' বলা হয়েছে। অনেকে মনে করেন, 'গড় খাই' বেষ্টিত স্থানের পাড় থেকে গড়পাড় হয়েছে।

❒ **গড়ানহাটা**—গড়ান গাছের কাঠ যে হাটে বিক্রি করা হতো। 'গড়ান' শব্দটি এসেছে 'গর' থেকে, এর অর্থ নুনে বিষ বা নোনতা বিষ। যে নোনতা মাটিতে বেশি গাছ ভাল হয় সেই গাছ 'গরান' গাছ।

❒ **কেরানীবাগান**—রাইটার্স বিল্ডিং হলো কেরানীদের কর্মস্থল। কর্মস্থলের কাছাকাছি থাকতে না পারলে সঠিক সময়ে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বেশ কিছু কেরানী নিজেদের উদ্যোগে বহু বাজার অঞ্চলে কোন বাগানে কুঁড়ে ঘর তৈরি করে থাকা শুরু করে। লোকমুখে ঐ বাগান 'কেরানীবাগান' নাম পায়।

❒ **কড়েয়া**—কড়েয়া বা কড়ায়া শব্দটি সংস্কৃত কটিক বা দর্মার তৈরি কুটির থেকে এসেছে। এখানে নিম্নশ্রেণীর ফিরিঙ্গি ও মুসলমান বারবনিতাদের বসতি ছিল।

অন্যমতে, 'কট' মানে জংলি আর 'আড়া' মানে বাঁধ বা উঁচু আশ্রয়ের জায়গা। 'কট' + 'আড়' = কড়েয়া হয়েছে, অর্থ হলো জংলি জলা জায়গার মধ্যে উঁচু বাসযোগ্য বা আশ্রয়স্থল।

❒ **চেতলা** —'চেতলা' লৌকিক ভাষায় নীচু জিনিষ, যেমন চেতলা বা চেতনা থানা। নীচু জায়গা থেকে এই নামকরণ। কেউ কেউ 'চিতলে চিত্রলক রাংচিতা গাছ' থেকে চিতলা বা চেতলা হয়েছে মনে করেন।

❒ **টালা**—উঁচু বসতি ভূমিকে টালা বলে, কিন্তু কলকাতার টালা নীলামওয়ালা টালা সাহেবের নাম থেকে হয়েছে।

❒ **পাটুলি**—যেখানে পাট চাষ হয় এবং উলু খড় প্রচুর রয়েছে সেই জায়গাকে বলা হয় পাট + উলু বা পাট + উলি থেকে পাটুলি।

❒ **মুচিবাজার**—অথবা, কোন মুচির তৈরি বাজার। মুচি বাজারের অন্য আর একটি অর্থ আছে, বাংলায় ফুল অর্থে একসময় 'মোচা' ও 'মুচি' শব্দগুলি ব্যবহৃত হতো। কলার বড় ফুল 'মোচা' আর নারকেলের ছোট ফুল 'মুচি'। কাঁঠালের ফুলকেও 'মুচি' বলে, সুতরাং এই বাজারটি বিশেষ ধরনের বাজার বলেই মনে হয়।

❒ **হোগলকুড়িয়া**—হোগলা বনের কুঁড়ে ঘরের শ্রেণী থেকে নাম 'হোগলকুড়িয়া'। শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে তেলেগু 'কোণ্ড' থেকে বাংলা 'কুঁড়' শব্দটি এসেছে। অর্থ হলো স্তূপ, একত্রিত পদার্থ, গোবরগাদা। এ থেকে মনে হয় হোগলা পাতায় ঘেরা গোবর গাদা 'কুড়'-থেকে 'হোগলাকুড়ে' হয়ে থাকতে পারে। কারো কারো মতে, 'কুঁড়' শব্দের অর্থ হলো জলাভূমি বা সিক্ত এলাকা। জলাভূমিতে হোগলার বন থেকেই 'হোগলকুঁড়ে' হয়েছে। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে, সংস্কৃত 'কূল' শব্দ থেকে 'কুড়' শব্দটি এসেছে, এর অর্থ স্তূপ। হোগলা বন এত ঘন এবং উঁচু ছিল, দেখলে মনে হতো স্তূপ হয়ে আছে, লোকে তাই বলতো হোগলকুড়ে।

❒ **শোভাবাজার** — রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে কায়স্থদের বিরাট সমবেত মহতী সভা হয়। বিশৃঙ্খল এই সভা বাজারে পরিণত হয়েছিল বলে নাম হয়ে যায় 'সভাবাজার' সেই 'সভাবাজার' লোক মুখে শোভাবাজার হয়।

অন্য মতে, এই শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করেই, মাতৃ-শ্রাদ্ধে সাধারণ মানুষের ভীড়ের জন্য ওখানেই বাজার বসিয়ে দেওয়া হয়, সভার জন্য বাজার তাই 'সভা বাজার'। এই অনুষ্ঠানের অনেক আগে থেকে 'শোভাবাজার' নামটি প্রচলিত ছিল বলে মহারাজার মাতৃ শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে এর নামকরণ হয়েছিল বলে মনে হয় না।

শোভারাম বসাক এখানে একটি বাজার করেছিলেন বলে বাজারের নাম হয়েছিল 'শোভারাম বাজার', কিন্তু লোকমুখে হয়ে যায় 'শোভাবাজার'।

আসলে কলকাতার ফৌজদার সুবাদারের নামে নবাবী বাজার চালু করেছিলেন, এই কারণে বাজারের নাম হয়েছিল 'সুবাহ্ বাজার' বা 'সুবা বাজার', লোকমুখে 'সুবা বাজার পরে 'শোবাবাজার' বা 'শোভাবাজার' হয়।

❒ **টিকেপাড়া** — পুরনো কলকাতায় জনপ্রিয় হুকোর জন্য বিশেষ প্রয়োজনে 'টিকে' তৈরির পাড়া হয়ে গিয়েছিল।

❒ **ডালিমতলা** — ডালিমগাছের তলা থেকে এই নাম,

❒ **ডোমতলা** — ডোমদের তলাও বা পুকুর থেকে ডোমতলাও লোকমুখে 'ডোমতলা' হয়,

❒ **ডোমপাড়া** — ডোমদের পাড়া।

❒ **জেলেপাড়া** — মৎসজীবী ধীবরদের বাসস্থান থেকে 'জেলে পাড়া' ও 'জেলে টোলা' নাম হয়েছে।

❒ **শাঁখারী টোলা** — শঙ্খবণিকদের বাসস্থান এবং শাঁখা কাটার পাড়া বলে 'শাখারীটোলা'।

❒ **হাড়কাটা** — চিরুনী, কৌটো, খেলার পাশা প্রভৃতি হাড় কেটে তৈরী করা হতো যে পাড়ায় তার নামই 'হাড়কাটা'।

❒ **ছাতাওয়ালা গলি** — এখনকার মতো আগে কাপড়ের ছাতা ছিল না, বড় বন গোলপাতা দিয়ে তৈরী হতো বিরাট বিরাট ছাতা। এই ছাতা যেখানে তৈরী হতো সেই স্থান 'ছাতাওয়ালা গলি'।

❒ **দরমাহাটা** — দরমা বিক্রির হাট থেকে 'দরমাহাটা'।

❒ **দয়েহাটা** — দই বা দধির হাট থেকে দয়ে হাটা।

❒ **মুরগীহাটা** — মুরগীর হাটের জন্য নাম 'মুরগী হাটা'।

❒ **মেছোবাজার** — মাছের বাজার থেকে 'মেছো বাজার' নামকরণ।

যে নামে পাড়া ছিল

উনিশ শতকের কলকাতায় কোন স্থান কোন অঞ্চলে ছিল, তা খুঁজে বার করা কঠিন। কলকাতার স্থান নামের ইতিহাস রচনায় সেই তথ্যের গুরুত্ব অনেক। সেকালের সংবাদপত্রে নীলামে জমি বিক্রির বিজ্ঞাপন থেকে সেই তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব, কিছু উদাহরণ—

চব্বিশ পরগনার টালা —	২৫	আপ্রিল	১৮৩৫
সুতানুটির পাতুরিয়া ঘাটা —	২৫শে	আপ্রিল	১৮৩৫
সুতানুটিতে বেনিয়াটোলার গলি —	৯	১৮৩৫	
সুতানুটির বাগবাজার —	৯	১৮৩৫	
সুতানুটির শ্যামবাজার —	৯	১৮৩৫	
সুতানুটিতে কুমার টুলি —	২৩	১৮৩৫	
সুতানুটির চড়ক ডাঙ্গা —	২০	১৮৩৫	
সুতানুটি যোড়া শাঁকো —	৪	জুলাই	১৮৩৫
সুতানুটিতে নাথের বাগান —	১১	জুলাই	১৮৩৫
সুতানুটিতে যোড়াবাগান —	১	আগস্ট	১৮৩৫
বড়বাজারের পোস্তা —	৯	মে	১৮৩৫
বড় বাজারের দরমাহাটা —	৩০	মে	১৮৩৫
বড় বাজারের বাঁশতলা —	১১	জুলাই	১৮৩৫
বড় বাজারের বটতলা —	১৮	জুলাই	১৮৩৫
মলঙ্গার সেকরা পাড়ার গলি —	১৮	জুলাই	১৮৩৫
মলঙ্গার দুর্গাচরণ চক্রবর্তীর গলি —	১৮	জুলাই	১৮৩৫
মলঙ্গার বহু বাজার —	১৮	জুলাই	১৮৩৫
মলঙ্গার মেহেদি বাগান —	২৮	নভেম্বর	১৮৩৫
মলঙ্গার কাড়ো দাসের গলি —	৮	আগস্ট	১৮৩৫
কলিকাতার শহরতলীতে শ্যামবাজার —	১৬	মে	১৮৩৫
কলিঙ্গার মেন্দিবাগান —	১৬	মে	১৮৩৫
মৌজা সুতানুটিতে বাগবাজার —	২৩	মে	১৮৩৫
ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের পাইক পাড়া —	২৩	মে	১৮৩৫
পাতরিয়া ঘাটার মণ্ডলের রাস্তা —	৩০	মে	১৮৩৫
চব্বিশ পরগনার বাঘমারি —	৩০	মে	১৮৩৫

কসাইটোলার এমামবাড়ীর গলি —	১৩	জুন	১৮৩৫
চৌরঙ্গীতে বামনবস্তি —	২৮	নবেম্বর	১৮৩৫
চৌরঙ্গীর যোড়াতলাওর গলি —	১	আগস্ট	১৮৩৫
যোসপুর পরগনার চক্ররেড়ে —	৭	নবেম্বর	১৮৩৫
আড়পুলিতে ঝামাপুকুর —	৭	নবেম্বর	১৮৩৫
মাগুরা পরগনার দক্ষিণেশ্বর —	২১	নবেম্বর	১৮৩৫

স্থান নামের ইতিহাসে বানানের একটি গুরুত্ব রয়েছে, সেকালের সংবাদপত্র থেকে সেকালের বানানে স্থান দেওয়া হল।

সেকালের বানানে স্থান নাম	**সেকালের বানানে 'সমাচার দর্পন' পত্রিকার তারিখ**		
আলিপুরের জেলখানা —	১২	দিজেম্বর	১৮১৮
আলিপুর —	৫	জুন	১৮১৯
আমড়াতলা —	১৩	জানুআরি	১৮২১
আড়পুলি —	১১	জুলাই	১৮৩৫
ডিঃ আড়পুলি —	১৭	জুলাই	১৮১৯
আহিরীটোলা —	২১	নভেম্বর	১৮৩৫
ইড়িতলা —	১৪	এপ্রিল	১৮২১
ইটালি —	২৫	আপ্রিল	১৮৩৫
এমামবাড়ী —	১৪	নভেম্বর	১৮৩৫
এসপ্লেনেড রাস্তা —	১৩	মে	১৮২০
উল্টাডেঙ্গী —	৪	জুলাই	১৮৩৫
কলুটোলা —	২২	আগস্ট	১৮১৮
কলিঙ্গা —	৩	ফেব্রুআরি	১৮২১
কপালিটোলা —	১৯	দিসেম্বর	১৮৩৫
ক্যামক স্ট্রিট —	১২	মে	১৮২১
কাশী মিত্রের ঘাট —	২৩	মে	১৮৩৫
কাশীপুর —	১৩	নবেম্বর	১৮২০
কাশীনাথ বাবুর বাজার —	২১	নবেম্বর	১৮৩৫
কুমারটুলি —	১৯	আগস্ট	১৮২০
কসাইটোলা —	২	দিসেম্বর	১৮২০
কাঁসারিটোলা —	১৯	দিসেম্বর	১৮৩৫
কালবিনকা বস্তি —	১২	সেপ্তেম্বর	১৮৩৫

কালীঘাট —	১৪	আগস্ট	১৮১৯
কপালি টোলা —	৭	নবেম্বর	১৮৩৫
কোম্পানির বাগান —	১১	দিসেম্বর	১৮১৯
কুমারটুলি —	২৩	মে	১৮৩৫
খাতাবাটী —	৬	ফেব্রুয়ারী	১৮১৯
খালাসি গলি —	১৪	নবেম্বর	১৮৩৫
খিদিরপুর —	১২	সেপ্তেম্বর	১৮১৮
গড়ের মাঠ –	২৮	এপ্রিল	১৮২১
গরানহাটা —	৩০	দিসেম্বর	১৮২০
গোলাবাটী —	২৩	মে	১৮৩৫
গোবিন্দপুর —	৩	এফিরেল	১৮১৯
গৌরীপুর —	২	জানুআরি	১৮১৯
চক চাঁদনী —	২৮	অক্টোবর	১৮২০
চক্রবেড়ে —	৭	নবেম্বর	১৮৩৫
চড়কডাঙ্গা —	২০	নবেম্বর	১৮১৯
চাঁদনি —	৯	মে	১৮৩৫
চাঁদনিচক —	২৩	মে	১৮৩৫
চাঁদনিবাজার —	২৬	দিসেম্বর	১৮৩৫
চান্দপালের ঘাট —	২৫	জুলাই	১৮১৮
চান্দনী চক —	২১	নবেম্বর	১৮১৮
চিতপুর —	১৯	জুন	১৮১৯
চিৎপুরের রাস্তা —	৪	জুলাই	১৮৩৫
চিৎপুরের ঘাট —	২৫	মার্চ	১৮২০
চুনা গলি —	২৬	দিসেম্বর	১৮১৮
চেতলা —	১১	জুলাই	১৮১৮
চোর বাগান —	১১	জুলাই	১৮১৮
চৌরঙ্গি —	১৯	দিসেম্বর	১৮১৮
ছোটানতি —	১	মে	১৮১৯
জানবাজার —	৩	জুন	১৮২০
যোড়াসাঁকো —	৭	নবেম্বর	১৮১৮
জোড়া সাঁকো —	৪	সেপ্তেম্বর	১৮১৯
জোড়া পুখুরিয়া —	৪	সেপ্তেম্বর	১৮১৯

ঝামা পুকুর —	৭	নবেম্বর	১৮৩৫
টালা —	২৫	আপ্রিল	১৮৩৫
ডিঃ শিমলিয়া —	১৭	জুলাই	১৮১৯
ডিঃ ব্রজী —	১৭	জুলাই	১৮১৯
ডিঃ ইটালি —	১৭	জুলাই	১৮১৯
ডোমতলা —	১৮	আপ্রিল	১৮২১
তালতলা —	১৪	নবেম্বর	১৮৩৫
তেরেটী বাজার —	৪	জুলাই	১৮১৮
তৌন হল —	২৩	জানুআরি	১৮১৯
দমদমা —	১	জানুআরি	১৮১৯
দক্ষিণেশ্বর —	২১	নবেম্বর	১৮৩৫
দরমাহাটা —	২৬	দিসেম্বর	১৮৩৫
ধর্ম্মতলা —	১৪	আগস্ত	১৮১৯
নলপুকুরিয়া —	১৮	জুলাই	১৮৩৫
নবাব বাজার —	১৪	আপ্রিল	১৮২১
নাথের বাগান —	৬	আপ্রিল	১৮২২
নেবুতলা —	৩০	মে	১৮৩৫
নিমতলার ঘাট —	১৫	জানুআরি	১৮২০
পটল ডাঙ্গা —	২৯	আগস্ত	১৮৩৫
পটোলডাঙ্গা —	২৫	জুলাই	১৮১৮
পুকুরিয়া —	২৭	নবেম্বর	১৮১৯
পাইকপাড়া —	১৩	মে	১৮৩৫
পাতরিয়া ঘাটা —	৯	মে	১৮৩৫
পার্কষ্ট্রিট্ —	১২	মে	১৮২১
পাতুরিয়া ঘাটা —	২৫	আপ্রিল	১৮৩৫
পাথুরে ঘাটা —	১৯	ফেব্রুআরি	১৮২০
পুলিশের ঘাট —	২৮	আপ্রিল	১৮২১
পরমিটের ঘাট —	২৮	আপ্রিল	১৮২১
পোস্তা —	১২	দিসেম্বর	১৮৩৫
বনমালি মিত্রের গলি	২২	আগস্ত	১৮১৮
বহুবাজার —	১২	জুলাই	১৮৩৫
বড় বাজার —	১৬	দিসেম্বর	১৮২০
বাঘমারি —	৩০	মে	১৮৩৫

বাগমারি —	২ জানুআরি ১৮১৯
বাগবাজার —	২৫ আপ্রিল ১৮৩৫
বালাখানার গলি —	১৩ জানুআরি ১৮২১
বামন বস্তি —	২৮ নবেম্বর ১৮৩৫
বামন বসতি —	৩১ মার্চ ১৮২১
বাঁশতলা —	২১ নবেম্বর ১৮৩৫
বলিয়া ঘাট —	১১ নবেম্বর ১৮২১
বাহির শিমিলা —	১৫ আগস্ট ১৮৩৫
বিবিরাসের ঘাট —	১৬ আগস্ট ১৮১৯
বুদদবাটী —	১৩ জানুআরি ১৮২১
বেলগাছী —	২ জানুআরি ১৮১৯
বেলগাছিয়া —	২৮ নবেম্বর ১৮৩৫
বেনে পুখুরিয়ার বাজার —	১৪ আপ্রিল ১৮২১
বৈঠকখানা —	১২ সেপ্তেম্বর ১৮১৮
ব্যাপারিটোলা —	২৬ ফেব্রূআরি ১৮২০
ভবানীপুর —	১৭ অক্তোবর ১৮৩৫
মলঙ্গা —	১৬ আকটোবর ১৮১৯
ময়রাপাড়া —	৩১ অক্তোবর ১৮৩৫
মুরগীহাটা —	১৪ আপ্রিল ১৮২১
মুচিবাজার —	৪ নবেম্বর ১৮২০
মুটয়া (মুটিয়া) পাড়া —	৩০ দিসেম্বর ১৮২০
মেছুয়া বাজার —	২৭ জুন ১৮৩৫
মেহেদি বাগান —	২৮ নবেম্বর ১৮৩৫
মেহেন্দি বাগান —	৮ আপ্রিল ১৮২০
মেন্দিবাগান—	১৬ মে ১৮৩৫
মৌলআলী দরগা —	১৪ আপ্রিল ১৮২১
মীর্জাপুর —	২৩ মে ১৮৩৫
লালবাজার —	১২ সেপ্তেম্বর ১৮১৮
লালদিঘী —	১৩ জুন ১৮১৮
যোড়াসাঁকো —	১৮ আপ্রিল ১৮৩৫
রাধাবাজার —	৯ মে ১৮৩৫
লালবাজার —	১৮ জুলাই ১৮৩৫
নোনাপুকুর —	১৯ দিসেম্বর ১৮৩৫

শুড়িটোলা —	২	জানুআরি	১৮১৯
শিবতলা —	২১	নবেম্বর	১৮৩৫
শিমলে —	২০	মার্চ	১৮১৯
শিমলা —	২১	আগস্ত	১৮৩৫
শিমনিয়া —	১৯	দিসেম্বর	১৮৩৫
শোভাবাজার —	৩	জুন	১৮২০
শ্যামপুখুরিয়া —	৩০	দিসেম্বর	১৮২০
শ্যামবজার —	৮	জানুআরি	১৮২০
যাটবস্তি —	১১	নবেম্বর	১৮২০
সভাবাজার —	১১	মার্চ	১৮২০
সাঁতার বাগান —	২০	নভেম্বর	১৮১৯
সাঁকারি টোলা —	১৬	আকটোবর	১৮১৯
সিমুলিয়া —	২২	মে	১৮১৯
সুতানুটি —	১৭	জুলাই	১৮১৯
সুতানুটি —	৩০	সেপ্তেম্বর	১৮২০
সুঁড়া —	৯	দিসেম্বর	১৮২০
হরিণবাটী —	৭	জুলাই	১৮২১
হরিণবাড়ী —	৩	জুলাই	১৮১৯
হাটখোলা —	১৩	জানুআরি	১৮২১
হাতিবাগান —	২	সেপ্তেম্বর	১৮২০
হাড়কাটা গলি —	২৫	জুলাই	১৮১৮
হোগলকুড়িয়া —	১৫	আগস্ত	১৮৩৫

পূর্ব কলকাতার কিছু স্থান

- **আনন্দপুর** — কাঁকুড়গাছির দক্ষিণ-পূর্বে ও নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের উত্তর ধারের একটি অঞ্চল।
- **উড়িয়াবাগান** — বেলিয়াঘাটা মেন রোডের উত্তরধারে, সরকার বাজার ও আলোছায়া সিনেমা থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত।
- **কবিরাজবাগান** — অরবিন্দ সেতুর দক্ষিণ-পূর্বে হরিশ নিয়োগী রোডের একাংশ।
- **কলাবাগান** — কলাবাগান বেলেঘাটায় চড়কডাঙ্গা রোডের পূর্বধারে।
- **কাজিপাড়া** — ১৮৭৪ খ্রি. আপার সার্কুলার রোড ও উল্টোডাঙ্গা ব্রিজরোডের সংযোগস্থলের উত্তরদিকে অবস্থিত ছিল 'কাজিপাড়া'। পুরনো নাম ছিল 'কাগজি পাড়া'। ১৮৬৩ খ্রি. পথপঞ্জী থেকে একথা জানা যায়। সেখানে বাঙালি কাগজ প্রস্তুত কারকদের বাস।
- **কুচিনান** — পঞ্চান্নগ্রামের একটি গ্রাম, 'কুচনান' ছিল ডিহি শুঁড়ার অন্তর্গত। মানিকতলা মেন রোড, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, নিউ ক্যানেল ও কাঁকুড়গাছি—এই চৌহদ্দির মধ্যবর্তী অঞ্চল হলো কুচনান।
- **গাঙ্গুলীবাগান** — ডা. পঞ্চানন মিত্র লেনের (ওয়ার্ড ৩৪, ৩৫) উত্তরধারে ও রেল লাইনের পূর্বদিকে অবস্থিত বেলেঘাটার একটি অঞ্চল।
- **চাউলপটি** — বেলেঘাটায় চাউলপটি রোড আজও রয়েছে।
- **চারু বাগান** — বেলেঘাটা মেন রোডের উত্তরধারে, আলোছায়া সিনেমা ও রাসমণি বাজারের মধ্যবর্তী অংশে—রাজবাগানের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।
- **চিংড়িহাটা** — রামকৃষ্ণ নস্কর লেনের (ওয়ার্ড ৩৩) পূর্ব নাম চিংড়িহাটা লেন।
- **দক্ষিণদাঁড়ি** — দক্ষিণদাঁড়ি ছিল পঞ্চান্ন গ্রাম ও ডিহি বাগজোলার অন্তর্গত। গ্রামটির একাংশ 'নিজ দক্ষিণদাঁড়ি' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে দমদম পুরসভায়।
- **দত্তাবাদ** — দত্তাবাদ ছিল পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি শুঁড়ার অংশ। মানিকতলা মেন রোড, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড ও নিউ ক্যানেল—এই হলো দত্তাবাদের ত্রিসীমানা।
- **দুর্গাপুর** — বাগমারি রোড ও উল্টাডিঙ্গি মেন রোডের সংযোগস্থল ও সন্নিহিত অঞ্চল।
- **ধোবাপাড়া** — বেলেঘাটা মেন রোড ও কে. জি. বসু সরণির সংযোগস্থল ও সন্নিহিত অঞ্চল।
- **নবাব বাগান** — বেলেঘাটা মেন রোডের দক্ষিণধারে সরকার বাজারের বিপরীতবর্তী অঞ্চল।
- **নারকেলডাঙ্গা** — পঞ্চান্নগ্রাম তথা ডিহি শিমলার অন্তর্গত। নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড গ্রামটির স্মৃতিবাহী।

❑ **নারকেল বাগান** — বর্তমান ডা. জগবন্ধু বসু সরণির (ওয়ার্ড ২৮) পূর্বনাম নারকেল বাগান লেন।

❑ **নোয়াবাদ** — পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি বাগজোলার অন্তর্গত নোয়াবাদ গ্রামের অবস্থিতি ছিল দক্ষিণদাঁড়ি ও উল্টোডাঙ্গার পূর্বদিক ও কেষ্টপুরের পশ্চিমদিকে।

❑ **পচাবাগান** — বেলেঘাটা মেন রোডের দক্ষিণধারে রোমান ক্যাথলিক সমাধিক্ষেত্রের পূর্বদিকে।

❑ **ফুলবাগান** — শুঁড়া ও কাঁকুড়গাছির মধ্যবর্তী এলাকা।

❑ **বসাকাবাদ** — বর্তমান উল্টোডাঙ্গা মেন রোডের পূর্বপ্রান্তে, লবণহ্রদের ধারে ১৮৫৪ খ্রি. ছিল বসাকাবাদ।

❑ **বাগমারী** — পঞ্চান্নগ্রাম ও ডিহি উল্টোডাঙ্গার অন্তর্ভুক্ত। বাগমারী রোড (ওয়ার্ড ১৪, ৩২) লেন (ওয়ার্ড ৩২)।

❑ **বাবুবাগান** — বেলেঘাটা মেন রোডের উত্তরে চড়কডাঙ্গা রোডের পূর্বেও মিঞাবাগান বস্তির পশ্চিমে।

❑ **বামুনবাগান** — বেলেঘাটার গুরুদাশ পার্কের পূর্বদিকে, সুরেন সরকার রোড ও অবিনাশ ব্যানার্জীর রোডের সংযোগস্থল ও সংলগ্ন এলাকা।

❑ **বারোয়ারিতলা** — বারোয়ারিতলা রোড ৩৪ ওয়ার্ডে আছে।

❑ **বাহির জেলেপাড়া** — বেলেঘাটা মেন রোডের উত্তরধারে, ফড়িয়াপাড়ার উত্তরে খোদাগঞ্জের উত্তর-পূর্ব।

❑ **বাহির শুঁড়া** — সুরেন সরকার রোডের (ওয়ার্ড ৪৪) আদিনাম বাহির শুঁড়ারোড।

❑ **বেলেঘাটা** — পঞ্চান্ন গ্রামের, ডিহি শিয়ালদহের অন্তর্গত।

❑ **ভাঁটিখানা** — বেলেঘাটা মেন রোড, বেলেঘাটা ক্যানাল, সারকুলার ক্যানালও কুলিয়ার দ্বারা বেষ্টিত অঞ্চল।

❑ **মাল্লিকবাগান** — রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডের পশ্চিমধারে, আলোছায়া সিনেমা ও দাউদী বোহড়া সমাধিক্ষেত্রের মধ্যবর্তী এলাকা।

❑ **মল্লিকাবাদ** — পঞ্চান্ন গ্রাম ও ডিহি কুলিয়ার অন্তর্গত, উত্তরে নারকেল ডাঙ্গা মেন রোড, পূর্বে নিউ ক্যানাল, পশ্চিমে শুঁড়া ও দক্ষিণে বাহির জেলেপাড়া।

❑ **মিঞাবাগান** — বেলেঘাটা খালপুলের উত্তরপূর্বে, সরকার বাজারের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

❑ **মুরারিপুকুর** — বর্তমান নাম বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি।

❑ **মৈত্রবাগান** — বর্তমান বেলেঘাটা থানার উত্তর-পশ্চিমে সুরেন সরকার রোডের ধারে।

❑ **মোগলবাগান** — নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের উত্তর ধারে, বিধান শিশু উদ্যান ও স্যার গুরুদাস হল্টের মধ্যবর্তী এলাকা।

- ❑ **রামসীতার বাগান** — বেলেঘাটা গুরুদাস পার্ক ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের সাবেক নাম।
- ❑ **রাসবাগান** — ড. পঞ্চানন মিত্র লেনের (ওয়ার্ড ৩৪, ৩৫) পুরনো নাম রামবাগান লেন।
- ❑ **রাসমণিবাজার** — ৩৪ ওয়ার্ডে রাসমণি বাগান নামে একটি পল্লী ও রাস্তা আছে।
- ❑ **শ্যাওড়াতলা** — বাগমারী ও কাঁকুড়গাছির মধ্যবর্তী অঞ্চল।
- ❑ **শিমলা** — পঞ্চান্ন গ্রামের একটি ডিহির নাম শিমলা, এর মধ্যে দুটি গ্রাম হলো বাহির শিমলা ও নারকেল ডাঙ্গা।
- ❑ **শীতলাতলা** — ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে শীতলাতলা লেন।
- ❑ **শুঁড়া** — পঞ্চান্নগ্রামের এই ডিহির নামে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৪টি পথ নাম আছে।
- ❑ **শুঁড়িপাড়া** — ২৭ ওয়ার্ডে ঘোষ লেনের আদি নাম শুঁড়িপাড়া লেন।
- ❑ **ষষ্ঠীতলা** — ২৯, ৩০ ওয়ার্ড জুড়ে ষষ্ঠীতলা রোড রয়েছে।
- ❑ **সেনবাগান** — অবিনাশ শাসমল লেন (ওয়ার্ড ৩৪, ৩৫) ও সংলগ্ন এলাকা।

পুরনো বানানে পূর্ব কলকাতা স্থান

দক্ষিণদ্বারী

1717 - DACKNEY DANDI
1825-32 - DHAKEEN RANREE
1852-56 - DUKHYAN DAREE

কাঁকুড়গাছি

1717 - CANCERGASOIAH
1817 - KONKURGUTCHI
1825-32 - KANKER GACHA
1852-56 - KANKOORGATCHA

নারকেল ডাঙ্গা

1825-32 - NARKOL DUNGAH
1852-56 - NARIKAL DANGAH
1856 - NARIKAL DANGAH

বেলেঘাটা

1784-85 - BALIA GAUT
1792-93 - BALLIAH GHAUT
1817 - BALIA GHATTA
1825-32 - BALYA GHAT
1856 - BALLIAH GHATTA
1852-56 - BELIA GHATTA

উল্টোডাঙ্গা

1717 - ULTADANG
1794 - OOTADANGY
1825-32 - ULTAH DUNGAH
1847 - ULTADANGAH
1852-56 - OOLTADANGAH
1856 - OOLTA DANGAH

বাগমারী

1717 - BAGMARREY
1817 - BAUG MARRY
1825-32 - BAG MARREE
1856 - BAG MAREE

শুঁড়া

1717 - SUNDAH
1792-93 - SOORAH
1852-56 - SORAH

ছড়া ও প্রবাদে কলকাতা

কুচিনান-বেলেঘাটা বাণিজ্যকেন্দ্রে একসময় ভীড় করেছিল নানান পেশার মানুষ। শুধুমাত্র ফড়ে, দালালি করে বহু মানুষ সংসার চালাতেন এখানে, তাই প্রবাদ হয়ে গিয়েছিল—

'যার নেই পুঁজি পাটা।

সে যায় বেলেঘাটা॥'

যেখানে ব্যবসার রমরমা, সেখানেই চোর চোট্টাদের ভীড়, তাই কথায় বলত—

'কলকাতার সব চোর চোট্টা।

এক হয়ে যায় তারা বেলেঘাট্টা॥'

হ্যাঁ, কলকাতার চোরেদের সাহেবরা একসময় মাথা নেড়া করে মারাঠা ডিচের ওপারে, কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিতেন, এই চোর-ডাকাতরা সব এসে জড়ো হত শুঁড়া অঞ্চলে। তাই কথায় বলত—

অন্য একটি কথায়—

যার আছে পুঁজিপাটা

সেই থাকে বেলেঘাটা॥'

'মশা, মাছি, নেড়া।

সব যায় শুঁড়া॥'

এই মশা হল চোর, আর মাছি হল ডাকাত এবং নেড়া হলো অপরাধী হিসেবে ধরা পড়ায় যাদের মস্তক মুণ্ডন করে দেওয়া হত।

১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পের পর পূর্ব কলকাতার প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র নষ্ট হয়ে যায়। কয়েক বছরের মধ্যে এই অঞ্চল বাদায় পরিণত হয়, তখনও—

ঠক, বদমাস, হারামজাদা।

সব যায় পূর্ব-বাদা॥

একই প্রবাদ ঘুরে ফিরে এসেছে শুধু স্থান-নাম পাল্টে। পকেটে পয়সা না থাকলেও কিছু যায় আসে না, বেলেঘাটা পৌঁছতে পারলেই হত, কিছু না কিছু করে বেলেঘাটায় আয় করতে পারতো, তাই বলা হত—

"খালি পকেট সোজা হাঁটা।

আয়ের জন্য বেলেঘাটা॥"

বাণিজ্য ছেড়ে এই অঞ্চল নিয়ে অন্যরকম কিছু লোক-কথা রয়েছে, তার মধ্যে একটি—

'খেটো কোঁচা, ঢিলা কাছা।

তার বাড়ি কাঁকুড়গাছা॥'

বাগমারী নিয়ে মজার ছড়া—

'দোজবরের মাগ।
বাগমারীর বাঘ॥'

উল্টোডিঙ্গি অঞ্চলে তৈরি হত ডিঙ্গি নৌকো। বাণিজ্যের জন্য বাড়িছাড়া হয়ে থাকতে হত এখানে, তাই বাড়ির দিকে মন পড়ে থাকত, সেই প্রসঙ্গে এই ছড়া—

'উল্টোডাঙ্গা হয়ে গেলাম
লবণ জলের বাদায়।
গিন্নির কথা পড়ল মনে
পড়ে গেলাম কাদায়॥'

পূর্ব কলকাতা ছাড়া, কলকাতার অন্য অঞ্চল নিয়ে লেখা ছড়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

❑ কাক, কাঙালী, ভাট।
তিন নিয়ে কালীঘাট॥

❑ কালির অক্ষর নেইকো পেটে।
চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে॥

❑ মশা, মাছি, ময়লা।
এই তিন নিয়ে ব্যায়লা (বেহালা)॥

❑ খানা, খন্দ, হোগলা।
এ তিন নিয়ে বেহালা॥

❑ ভুঁড়ি, ভড়ং, বুলি।
তিন নিয়ে ইটিলি॥

❑ গাঁজা, তাড়ি, প্রবঞ্চনা।
এ তিন নিয়ে সরশুনা॥

❑ বরানগর রসের সাগর।
এক-এক ঘরে তিন তিন নাগর॥

❑ আশীর্বাদ করি মাথার কাটে।
মেগে খাও গে চেতলার হাটে॥

❑ মশা, মাছি, নর্দমা।
এ তিন নিয়ে দমদমা॥

❐ জাহাজ, কুলি, চিটেগুড়।
এ তিন নিয়ে খিদিরপুর॥

❐ চাল, চিড়ে, ঝ্যাতলা (মাদুর)।
তিন নিয়ে চেতলা।

❐ কলকাতার মাথাঘষা,
খিদিরপুরের চিরুনি।
নোটন-খোপা বেঁধে দেব
বেলফুলের গাঁথুনি॥

❐ বাগবাজারের রসগোল্লা
মোল্লারচকের দই।
জনাই-এর মনোহরা
যশোরের কই॥

❐ বনমালী সরকারের বাড়ি
গোবিন্দরামের ছড়ি।
উমিচাঁদের দাড়ি
হুজুরীমলের কড়ি॥
বনমালী সরকারের বাড়ী
গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি
আমির চাঁদের দাড়ি,
হুজুরি মল্লের কড়ি॥

পাঠান্তর ঃ গোবিন্দরামের ছড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি।
নকু ধরের কড়ি
মথুর সেনের বাড়ি॥

❐ কলির শহর কইল্‌কতা
বাইরে দ্যাখো দালানকোঠা
ভিতরে তার ফাঁত পাতা॥

❐ মালে নিয়ে নৌকা কলকাতা যাচ্ছে
মাল আর তার মালিক
একজন মাঝি একজন, যার কাছে মাল
যাচ্ছে তিনি একজন—মোট তিনজন।
তিন নিয়ে যে কথা—
এক শালিকের তিন মাথা

খাইয়া গেল লতাপাতা কইলকাতা।।

❑ দিনে দুবার বাস চালু হওয়ার মজা
করে বলা হলো
শিলিগুড়ি কলকাতাকে
দিনে দুবার দাদা ডাকে।

❑ হুকো যেতে লাগে
খুলু না খেল, কলকেও
টিকে, তিনটি নিয়ে ধাঁযায়
কবিতা—
[কইলকা]তাতে আগুন লাইগলো
[টিকিয়া] পাড়া পুইড়্যা গেল
[খুলু] টোলায় ধুয়া বাড়লো।

❑ ময়রা, মুদি, কলাকার
এ তিন নিয়ে বাগবাজার।।

❑ রং, মাটি, তুলি।
তিনে কুমারটুলি।।

❑ দেখো মেরি জান কোম্পানি নিশান,
বিবি গৈয়ে দমদমা উড়ি হৈ নিশান,
বড়া সাহেব ছোটা সাহেব বঙ্কা কাপ্তেন,
দেখো মেরি জান, লিয়া হৈ নিশান।।

❑ কারুর কিছু হারিয়েছে।
বাগবাজারের মদনমোহন পালিয়েছে।।

❑ বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা, গুলীর কোন্নগরে,
বটতলায় মদের আড্ডা, চণ্ডুর বৌবাজারে।
এইসব মহাতীর্থ যে না চোখে হেরে,
তার মত মহাপাপী নাই ত্রিসংসারে।

❑ জাল, জুয়ারি, মিথ্যা কথা।
এই তিন নিয়ে কলিকাতা।।

❑ ধন্য হে কলিকাতা ধন্য হে তুমি।
যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি।।

❑ দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলাতের চাল।
নকলে বাঙালীবাবু হল যে কাঙাল।।

❑ রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে।
ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়া বাস করে।।

❑ দাদা হোয়ে খাজ হোয়ে আর হোয় হৌ হোহো।
কলকাতা নাহি যাও, খাও মৌহা॥

❑ রেতে মশা দিনে মাছি।
এই নিয়ে কলকাতায় আছি॥

❑ রেতে মশা, দিনে মাছি।
এই তাড়িয়ে কলকেতায় আছি॥

❑ মিথ্যা কথার কিবা কেতা।
আজব শহর কলকাতা॥

❑ মাটি, বেটি, মিছে কথা।
এ তিন নিয়ে কলকাতা॥

❑ রাঁঢ়, ভাঁড়, মিছে কথা।
এ তিন নিয়ে কলকাতা॥

❑ কলকাতা বলে কথা।
আগে বেরোয় হাত পা।
শেষে বেরোয় মাথা॥

❑ কলকাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি।
তেঁতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ॥

❑ উলোর মেয়ের কলকলানি।
শান্তিপুরের খোঁপা।
নদের মেয়ের হাত নাড়া।
কলকাতার চোপা॥

❑ জো যায়ে কলিকত্তে,
ও খে খায়ে আলবাত্তা।
(যে কলকাতায় যাবে সে
নিশ্চয়ই নোংরা খাবে।)

❑ দেহ্ মেঁ ন লত্তা
লুট্ কে কলকত্তা।
(গায়ে নেই ছেঁড়া কাপড়,
লুট করতে চায় কলকাতা শহর)।

লেটো গানে কলকাতা

❒ কলকাতার মামা
গায়ে রেলের জামা।
নাও হাত পেতে
নাও দিনে রেতে।
সিকি টাকা নিয়ে
গণো বাড়ি গিয়ে।

❒ কলসি হাঁড়ি সারি সারি, যায় কলকাতায
দিনের শেষে অন্ধকার, ওড়ে শালপাতা।।
লাইন ধারে সারি সারি, বসে নিয়ে ভাঁড়।
যাদের নেশা কাত করে, তারা হয় পাঁড়।

ভাদু গানে কলকাতা

মেদিনীপুরের বগড়ী অঞ্চলের

❒ কলকাতাতে দেখে এলাম সোনার পিঁড়ায় বাঘ বসে,
ও বাঘে তো খায় না মানুষ বোসে বোসে রং দ্যাখে।

❒ কলিকাতায় চলে, ভাদু আমার যাচ্চে গো হেলে দুলে।
সকালবেলায় সাতটা সময় গো চড়িয়ে নীলাচলে।।
হাওড়াতে নামিবে ভাদু চান কোরো গঙ্গার জলে,
হাওড়ার পোল দেখবে ভাদু গো নিচেতে জাহাজ চলে।
উপরেতে ট্রাম বাস টেসকি গো
মানুষ যায় হেলে দুলে
কলিকাতায় চলে......

বাঁকুড়া অঞ্চলের

❒ আমার ভাদু ছোট্ট মেয়ে কে পাঠালো কলিকাতা।
কলিকাতার নোনা জলে, ধরেছে ভাদুর মাথা।।

১. লেটো গান, ভাদু গান, টুসু গানগুলি শ্রদ্ধেয় শিবপ্রসাদ সমাদ্দার সম্পাদিত 'এই কলকাতা কবিতায়' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

❐ কলিকাতাতে গেছলে ভাদু কার কত যে চুল আছে।
চুলের কথা কি বলবে মা, পিঠ ভেঙে চুল শুকাচ্ছে॥

❐ কলিকাতা কলিকাতা অলি, কলিকাতার বাজার ভাল।
কলিকাতারই ময়লা জলে, অলির দেহের রং গেল॥

❐ কলিকাতার দিদিরা পায়ে বেঁধেছে পিঁড়ি।
খট খট শব্দ করে ওঠে বাসের সিঁড়ি॥

❐ কলিকাতার হচ্ছে যে গান।
নাম করে সাহায্য দান॥
সাহায্যের নাম করি যে হে পকেটে টাকা কুড়ান।
মহা আড়ম্বরী করেছে ছাপিয়ে কাগজ ছড়ান॥
মাইক নিয়ে জিপ গাড়ীতে চেপে দেয় স্লোগান।
জগত মাঝে আমরা বলি হে, হয়েছি মহা পুণ্যবান॥

তুসু গানে কলকাতা

মেদিনীপুরের বগড়ী অঞ্চলের

❐ আমার তুসুর একটি ছেলে, কে পাঠাল কলকাতা?
ভালয় ভালয় ঘুরে আসুক মানসিক কর জোড়া পাঁঠা।
আমার তুসুর খ্যালাশালে গেল গলার হার পড়ে।
কী ভাবনা ভাবছ তুসু যাব রাজ দরবারে।

❐ ভম্‌রা এল খাতা খাতা—ও ভম্‌রা তোর ঘর কুথা?
সোজা রোডে উঠে গ্যালে, সোজা রাস্তা কলকাতা।
কলকাতা যে গেছলে তুসু কী কী গয়না উঠেছে?
ঝিরিক ঝিতা—মাথার কাঁটা, পায়ে তাতা মল আছে।

❐ তুসু তুসু করি আমরা গো তুসু গ্যাছে কলকাতা,
মনে করে আনবে তুসু কলকাতার ঐ লাল ছাতা।
পাতাল রেল দেখবে তুসু গো আলিপুর চিড়াখানা,

রেডিও সেন্টার দেখিবে, সব খবর যায় জানা।
গড়ের মাঠ দমদম যেও গো এরোপ্লেনের কারখানা,
এরোপ্লেনে চোড়ে তুসু গো কোথায় যাবে চল না।
প্লেনে চড়ে তুসু তুমি গো উঠবে যখন গগনে
দিল্লী লখনো বোম্বে যাবে গো গয়া কাশি আর বৃন্দাবনে।

❑ সাদা ফিতায় বাঁধবি লো মাথা
তোকে নিয়ে যাব কলিকাতা
দ্যাখ না ছুঁড়ির মাথা বাঁধাটি
যেন টেপচুপাখের বাসাটি
হাতে ঘড়ি চশমা পরেছে,
বাবু কত ভদ্দ সেজেছে,
আসতে যাতে লোক দেখিলে উরমালে মুখ মুছিছে
গরুর গাড়ী ছাড়্যে দিয়ে ভটভটিতে চোড়েছে
বাপ মাকে ছাড়্যে দিয়ে
বৌকে শুধু ভালিছে
বাবু কত ভদ্দ সাজেছে
হাতে ঘড়ি চশমা পরেছে।

বাঁকুড়া অঞ্চলের

❑ কলিকাতা যাব না আর থাকবো না একা ঘরে।
তুমি কাজে গেলে ছোঁড়ারা দরজা চেটে মরে॥

❑ কলিকাতায় টাকার জোরে কত জনে হিড়িক তুলেছেন।
গ্রামের লোকের টাকা মারা কোম্পানি যত খুলেছেন॥

পুরুলিয়ার টুসু

❑ কলিকাতায় বহু বিটি উলটে বাঁধে ঝুটি।
ঘোমটা নেই মাথায় তার চলে গুটি গুটি॥

❑ শাড়ী পরে টিকিট করে, যাবো হাওড়ার স্টেশনে।
মোটা কাপড় পরব না আর, সরু শাড়ী দাও কিনে॥
কুলিযুগে কলিকাতা ইন্দ্রপুরীর তুলনে

শত শত ট্রাম মোটর চলছে রাত্রি দিনে।।
দুই চক্ষু খোলা রেখে সোজা পথে হেঁটে।
কলকাতাতে গিয়ে হোথা পড়বে গড়ের মাঠে।।
যাদুকুঠি, ভিক্‌টোরিয়া পড়েছে অতি যতনে।
চিড়িয়াখানা দেখাও বন্ধু, দেখবো দু-নয়নে।।

বীরভুমের বাদাবাদি



বলি ও তুসু ধন
সত্য করে বল দেখি এ বছরের হাওয়াটি কেমন।
আকাশ ছোঁয়া দর জিনিষ বাজার, বল দেখি কি কারণ
কলকাতাতে রাজনীতির খেল আর দেশে বাদাবাদীর চলছে কি মাতন
আসল নিয়ে নাইকো ব্যথা নকলের কাজ কি রকম।
তাই অধম বলে, যখন এসেছ মা আনন্দময়ী
এ দুঃখ কর মোচন
রাজধানী আর মফঃস্বলে চাকরীর বাজার নো-ভ্যেকেন্‌সি
ব্যবসাতেও বসে না মন
তাই দলে দলে টী স্টলে আড্ডা মারি সর্বক্ষণ
তাই মনের দুঃখে বন্ধু কষ্টে তুসু সঙ্গীত করছি রচন।
তোমারি উৎসবে যত ভদ্র ভদ্রা সর্বজন
মিটাতে মনের আশা ডাকি তোমায় অনুক্ষণ
গহস্থ আর জোগান পসার সকলেতে চায় এখন
শাড়ি ধুতি জামা চাদর গুঁড়ি গুড়ের প্রয়োজন।

কলকাতা তিনশ ঃ প্রকাশিত গ্রন্থে

কলকাতা তিনশকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত 'কলকাতা' বিষয়ক যে সব বই প্রকাশিত হয়েছিল তার তালিকাটি তৈরী করেছেন শ্রদ্ধেয় অশোক উপাধ্যায়। শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় লেখকের নাম ধরে তালিকাটি তৈরী করেছেন, বইয়ের নাম ধরে তালিকাটি করার ইচ্ছে ছিল, হাতে সময় কম থাকায় বর্নানুসারে তা সাজিয়ে নেওয়া গেল না। মুলত ১৯৮৯ এবং ১৯৯০ দুবছর ধরে কলকাতা নিয়ে যে বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে শুধুমাত্র সেগুলিই প্রকাশ করা হলো। এই দুবছরই কলকাতা-৩০০ উদযাপন হয়েছিল।

কলকাতার মাটি ও মানুষ। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা, বি.বি. প্রকাশন [বনমালী-বিশ্বনাথ প্রকাশন], জানুয়ারি ১৯৮৯। [৪] + viii + ১৮৮ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা ঃ নিশীথরঞ্জন রায়।

কলকাতা ঃ ইতিহাসের উপাদান। নিশীথরঞ্জন রায়— কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৮৯। ৮৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কফির কাপে সময়ের ছবি। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা, ক্যাম্প (কমিউনিকেশন এণ্ড মিডিয়া পিপল্), জানুয়ারি ১৯৮৯। ৮৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

স্মৃতিকথা। কলকাতার কফিহাউসকে ঘিরে চার থেকে সাতের দশকের নানা আড্ডা ও আড্ডাধারীর বৃত্তান্ত।

দেখার শহর কলকাতা। শ্যামলেন্দু চৌধুরী—কলিকাতা, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ১৯৮৯। [৮]+১২২ পৃষ্ঠা।

যাচ্ছো কোথায়, যাদুঘরে। শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী— কলিকাতা, পুনশ্চ, গ্রন্থমেলা ১৯৮৯। ৬৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ছড়ায় ছড়ায় কলকাতা। প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী—কলিকাতা, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা বইমেলা ১৩৯৫, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৯। [৪]+ + ৩৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

একশো কবির কলকাতা। অমিতাভ চৌধুরী সরল দে সম্পাদিত—কলিকাতা, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা বইমেলা ১৩৯৫, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৯। [১২] + ১০৯ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কবিতা সংকলন। নির্বাহী সম্পাদক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

ছড়া কথা কলকাতা। প্রীতিভূষণ চাকী—নৈহাটি (উত্তর ২৪ পরগণা), আনন্দরূপ, বইমেলা ২৫ জানুয়ারি '৮৯। ৯২ পৃষ্ঠা।

দৈনিক সংবাদপত্রের কড়চা জাতীয় লেখা ও ছড়ার সংকলন। প্রচ্ছদ ব্যতীত

স্বতন্ত্র আখ্যাপত্র নেই, ½ টাইটেলে উৎসর্গ, তার পিছনে প্রকাশ সম্পর্কিত বিবরণ। জ্যাকেটে অন্নদাশংকর রায়ের অভিমত। পৃষ্ঠাগুলি সংখ্যাঙ্কচিহ্নিত নয়।

রথীন মিত্রের শাশ্বত কলকাতা। রথীন মিত্র—৩য় পর্ব : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কলিকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯। ১২০ পৃষ্ঠা। সচিত্র। কলকাতার ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সচিত্র পরিচিতি। ছবি রথীন মিত্র, লেখা অলোক রায়।

ভূমিকা ঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত।

সংস্করণ ঃ ৩০০ বছরের কলকাতা ; ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির মাঘ ১৩৯৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। ২২০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলিকাতা তারিখ অভিধান। দিব্যেন্দু সিংহ—কলিকাতা ৪ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯, মাঘ ১৩৯৫। [১২] + ২৯১ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা ঃ নিশীথরঞ্জন রায়।

ইতিহাসের কলকাতা। রমেন দাস। কলিকাতা, অনন্য প্রকাশন, এপ্রিল ১৯৮৯। ১০২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলকাতা কলকাতা। পূর্ণেন্দু পত্রী—কলিকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ ১৩৯৬। ৮০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

শিক্ষাপীঠ কলকাতা। অতুল সুর—কলিকাতা, জ্যোৎস্নালোক, রথযাত্রা, জুলাই ১৯৮৯। ১২৬ পৃষ্ঠা।

সেকালে বড়লোকদের খেয়াল-খুশি। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, জুলাই ১৯৮৯, আষাঢ় ১৩৯৬। ১০৮ পৃষ্ঠা।

কলকাতা ঃ তিন শতক। কৃষ্ণ ধর—কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাংলা আকাদেমি, ১৫ আগস্ট ১৯৮৯। [৪] + ৮২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কনকলতা কলকাতা। বসন্তকুমার মণ্ডল—(কলকাতার সেকাল একাল এবং আগামীকাল) ছ কাব্যে ইতিহাস। কলিকাতা, সুরভি সেন, ১৫ আগষ্ট ১৯৮৯। [১২] + ৬৪ + [৪] পৃষ্ঠা। সচিত্র, মানচিত্র।

ভূমিকা ঃ অতুল সুর।

অরূপ নগরী কলকাতা। দিলীপকুমার মিত্র সম্পাদিত—কলিকাতা, প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯। [৪] + [৪]+১৫০+৮০ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

'কলকাতার ইতিহাসের সাহিত্য দলিল'—কলকাতা নিয়ে লেখা প্রবন্ধ, ইতিহাস, রম্যরচনা, কবিতা ও নাটিকার সংকলন।

ছড়ায় কলকাতার ইতিহাস। বিষ্ণুপদ রায়—কলিকাতা, এস. রায়, আশ্বিন ১৩৯৬, অক্টোবর ১৯৮৯। ৩৬ পৃষ্ঠা (সংখ্যাঙ্কহীন)। সচিত্র।

কলকাতাকে জানেন। স্বপনকুমার ভট্টাচার্য—৪র্থ সংস্করণ। কলিকাতা, টিচার্স কনসার্ন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। ৪৮ পৃষ্ঠা।

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ১৯৮৯।

কলকাতা কবে কোথায়। নন্দলাল ভট্টাচার্য—কলিকাতা, রানার, শ্যামাপূজা ১৩৯৬। [৮]+৭২ পৃষ্ঠা।

ঐতিহাসিক কলকাতার অঞ্চল। অসিতকৃষ্ণ দে—কলিকাতা, অতিথি, ডিসেম্বর ১৯৮১, অগ্রহায়ণ ১৩৯৬। [৪]+১৮২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলিকাতার পরিচয়। বিষ্ণুপদ দাস ও অন্যান্য, সংগ্রাহক—কলিকাতা, চতুর্ভুজ পুস্তকালয়, ২৫ ডিসেম্বর [১৯৮৯]। ৪৮ পৃষ্ঠা।

অন্যান্য সংগ্রাহক ঃ শম্ভুনাথ বণিক, কালীপদ সাহা, টি. কে. রায়।

পুরনো কলকাতার কথা। নিশীথরঞ্জন রায় সুনীল দাস সম্পাদিত—কলিকাতা, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, গ্রন্থমেলা, ডিসেম্বর ১৯৮৯। [৮]+১৫৯ পৃষ্ঠা।

৪টি প্রবন্ধের সঙ্কলন প্রথমটি নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 'বিশ্বকোষ' ৩য় খণ্ডে (১২৯৯) মুদ্রিত 'কলিকাতা' প্রবন্ধ। এই অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধটিকে সম্পাদকেরা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনারূপে চিহ্নিত করেছেন, যদিও এ মতের সমর্থনে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেননি।

কলিকাতার ছড়া। বিষ্ণুপদ রায়—কলিকাতা, এ. সরকার। [১৯৮৯]। ১৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র

কলকাতার স্ট্যাচু। কমল সরকার—কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ১৯৯০। [১৫]+২৩১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

সম্মুখ সমরে কলকাতার সংবাদপত্র। নন্দলাল ভট্টাচার্য—কলিকাতা, রানার, জানুয়ারি ১৯৯০। [১০]+১৮৬ পৃষ্ঠা।

প্রাক্-পরিচয় ঃ নিশীথরঞ্জন রায়।

কলকাতার কালী। দীপ্তিকুমার শীল—কলিকাতা, কথামৃত প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯০। ২৪ পৃষ্ঠা।

শ্রীরামকৃষ্ণের কেল্লা কলকাতা। দীপ্তিকুমার শীল—কলিকাতা, কথামৃত প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯০। [৪]+৩৬ পৃষ্ঠা।

কলকাতা কল্পতরু। রমেন্দ্রনাথ মল্লিক—কলিকাতা, কথামৃত প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা ১৩৯৬, জানুয়ারি ১৯৯০। [৬]+১১৩ পৃষ্ঠা।

বিষয় কলকাতা। প্রতাপ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা, প্রৈতি প্রকাশন, ২৩ জানুয়ারি ১৯৯০। [৮]+২০৪ পৃষ্ঠা।

ছোটদের কলকাতা ৩০০। সত্য চক্রবর্তী—কলিকাতা, মৌসুমী প্রকাশনী, কোলকাতা বইমেলা, ৩০ জানুয়ারি ১৯৯০। ৭২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ইতিহাসে খিদিরপুর। কলিকাতা, মৈত্রী দত্ত, জানুয়ারি ১৯৯০, মাঘ ১৩৯৬। [১২]+১৬৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ভূমিকা ঃ নিশীথরঞ্জন রায়।

পালকি থেকে পাতালরেল। সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, বইমেলা, মাঘ ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। ১১১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলকাতা কলহকথা। সুভাষ সমাজদার—কলিকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, মাঘ ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। [৪]+১২৩ পৃষ্ঠা।

ছন্দে গাঁথা এ কলকাতা। ভবানীপ্রসাদ মজুমদার—কলিকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। ১৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলিকাতার টুকিটাকি। নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য—কলিকাতা, পূর্বাচল, কলিকাতা বইমেলা ১৯৯০। [৪]+৮৪ পৃষ্ঠা।

কুইজ গ্রন্থমালা ৫। ভূমিকা ঃ নিশীথরঞ্জন রায়।

আমি চার্নক বলছি। ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা, মহাদেব চ্যাটার্জি, বইমেলা ১৯৯০। [৪]+২৭ পৃষ্ঠা।

জানা অজানা কলকাতা। ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা, বিদ্যামন্দির, বইমেলা ১৯৯০। [৫]+২৪৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

১০৭০টি প্রশ্ন ও তার উত্তর।

কলকাতার কড়চা। জ্যোতিষগোবিন্দ জানা—কলিকাতা, প্রকাশক, বইমেলা ১৯৯০। ১৬ পৃষ্ঠা।

কবিতা ও ছড়া।

কবিতা কলকাতা। অনিলকুমার দত্ত সম্পাদিত—কলিকাতা, মুক্তপত্র পাবলিকেশন ও কলাভারতী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। [১৪]+৭৯+২১ পৃষ্ঠা।

কলকাতা নিয়ে লেখা বাংলা ও হিন্দী কবিতার সংকলন।

ভূমিকা ঃ নিশীথরঞ্জন রায়।

আকাশপথের কলকাতা। ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা, প্রমা প্রকাশনী, বইমেলা ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। [৮]+৯২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলকাতার আকাশপথের ২০৫ বছরের ইতিহাস (১৭৮৫—১৯৯০)। সেইসঙ্গে দমদম বিমানবন্দরের ইতিহাস এবং কলকাতায় বিমান চলাচল ও বিমান দুর্ঘটনাসমূহের বিবরণ।

কলির শহর কলকাতা। হরিপদ ভৌমিক—কলিকাতা, কলকাতা-চর্চা কেন্দ্র, ২৪ আগস্ট ১৯৯০। [১২]+১০৭ পৃষ্ঠা।

ভূমিকা ঃ বিষ্ণু বসু।

পুরনো কলকাতার রান্নাবান্না। সাধনা মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১ বৈশাখ ১৩৯৭। ৭৮ পৃষ্ঠা।

কলকাতা রাজভবনের মন্ত্রিনিবাস। অমিয় রায়—কলিকাতা, টিচার্স কনসার্ন, ১লা বৈশাখ ১৩৯৭ (১৫ এপ্রিল ১৯৯০। ১৬০ পৃষ্ঠা।

স্মৃতিকথা।

কবিদের কলকাতা। সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত—কলিকাতা, প্রতিভাস, এপ্রিল ১৯৯২। ৩১৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কবিতা সংকলন।

প্রশ্নোত্তরে কলকাতা ৩০০। নীরদ বরণ হাজরা—কলিকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, বৈশাখ ১৩৯৭ মে ১৯৯০। [৪]+১২৪ পৃষ্ঠা।

বিশপ হেবারের কলকাতা ১৮২৩-২৪। প্রসাদ সেনগুপ্ত [অনুবাদ ও সম্পাদনা] —কলিকাতা, মণ্ডল বুক হাউস, বৈশাখ ১৩৯৭, মে ১৯৯০। ১৪৪ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

বিশপ হেবার (১৭৮৩—১৮২৬) লিখিত 'ইণ্ডিয়ান জার্নাল'-এর একাংশের অনুবাদ, কলকাতা থেকে লেখা কয়েকটি চিঠি ও সম্পাদকীয় টীকা সহ।

কলকাতার তিনশ বছরের ইতিহাস ঃ সংস্কৃতি কেন্দ্র। কমল চৌধুরী—কলিকাতা, প্রতিভাস, মে ১৯৯০। ২৫৬ পৃষ্ঠা।

ছড়াছড়ি কলকাতা। সাগর বিশ্বাস—কলিকাতা, সাংস্কৃতিক খবর, জুন ১৯৯০। ৪৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

ছড়া সংকলন।

শহর কলকাতার ৩০০ বছর। সৌরভ বাগচী—কলিকাতা. নন্দিতা. পাবলিশার্স, [জুলাই ১৯৯০]। [৪]+৭৬ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

কলিকাতার কাহিনী। সুকুমার সেন—কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, জুলাই ১৯৯০। ৮৭ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

এই শহরের ইতিকথা কলকাতা। অমরেন্দ্র দাস—কলিকাতা, শ্রীগুরু পাবলিকেশন, আগস্ট ১৯৯০। ১৯২ পৃষ্ঠা। সচিত্র।

মেটিয়াবুরুজের নবাব। শ্রীপান্থ [নিখিল সরকার]—কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২৪ আগস্ট ১৯৯০। ১৩১ পৃষ্ঠা। সচিত্র।